



Boighar

মাসুদ রানা

নরকের কীট

দ্বিতীয় খণ্ড

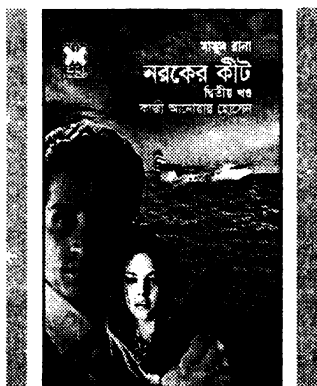
কাজী আনোয়ার হোসেন



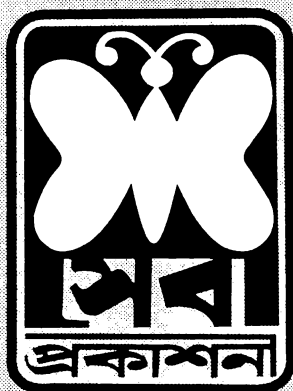
Boighar

মাসুদ রানা ৪৪০
নরকের কীট
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

www.boighar.com



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7440-8



আশি টাকা

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

রচনা. বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ- বিদেশি ছবি অবলম্বনে

রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী. শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দুরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪

সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি. ও বক্স: ৮৫০

mail alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-440

NOROKER KEET

Part-II

A Thriller Novel

By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।

টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনও
ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত
অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলাগা
কাগজ (চিল্পি) সাঁটানো হয় না।



এক নজরে

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারতনাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা *
 দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগরসঙ্গম-১, ২ * রানা! সাবধান!! * বিস্মরণ
 * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২ * কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য
 এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর
 ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনও ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই?
 * বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচদ্বীপ *
 বিদেশি গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা * তিন শত্রু *
 অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীল ছবি-১, ২ * প্রবেশ
 নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২ * লাল পাহাড় *
 হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হং কং সম্রাট-১, ২ * কুউউ! * বিদায়,
 রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২ * গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১,
 ২ * পপি * জিপসী-১, ২ * আমিই রানা-১, ২ * সেই উ সেন-১, ২ *
 হ্যালো, সোহানা-১, ২ * হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩
 * সাগরকন্যা-১, ২ * পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ *
 বিষনিঃশ্বাস-১, ২ * প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দি গগল * জিম্মি * তুষারযাত্রা-১,
 ২ * স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ * সন্ধ্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার-১,
 ২ * স্বর্ণরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২ * হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ *
 মেজর রাহাত-১, ২ * লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যামবুশ-১, ২ * আরেক
 বারমুড়া-১, ২ * বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২ * রিপোর্টার-১, ২
 * মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সঙ্কেত-১, ২, ৩ * স্পর্ধা-১, ২ * চ্যালেঞ্জ *
 শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু-১, ২ * অগ্নিপুরুষ-১, ২ * অন্ধকারে চিতা-১, ২
 * মরণকামড়-১, ২ * মরণখেলা-১, ২ * অপহরণ-১, ২ * আবার সেই
 দুঃস্বপ্ন-১, ২ * বিপর্যয়-১, ২ * শান্তিদূত-১, ২ * শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ *
 ছদ্মবেশী * কালপ্রিট-১, ২ * মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ * সময়সীমা মধ্যরাত *

আবার উ সেন-১, ২ * বুমেরাং * কে কেন কীভাবে * মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ *
 কুচক্র * চাই সাম্রাজ্য-১, ২ * অনুপ্রবেশ-১, ২ * যাত্রা অশুভ-১, ২ *
 জুয়াড়ী-১, ২ * কালো টাকা-১, ২ * কোকেন সম্রাট-১, ২ * বিষকন্যা-১, ২
 * সত্যবাবা-১, ২ * যাত্রীরা ইঁশিয়ার * অপারেশন চিতা * আক্রমণ '৮৯-১,
 ২ * অশান্ত সাগর-১, ২ * স্থাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ * দংশন-১, ২ *
 প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ * ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ * তিক্ত অবকাশ-১, ২ * ডাবল
 এজেন্ট-১, ২ * আমি সোহানা-১, ২ * অগ্নিশপথ-১, ২ * জাপানি
 ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ * সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ * গুপ্তঘাতক-১, ২ * নরপিশাচ-১,
 ২, ৩ * শত্রু বিভীষণ-১, ২ * অন্ধ শিকারী-১, ২ * দুই নম্বর-১, ২ *
 কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ * কালো ছায়া-১, ২ * নকল বিজ্ঞানী-১, ২ * বড় ক্ষুধা-১,
 ২ * স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ * রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ * অপছায়া-১, ২ * ব্যর্থ
 মিশন-১, ২ * নীল দংশন-১, ২ * সাউদিয়া ১০৩-১, ২ * কালপুরুষ-১, ২,
 ৩ * নীল বজ্র-১, ২ * মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ * কালকূট-১, ২, ৩ *
 অমানিশা-১, ২ * সবাই চলে গেছে-১, ২ * অনন্ত যাত্রা-১, ২ * রক্তচোষা
 * কালো ফাইল-১, ২, ৩ * মাফিয়া * হীরকসম্রাট-১, ২ * সাত রাজার ধন
 * শেষ চাল-১, ২, ৩ * বিগ ব্যাং * অপারেশন বসনিয়া * টার্গেট বাংলাদেশ
 * মহাপ্রলয় * যুদ্ধবাজ * প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ * মৃত্যুফাঁদ * শয়তানের ঘাঁটি
 * ধ্বংসের নকশা * মায়ান ট্রেজার * ঝড়ের পূর্বাভাস * আক্রান্ত দূতাবাস *
 জন্মভূমি * দুর্গম গিরি * মরণযাত্রা * মাদকচক্র * শকুনের ছায়া-১, ২ *
 তুরূপের তাস * কালসাপ * গুডবাই, রানা * সীমা লঙ্ঘন * রুদ্রঝড় *
 কান্তার মরু * কর্কটের বিষ * বোস্টন জ্বলছে * শয়তানের দোসর *
 নরকের ঠিকানা * অগ্নিবাণ * কুহেলি রাত * বিষাক্ত থাবা * জন্মশত্রু *
 মৃত্যুর হাতছানি * সেই পাগল বৈজ্ঞানিক * সার্বিয়া চক্রান্ত * দুরভিসন্ধি *
 কিলার কোবরা * মৃত্যুপথের যাত্রী * পালাও, রানা! * দেশপ্রেম *
 রক্তলালসা * বাঘের খাঁচা * সিক্রেট এজেন্ট * ভাইরাস X-99 * মুক্তিপণ
 * চীনে সঙ্কট * গোপন শত্রু * মোসাদ চক্রান্ত * চরসদ্বীপ * বিপদসীমা *
 * মৃত্যুবীজ * জাতগোক্ষুর * আবার ষড়যন্ত্র * অন্ধ আক্রোশ * অশুভ প্রহর
 * কনকতরী * স্বর্ণখনি-১, ২ * অপারেশন ইজরাইল * শয়তানের উপাসক

* হারানো মিগ * ব্লাইণ্ড মিশন * টপ সিক্রেট-১, ২ * মহাবিপদ সঙ্কেত *
 সবুজ সঙ্কেত * অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা * গহীন অরণ্য * প্রজেক্ট X-15 *
 অন্ধকারের বন্ধু * আবার সোহানা * আরেক গডফাদার * অন্ধপ্রেম * মিশন
 তেল আবিব * ক্রাইম বস * সুমেরুর ডাক-১, ২ * ইশকাপনের টেকা *
 কালো নকশা * কালনাগিনী * বেঈমান * দুর্গে অন্তরীণ * মরুকন্যা * রেড
 ড্রাগন * বিষচক্র * শয়তানের দ্বীপ * মাফিয়া ডন * হারানো
 আটলান্টিস-১, ২ * মৃত্যুবাণ * কমাণ্ডো মিশন * শেষ হাসি-১, ২ * স্মাগলার
 * বন্দি রানা * নাটের গুরু * আসছে সাইক্লোন * সহযোদ্ধা *
 গুপ্তসঙ্কেত-১, ২ * ক্রিমিনাল * বেদুঈন কন্যা * অরক্ষিত জলসীমা * দূরন্ত
 ঈগল-১, ২ * সর্পলতা * অমানুষ * অখণ্ড অবসর * স্নাইপার-১, ২ *
 ক্যাসিনো আন্দামান * জলরাক্ষস * মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ * স্বপ্নের
 ভালবাসা * হ্যাকার-১, ২ * খুনে মাফিয়া * নিখোঁজ * বুশ পাইলট * অচেনা
 বন্দর-১, ২ * ব্ল্যাকমেইলার * অন্তর্ধান-১, ২ * ড্রাগলর্ড * দ্বীপান্তর * গুপ্ত
 আততায়ী-১, ২ * বিপদে সোহানা * চাই ঐশ্বর্য-১, ২ * স্বর্ণবিপর্যয়-১, ২
 * কিল-মাস্টার * মৃত্যুর টিকেট * কুরুক্ষেত্র-১, ২ * ক্রাইমার * আগুন নিয়ে
 খেলা-১, ২ * মরুস্বর্ণ * সেই কুয়াশা-১, ২ * টেরোরিস্ট * সর্বনাশের
 দূত-১, ২ * গুপ্ত পিঞ্জর-১, ২ * সূর্য-সৈনিক-১, ২ * ট্রেজার হান্টার-১, ২ *
 লাইমলাইট-১, ২ * ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ * কিলার ভাইরাস-১, ২ * টাইম বম
 * আদিম আতঙ্ক * পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ * বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ *
 মৃত্যুদ্বীপ * জাপানি টাইকুন-১, ২ * পাতকিনী * নরকের কীট-১, ২।

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

COLLECTION

वरे

RE

EDIT



धर

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

এক

মানুষের তৈরি দ্বীপ ‘দি আইল্যান্ডে’ ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রবার্তো ম্যানিনির পাশে চুপ করে বসে আছে আসিফ রেজা। ইঞ্জিন রুমের লেলিহান আগুন নেভাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। ঘন ধোঁয়া, পোড়া ফিউয়েল আর তপ্ত ইস্পাতের গন্ধে কুঁচকে আছে নাক, ভোঁতা হয়ে গেছে ইন্দ্রিয়। তবুও বারবার চোখ যাচ্ছে ব্রিডিং গিয়ারের জ্বলজ্বলে বাতির উপর। একটু পর পর ‘বিপ্!’ আওয়াজ তুলছে অ্যালার্ম।

‘এয়ার ট্যাক্সের অক্সিজেনে কতক্ষণ চলবে?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘আর বড়জোর দশ মিনিট,’ বললেন ম্যানিনি। ‘কমও হতে পারে।’

হেডগিয়ারে মিষ্টি কণ্ঠ শুনল আসিফ।

‘আসিফ, শুনছ?’

‘হ্যাঁ, তানিয়া।’

‘ওখানে কী অবস্থা?’

‘আগুন নিভে গেছে,’ বলল আসিফ, ‘কাজ শেষ করেছে হ্যালোন। কিন্তু কমে আসছে আমাদের অক্সিজেন। তোমরা দরজা খুলতে পারবে?’

‘একটু অপেক্ষা করো।’

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল তানিয়া, ‘ওই ব্যাপারে কাজ

করছেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। বলছেন পানি ঢেলে কমিয়ে আনবেন তাপমাত্রা। তাতে লাগবে মোটামুটি সাত মিনিট।’

‘গুড,’ বলল আসিফ। রবার্তো ম্যানিনের বাহু ধরে উঠতে সাহায্য করল। ‘চলুন, আপনার লোককে খুঁজে বের করি।’

‘এদিকে,’ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আরেক দিকে চললেন বিজ্ঞানী।

জঞ্জালে ভরা ঘরে সাবধানে এগোল ওরা। একের পর এক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে অর্ধেক ইঞ্জিন রুম। ভাঙাচোরা, বিকল মেশিনারির ভিতর দিয়ে চলেছে। ধাতব মেঝেতে ওদের ছিটিয়ে দেয়া পানি থেকে উঠছে গনগনে ভাপ ও বাষ্প। চারপাশে পোড়া ফিউয়েলের দুর্গন্ধ।

‘ও নিশ্চয়ই ওখানে থাকবে,’ সামনে সিল করা দরজা দেখালেন ম্যানিনি।

ওয়াটারপ্রুফ বালকহেড নয় ওই ঘর। কিন্তু আগুনে পোড়া স্টিলের দরজা যথেষ্ট পোক্ত বলেই মনে হলো। কিনারা দুমড়ে যায়নি। আসিফের মনে আশা জন্মাল, ভিতরে ঠিকই বেঁচে আছে মানুষটা।

‘শেল্টার হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল,’ বললেন রবার্তো। ‘অবশ্য, জানি না এত ভয়ঙ্কর আগুনের পরেও বাঁচবে কি না।’ লকিং বার নিজের দিকে টান দিলেন তিনি।

‘বেশি গরম?’ জানতে চাইল আসিফ।

আস্তে করে মাথা দোলালেন ম্যানিনি, নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে আবারও ধরলেন বার। জোর খাটাতে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল তাঁর মুখ। কিন্তু খুলতে চাইছে না দরজা।

‘বোধহয় তাপের কারণে বেড়ে গেছে,’ বললেন ম্যানিনি।

‘আসুন, দু’জন মিলে চেষ্টা করি,’ বলল আসিফ। পা ফাঁক করে বিজ্ঞানীর পাশে দাঁড়াল। দু’জন মিলে গায়ের জোরে টানল হ্যাণ্ডেল বার। খট্ আওয়াজ তুলে ওটা নীচে নামতেই কাঁধের

জোরে দরজায় ধাক্কা দিল আসিফ।

‘সুস’ আওয়াজ তুলে খুলে গেছে দরজা। ঝটকা দিয়ে হাত পিছিয়ে নিল আসিফ। মনে হয়েছে, নোমেক্সের গ্লাভসের ভিতর পুড়ে থাক হয়ে গেছে আঙুল। www.boighar.com

দরজা খুলে যেতেই ইঞ্জিন রুমের বাষ্প আর ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে ছোট ঘরে। কোনও বাতি জ্বলছে না কন্ট্রোল রুমে। ওদের মুখোশ বা গিয়ারের দপ-দপে বাতি ছাড়া কোনও আলো নেই।

ঘরের দু’দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা।

পিছনের দেয়ালের কাছে মেঝেতে এক লোককে পড়ে থাকতে দেখল আসিফ। পরনে তার মেকানিকের কভারঅল।

‘ডক্টর, এদিকে আসুন!’ ডাকল আসিফ।

www.boighar.com

উপরের কমাণ্ড সেন্টারে সবার চোখ সেন্ট্রাল মনিটরে। পর্দায় জ্বলছে লাল সংখ্যা। দেখিয়ে চলেছে ইঞ্জিন রুমের টেম্পারেচার। ধীরে ধীরে কমছে তাপ। কিছুক্ষণ পর লাল রঙের সংখ্যা হয়ে গেল হলদে।

‘আশা করি একটু পর দরজা খুলতে পারব,’ বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

কথাটা শুনে স্বস্তি পেল তানিয়া। চট করে দেখে নিল হাতঘড়ি। আসিফ আর ইটালিয়ান বিজ্ঞানীর অক্সিজেন ওয়ার্নিং চালু হওয়ার পর পেরিয়ে গেছে ছয় মিনিট। একবার ওর মনে হয়েছিল, ভুল সময় বলেছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। আসলে আসিফ ওই ঘর থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত শঙ্কায় বুক আঁকড়ে থাকবে ওর।

কয়েকটা সুইচ টিপে দিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। চেক করল বাতি জ্বলা সুইচ বোর্ড। যা-ই দেখে থাকুক, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল।

পটাপট কয়েকটা সুইচ ও টগল অফ করল।

‘কোনও সমস্যা?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘দরজার মেকানিয়ম কাজ করছে না,’ বলল গ্রিক, ‘খুলে দিতে চাইলাম, কিন্তু এখনও লক রয়ে গেল।’

‘আগুনের কারণে ক্ষতি হয়েছে?’

‘মনে হয় না। ওই ডিযাইন আরও অনেক তাপ সহ্য করার জন্য তৈরি।’

আরও কয়েকটা সুইচ টিপল গ্রিক ইঞ্জিনিয়ার। চেক করল আরও কী যেন। ‘সমস্যা কমপিউটারের। ডিরেকটিভ ব্লক করছে ওটা।’

‘করছে কেন?’ শুকিয়ে গেল তানিয়ার গলা। খেয়াল করল, ওর ডানদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাসিণ্টা।

‘জানি কেন এমন হয়েছে,’ বলল মেয়েটা, ‘সব গোলমাল করে রেখেছে ডিবোয়ে।’

‘ডিবোয়ে আছে জেলে,’ মন্তব্য করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

‘ডক্টর ম্যানিনিকে বলতে শুনেছি, ডিবোয়ে কমপিউটারের ব্যাপারে দুর্দান্ত জিনিয়াস,’ বলল জ্যাসিণ্টা। ‘আগেই প্রোগ্রাম করে রেখেছে। যাতে ধরা পড়লেও ঝামেলা করতে পারে। বিপদে ফেলতে চাইছে বিজ্ঞানীকে। একই কাজ করেছে রোবটের ব্যাপারে।’

কমপিউটারের নির্দেশ বাইপাস করতে চাইছে ইঞ্জিনিয়ার। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ‘ঝামেলা করছে কমপিউটারই। আর সব ঠিকই কাজ করছে।’

‘নীচে গিয়ে ডিবোয়েকে ধরতে হবে,’ বলল জ্যাসিণ্টা। ‘যেন দেয় ডিঅ্যাকটিভেটিং কোড। ওর কপালে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে দিলে সবই বলবে।’

ঝড়ের গতিতে ভাবতে চাইছে তানিয়া, কিন্তু কাজ করছে না

মগজ। বন্ধ ঘরে বিষাক্ত পরিবেশে আটকা পড়েছে আসিফ, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না ও নিজে। স্বামীর অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে ভাবতে গিয়ে দম আটকে এল ওর।

‘তানিয়া,’ কাতর কণ্ঠে ডাকল জ্যাসিণ্টা। ‘এরই ভেতর একে একে আপন কয়েকজনকে হারিয়েছি আমি। চাই না ওই কষ্ট ত্রমাকেও পেতে হোক।’

মিনিটরে টেম্পারেচার গেইজ দেখাচ্ছে সবুজ রং।

টিকটিক করে সাত মিনিটের দিকে চলেছে ঘড়ি।

মাত্র তিন মিনিট বাতাস আছে আসিফের।

‘ঠিক আছে, আমরা ডিবোয়ের কাছ থেকে কোড আদায় করব,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল তানিয়া। চাইল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে।

মাথা দোলাল লোকটা। নিজের এক লোকের দিকে ইশারা করল। ‘অ্যাবেলা, দায়িত্ব ন্যায়। আমি ওঁদের সঙ্গে যাচ্ছি।’

হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলল জ্যাসিণ্টা, রওনা হয়ে গেল এলিভেটোরের দিকে। যদিও জানে না কোথায় আছে জেলখানা।

ইঞ্জিন রুমে ম্যানিনির ত্রুর পাশে বসে পড়েছে আসিফ রেজা। কসরত করে চিত করল মানুষটাকে। চেতনা নেই তার। নড়ল না। গ্লাভস খুলে পালস দেখল আসিফ।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ম্যানিনি। ‘ঠিক আছে তো?’

আরও কয়েক সেকেন্ড পালস খুঁজল আসিফ, তারপর আশ্তে করে মাথা নাড়ল। ‘সরি। মারা গেছে।’

‘ঈশ্বর!’ বিড়বিড় করলেন ম্যানিনি। ‘সব কষ্ট বৃথা।’

একই অনুভূতি আসিফের। তখনই মুখোশের আলোয় দেখল অন্য কিছু। লোকটার ঘাড়ে কী যেন বড় অস্বাভাবিক। দেহটা কাত করল আসিফ। হাত বোলাল বাদামি চুলের শেষ প্রান্তে। বলল, ‘সব বৃথা নয়, ডক্টর।’ দেখাল ঘাড়ের ক্ষতটা। ভার্টেব্রা

স্পর্শ করে দেখেছে, টানটান ভাবটা নেই।

‘কী হয়েছিল ওর?’ জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী।

হাত বাড়িয়ে তাঁর রেডিয়ো নিল আসিফ, তারপর নিজেরটা।

অবাক হয়েছেন রবার্তো ম্যানিনি।

রেডিয়ো দুটোর সুইচ অফ করল আসিফ। এবার নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারবে। সরাসরি চোখ রাখল ম্যানিনির চোখে, মুখোশের ভিতর থেকে বলল, ‘ধোঁয়া বা বিষাক্ত কেমিকেলের কারণে মারা যায়নি। ভেঙে দেয়া হয়েছে ঘাড়।’

‘ঘাড় ভেঙে দিয়েছে?’ চমকে গেলেন ম্যানিনি।

মাথা দোলাল আসিফ। ‘খুন করা হয়েছে, মিস্টার ম্যানিনি। আপনার দ্বীপে গুপ্তহত্যাকারী আছে।’

হতভম্ব মনে হলো বিজ্ঞানীকে।

‘আগুন আর সব সিস্টেম ফেইল করার একমাত্র কারণ এটাই। আমার সঙ্গে আপনি ছিলেন, কাজেই খুনি অন্য কেউ। হতে পারে স্কেলিটন ত্রুদের কেউ। অথবা দ্বীপে গোপনে উঠেছে কেউ। তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ডিবোয়ে আর হ্যাভেলার। মনে হয়, ব্যাপারটা আপাতত গোপন রাখাই ভাল। আগে খুঁজে বের করতে হবে কাজটা কে করেছে।’

মৃত ত্রুর দিকে চেয়ে রয়েছেন বিজ্ঞানী। কয়েক মুহূর্ত পর আসিফের দিকে চাইলেন। আস্তে করে মাথা দোলালেন।

আবারও রেডিয়োর সুইচ অন করল আসিফ। দুই হাতে তুলে নিল মৃত লোকটাকে।

নিজের রেডিয়ো নিয়ে ব্রিজের উদ্দেশে বললেন বিজ্ঞানী, ‘আমরা মেইন ডোরের দিকে যাচ্ছি।’

নীচের ডেকে জেলখানায় পৌঁছে গেছে তানিয়া, জ্যাসিষ্টা আর চিফ ইঞ্জিনিয়ার। শেষেরজন চাবি ব্যবহার করে খুলে ফেলল সেল

ডোরের তালা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তানিয়া।

নিজের সিটে বসে আছে ডিবোয়ে, মুখ তুলে চাইল তানিয়ার দিকে। সে ঘুমাতে পারেনি, কালো দাগ পড়েছে চোখের নীচে।

‘তুমি কমপিউটারের সিস্টেম গড়বড় করেছ,’ ক্ষোভ ভরা কণ্ঠে বলল তানিয়া, ‘আমার স্বামী আছে ইঞ্জিন রুমে। আগুন নিভে গেছে। কিন্তু এখন বেরোতে পারছে না। দরজা খুলে দিতে হবে, নইলে শ্বাস আটকে মরবে।’

‘আমি কেন তোমাদের হয়ে কাজ করব?’

‘নইলে, ও যদি মারা পড়ে, সব দায় পড়বে তোমার ওপর। এরই ভেতর অনেক ক্ষতি করেছ তুমি।’

সামান্য পিছনে হেলে গেল ডিবোয়ের মাথা। ভাবতে শুরু করেছে কী করা উচিত।

‘ডিবোয়ে!’ ঝট করে দু’পা সামনে বাড়ল তানিয়া। কষে চড়াৎ করে চড় দিল লোকটার গালে। ‘ওদের কিছু হলে খুন হয়ে যাবে তুমিও! এরই ভেতর কেউ কেউ বলেছে, খুন করবে তোমাকে!’

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে ওয়াই-ফাই এনেবল ল্যাপটপ নিয়ে ডিবোয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল তানিয়া।

মুখ তুলে ওর দিকে চাইল ডিবোয়ে, কিন্তু টু শব্দ করল না।

‘ওকে খুনই করা উচিত,’ বলল জ্যাসিটা।

ওকে পাশ কাটিয়ে এগোল উত্তেজিত চিফ ইঞ্জিনিয়ার। পৌছে গেল তানিয়ার পাশে। ‘যথেষ্ট!’ খ্যাপা সুরে বলল, ‘এবার তোর হাড় ভাঙব পিটিয়ে!’

পাহাড়ের মত ঝুঁকে এল ডিবোয়ের উপর। ‘হয় খুলে দিবি ওই দরজা, নইলে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব!’

ভয় পেয়ে চেয়ারে পিছিয়ে যেতে চাইল ডিবোয়ে। কিন্তু তার চোখ তানিয়া বা ইঞ্জিনিয়ারের উপর নেই। চোখে ভয়।

এক সেকেণ্ড পর কারণটা টের পেল তানিয়া। ঘুরে চাইল ও।

এইমাত্র কক হয়েছে পিস্তল। ওটা আছে জ্যাসিণ্টার হাতে।
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে।

হৃৎপিণ্ডের রক্ত বরফের মত জমাট বেঁধে যেতে চাইল
তানিয়ার।

‘কেউ কাউকে পেটাবে না,’ কর্কশ স্বরে বলল জ্যাসিণ্টা। ওর
পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছিল সোহেল, কিন্তু আবারও একটা জোগাড়
করে নিয়েছে।

‘তানিয়া আর চিফ, আপনারা আমাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন
বলে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না,’ হাসল জ্যাসিণ্টা। ‘ভাবছিলাম
একই সঙ্গে কী করে সামাল দেব দু’জনকে!’

ইঞ্জিন রুমের মেইন ডোরের সামনে পৌঁছে গেছে আসিফ রেজা
আর রবার্তো ম্যানিনি। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ওদের সময়।

‘কমবেশি তিরিশ সেকেন্ড,’ বললেন ম্যানিনি।

শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত রাখতে চাইছে আসিফ। ছোট্টাছুটির সময়
খরচ করে ফেলেছে অনেক অক্সিজেন। এখন শান্ত থেকে খুব যে
আয়ু বাড়বে, তা-ও নয়।

‘এবার যে-কোনও সময়ে ফুরিয়ে যাবে অক্সিজেন,’ হতাশ
সুরে বললেন ম্যানিনি।

কয়েক মিনিট হলো কেউ কথা বলেনি ব্রিজ থেকে, ভাবল
আসিফ। শেষ কয়েকবার দম নিতে বেশ কষ্ট হয়েছে ওর। মন
চাইছে খুলে ফেলবে মুখোশ। কিন্তু জানে, কাজটা হবে মস্ত ভুল।
একবার টেক্সিক ফিউম ফুসফুসে ঢুকলে মরবে খুব কষ্ট পেয়ে।

‘তোমরা বাইরে কেউ নেই?’ আতঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন
ম্যানিনি। ধুম-ধুম শব্দে ঘুমি বসালেন দরজার উপর।

‘উত্তেজিত হলে অক্সিজেনের খরচ বাড়বে,’ সতর্ক করল
আসিফ।

‘ওরা দরজা খুলছে না কেন!’ দরজা পেটানো থামালেন না ম্যানিনি। লাল থেকে হলদে হয়ে গেছে সাইড প্যানেলের ওয়ার্নিং আলো। হুশ্-হুশ্ আওয়াজে চালু হলো এগযস্ট ভেন্টের ফ্যান। ধোঁয়া, ফিউম আর তপ্ত বাতাস টেনে নিতে শুরু করেছে।

‘ওরা ভুলে যায়নি আমাদের কথা,’ বললেন বিজ্ঞানী।

ওদিকে দরজার পাশে প্যানেলের ইণ্ডিকেটার দেখাল সবুজ বাতি। ঘুরতে শুরু করেছে হ্যাণ্ডেল। দরজা খুলতেই ‘হুইশ্!’ আওয়াজ ভুলে বাইরে বেরোল ইঞ্জিন রুমের উত্তপ্ত বাতাস।

পরক্ষণে দমে গেল আসিফ। হাঁ হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী।

সামনেই হাঁটু মুড়ে বসে আছে হতাশ তানিয়া, সাত ক্রু আর চিফ ইঞ্জিনিয়ার। হাত মাথার পিছনে।

ডিবোয়ে-হ্যাভেলার সঙ্গের দুই ক্রু রাইফেল আর উযি সাবমেশিনগান হাতে কাভার করেছে। পাশেই জ্যাসিণ্টা কাপুল।

‘বুঝলাম কে স্যাবোটাজ করেছে,’ মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল আসিফ। ‘তুমি জ্যাকো কাপুলের বোন নও।’

‘আসল নাম আলেয়া বিনতে আব্বাস,’ বলল মেয়েটা। ‘আমার কথা মত চললে এখনি খুন হবে না তোমরা।’

দুই

গভীর কূপে বালির শুকনো মেঝেতে পড়ে আছে মাসুদ রানা, বেদম খিঁচ ধরেছে উরু-কোমরের মাংসপেশিতে। একটু আগে রওনা হয়েছে জায়েদ বিন মনযুরের গাড়ি, দূরে মিলিয়েও গেছে

ইঞ্জিনের আওয়াজ। মরুভূমির থমথমে নৈঃশব্দ্য ভাঙছে পচা
লাশের উপর মাছির পালের মৃদু ভন-ভন গুঞ্জন।

হয়তো উপর থেকে চেয়ে আছে কেউ, নড়লেই মস্ত ভুল
হবে। দাঁতে দাঁত পিষে সময় পার করেছে রানা। নাকে-কানে-
হাতে-পায়ে বসছে মাংসখোর মাছি, একটু পর উড়ে যাচ্ছে হতাশ
হয়ে। কখনও কখনও বাড়ছে ভন-ভন শব্দ।

এবার নড়তেই হবে, পেশির যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না
রানা। একবার দেখে নিল কুয়ার গোলাকার মুখ। না, ওখানে
কেউ নেই। কুয়ার দেয়ালের পাশে সরে গেল। টিপতে শুরু
करেছে উরুর পেশি। একটু পর কমল ব্যথা।

গুলি শুরু হতেই হাঁটুর কাছে লেগেছিল কী যেন। জায়গাটা
পরখ করল রানা। বুলেটের গর্ত নেই। ছিটকে লেগেছে পাথরের
টুকরো। এ ছাড়া টনটনে ব্যথা কাঁধে। আর কোনও সমস্যা নেই।

হাত বাড়িয়ে সোহেলের কাঁধ আস্তে করে ঝাঁকাল।

দু'সেকেণ্ড পর চোখ মেলল সোহেল, যেন এইমাত্র উঠেছে
গভীর ঘুম থেকে। মাজা সোজা করে বসে কয়েক ইঞ্চি সরেই
গুণ্ডিয়ে উঠল। মুখ কুঁচকে বলল, 'আমরা কি স্বর্গে, দোস্ত?'

'ভাবলি কী করে তুই স্বর্গে যাবি?' আপত্তির সুরে বলল রানা।

'তা ঠিক,' চট করে চারপাশ দেখে নিল সোহেল। 'না,
নরকেই আছি। পাশে যখন তুই।'

কথাটা পান্ডা দিল না রানা। 'কুয়া থেকে বেরোতে চাইলে
লাগবে দড়ি বা মই, কিন্তু ওসব আমাদের কাছে নেই।'

অন্যদিকে মন দিল ওরা। বালিতে লাশ। দুটো বেশ আগের,
পচা শরীর থেকে বেরোচ্ছে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, আটকে দিতে চাইছে
দম। তৃতীয় লোকটা কুয়ায় পড়েছে একটু আগে, এখন লাশ।
কপালের পাশে রক্তাক্ত ক্ষত। বেকায়দাভাবে কাত হয়ে আছে
ঘাড়।

ওরা কীভাবে বেঁচে আছে, ভাবতে গিয়ে অবাক হলো রানা ।

‘পা দিয়ে ঢালু বালির কার্নিশে না পড়লে... এ পড়েছে মাথা দিয়ে ।’

‘তা ছাড়া, আমরা পড়েছি কম উচ্চতা থেকে,’ বলল সোহেল ।
আরেকবার দেখল লাশগুলো । ‘অন্য দু’জনের খবর জানি না ।’

খুদে মাছির পালে ঢাকা পড়েছে দুই পচা লাশ ।

‘ওদের ওপর বোধহয় রেগে গিয়েছিল জায়েদ বিন মনযুর ।’

‘আমাদের বুড়ো যদি দেখত ভয়ঙ্কর এই গর্তে পড়ে মরতে বসেছি...’ চুপ হয়ে গেল সোহেল । বন্ধুর দেখাদেখি চাইল কুয়ার মুখে ।

‘প্রথম কাজ বেরিয়ে যাওয়া,’ বলল রানা ।

‘ভেবেছিস কী করবি?’

‘এখনও না ।’

‘মচকে গেছে গোড়ালি, তবে একটু পর বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে,’ পা টিপতে শুরু করল সোহেল ।

বৃত্তাকার দেয়ালের এক অংশে ভর করে উঠে দাঁড়াল রানা ।
উঠতে সাহায্য করল সোহেলকে । ব্যাসে কুয়া পাঁচ ফুট । কোনও
এক সময়ে নতুন করে খুঁড়ে নেয়া হয়েছিল, নীচের অংশ কাঁচা
মাটির । উপরের বিশ ফুট দেয়াল অ্যাডোবি ইঁটের ।

‘আমি তো ওঠার কোনও উপায় দেখছি না,’ বলল সোহেল ।

মাটির দেয়ালে গেঁথে থাকা এক পাথরে হাত রাখল রানা, ভর
দিল ওটার উপর । গুঁড়ো হয়ে গেল পাথরটা ।

‘এটা-ওটা ধরে ওঠা যাবে না ।’

‘গর্তটা গোল হওয়ায় সেটা সম্ভব নয়,’ সায় দিল সোহেল ।

দুই হাত প্রসারিত করল রানা । কোনওমতে আঙুল ঠেকল দুই
দিকে । ‘না, হবে না ।’

মেঝের দিকে চাইল রানা । তিন লাশ ছাড়া আছে আবর্জনা

আর জঞ্জাল। কয়েকটা টিনের ক্যান, গোটা দশেক প্লাস্টিকের খালি বোতল আর অতি পুরনো একটা ঘষা টায়ার। এসবের ভেতর ছোট ছোট হাড়। কুয়ার পারে বসে মাংস খেয়েছিল কারা যেন, নীচে ফেলেছে অবশিষ্টাংশ।

আবারও থ্রেডহীন চাকা দেখল রানা। একবার তাকাল দেয়ালের দিকে। তারপর চোখ স্থির হলো লাশের উপর।

‘একটা উপায় মাথায় এসেছে।’

পাকা বদমাসের মত দেখতে যে লোকটাকে লাথ মেরে ফেলে দিয়েছিল কুয়ায়, তাকে সার্চ করল রানা। ঝোলা থেকে পেল খাপবদ্ধ ছোরা, ল্যুগার আকৃতির পিস্তল আর ছোট বিনকিউলার। বেটে পানির ক্যান্টিন। চারভাগের তিনভাগই খালি। বন্ধুর দিকে ক্যান্টিন বাড়িয়ে দিল রানা।

ওটা নিল সোহেল। এক ঢোক পানি খেয়েই ফিরিয়ে দিল বন্ধুকে।

নিজে এক চুমুক পানি শেষ করে সোহেলের হাতে ক্যান্টিন ধরিয়ে দিল রানা। সাবধানে কাপের মত ঢাকনি বন্ধ করে কোমরে ক্যান্টিন গুঁজল সোহেল।

ওদিকে বালি খুঁড়ে টায়ার বের করছে রানা। কাজটা শেষ করে নাক চেপে পচা দুই লাশের পাশে বসে পড়ল। উড়াল দিল মাছির পাল। দুই লাশের দড়ি খুলে নিয়ে বলল, ‘এই জিনিস লাগবে।’

‘সঙ্গে তো গ্র্যাপলিং হুক নেই,’ বলল সোহেল।

‘লাগবে না।’ কুয়ার মাঝে একটার উপর আরেকটা লাশ তুলল রানা। ‘এবার আরাম করে এখানে বস।’

আঁতকে উঠল সোহেল। ‘বলিস কী! আমি কি পিশাচ-সাধক তান্ত্রিক যে লাশের উপর চেপে বসে ধ্যান করব?’

‘তাজাটা ওপরে রেখেছি।’

‘তাতেই বা আমার কী?’ গভীর সন্দেহ নিয়ে বন্ধুকে দেখল
সোহেল।

‘কামড়ে দেবে না,’ আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। ‘কোনও ভয়
নেই।’

দ্বিধা নিয়ে লাশের পিঠে বসল সোহেল।

ওর পিঠে ঠেস দিয়ে টায়ার রাখল রানা। নিজে বসল
সোহেলের উল্টো দিকে। ‘এবার সত্যিই পিঠাপিঠি হলাম আমরা।
দু’পা রাখ্ দেয়ালে, ঠেলতে থাক্ আমাকে।’

‘দেখি কে কাকে ঠেলে ফ্যালে!’ আগ্রহের সঙ্গে বলল
সোহেল। ‘তুই হচ্ছিস পিশাচ-সাধক! আর আমি দরবেশ!’

‘ও, তাই? দাঁড়া! তোর দরবেশগিরি বের করছি!’

রানা কী করতে চাইছে বুঝতে পেরেছে সোহেল। দুই পা
ব্যবহার করল। একই কাজ করেছে রানা, ঠেলতে শুরু করেছে
ওদিকের দেয়ালে পা রেখে।

টের পেল, ওদের মাঝে একটু চেপ্টে গেল টায়ার। প্রচণ্ড চাপ
তৈরি করেছে পিঠ আর দুই পায়ে। হয়তো সম্মিলিত প্রচেষ্টায়
খাড়া চিমনির মত কুয়া বেয়ে উঠতে পারবে ওরা। ছয় ইঞ্চি ভাঁজ
হয়ে আছে ওদের হাঁটু।

‘একটু একটু করে উঠতে থাক্,’ শুকনো স্বরে বলল রানা।

উঠছে বলে প্রচণ্ড টান পড়ছে ওদের পিঠ-কোমর-পায়ের
পেশিতে। দু’জনের মাঝে শক্তভাবে আটকে আছে টায়ার। কয়েক
মুহূর্ত পর লাশ ছেড়ে উপরে উঠল ওরা।

‘কাজ হবে বোধহয়,’ মন্তব্য করল সোহেল।

‘তুই প্রথম, তারপর আমি,’ বলল রানা। ‘একজন একজন
করে।’

প্রথমবার পা সরাতে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল সোহেল,
শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে। বাম পায়ের জোরে দেয়ালে চাপ

তৈরি করে নয় ইঞ্চি উপরে উঠল রানা। উৎসাহ নিয়ে ডান পা রাখল নতুন পয়িশনে।

পরেরবার আগের চেয়ে ভালভাবে উঠল সোহেল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠছে ওরা। গতি খুব কম।

‘তাকে বলতে ভুলে গেছি,’ বলেই চুপ হয়ে গেল সোহেল। প্রতিবার উঠতে গিয়ে গলা দিয়ে বেরোচ্ছে চাপা গর্জন। ‘ওই ড্রাফটিং রুমে ঢোকান আগে স্রোতের চার্ট দেখেছি। ওটা পার্শিয়ান গালফ, আরব সাগর আর ভারত মহাসাগরের অর্ধেক অংশের।’

একই সঙ্গে নিজেদের তুলছে ওরা। প্রতিবারে বড়জোর হয় ইঞ্চি। একই সময়ে পা রাখছে নতুন জায়গায়।

‘অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিস?’ কর্কশ শোনালা রানার কণ্ঠ।

‘সময়... ছিল... কই,’ বলল সোহেল। ‘কিন্তু... মনে হলো... আরেকটা কথা।’

ধীরে ধীরে উঠছে ওরা।

‘কী সেটা?’ সংক্ষেপে সারল রানা।

‘জায়েদ... ওর নরকের কীট দিয়ে... একটা ড্যাম ভাঙতে চায়... তা হলে ওগুলো... ভারত মহাসাগরে কেন... জমি থেকে হাজার মাইল দূরে?’

রানার মনের এক অংশ খুঁজতে লাগল জবাব, অন্য অংশ ব্যস্ত আরও জরুরি কাজে। ‘ভাল প্রশ্ন,’ কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘নদীর পানি ঠেকাবে বাঁধ... নদী যায় সাগরে... হয়তো দুর্ঘটনার কারণে... সাগরে এসেছে ন্যানোবট।’

রানা ভাবতে চাইল, পারস্য উপসাগর বা ভারত মহাসাগরে পানি ঢালছে কোন্ কোন্ বাঁধ। কাণ্ডাই ড্যাম ছাড়া মনে পড়ল না কিছুই।

থামল ওরা। রানা বলল, ‘যেভাবে হোক... বেরিয়ে যেতে হবে... এখান থেকে। ভয়ঙ্কর কিছু করতে... চাইছে এরা।’

কুয়ার দ্বিতীয় দেয়ালে পৌঁছে গেছে ওরা। আরও কঠিন হলো ওঠা। দারুণ জ্বলছে পিঠ। পায়ে বেদম ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে। উঠছে ধীরে ধীরে।

‘কী অবস্থা?’ একটু পর জানতে চাইল রানা।

‘ফস্কে পড়ে... আবারও প্রথম থেকে... শুরু করতে চাই না,’ বলল সোহেল।

মাথা কাত করে নীচে চাইল রানা। সামান্য পিছলে গেল পা। উরুর জোরে আরও চাপ তৈরি করল দেয়ালে। থরথর করে কাঁপছে পা। আঁকড়ে এসেছে কাফ মাসল্।

‘আর পাঁচ ফুট,’ কাঁপা শ্বাস ফেলল রানা। ‘তারপর... দ্বিতীয় কাজ।’

‘কেউ ওপরে রয়ে... গেলে?’ বলল সোহেল।

‘গাড়ি চলে যাওয়ার পর... কোনও আওয়াজ পাইনি।’

‘তবুও কেউ থাকলে?’

‘সেজন্যে পিস্তল আছে।’

আরেক ফুট উঠবার পর শেষ বিকেলের রোদ পড়ল রানার মুখে। তখনই শুনল অদ্ভুত এক আওয়াজ। কেমন তীক্ষ্ণ। প্রতিধ্বনি তৈরি করছে অ্যাডোবি দেয়ালে।

‘ওটা কী?’ বিড়বিড় করল সোহেল।

‘জানি না,’ বলল রানা।

ক্রমে বাড়ছে হুইসলের মত আওয়াজ। ওদের উপর দিয়ে ভেসে গেল ছায়া। প্রকাণ্ড এক ধূসর-সাদা এয়ারক্রাফটের পেট দেখল রানা। ওটার আগরকারিজের ছয় চাকা নেমে এসেছে ঈগলের থাবার মত, যেন ছোঁ দেবে শিকারের উপর।

‘ওটা কী?’ জানতে চাইল সোহেল।

‘কোনও জেট বিমান,’ বলল রানা।

দু’সেকেণ্ডের জন্য দেখা গেছে, ছিল বড়জোর এক শ’ ফুট

উপরে। তখনই অস্বাভাবিকতা দেখেছে রানা।

‘জানতাম না রানওয়ার শেষে আছি,’ ঢোক গিলল সোহেল।
‘হয়তো উঠলাম, আর তখনই পিষে দিয়ে গেল বোয়িং ৭৪৭।’

নিজেদের কাজে মন দিল ওরা। কিছুক্ষণের ভিতর উঠে ‘এল কুয়ার ঠোঁটের কাছে।

গোড়ালি আর উরুতে ল্যাকটিক অ্যাসিডের ব্যথা, টের পেল রানা। ভাবল, একবার খিঁচ ধরলে গেছি দু’জন!

পড়ে যাওয়ার আগেই উঠতে হবে। টায়ারের চাপের ব্যথায় ভাঙি-ভাঙি করছে পিঠ। কাঁধে বিশ কেজি ওজন নিয়ে এক শ’ বুকডন দিতেও এত কষ্ট হয় না।

পকেট থেকে নাইন এমএম পিস্তল বের করে সেফটি অফ করল রানা। নিচু স্বরে বলল, ‘এবার সাবধান, সোহেল।’

‘আরও সাবধান? অসম্ভব, শালা!’ পায়ের পেশি আরও শক্ত করল বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

শেষ ছয় ইঞ্চি উঠল রানা। অস্ত্র হাতে গলা উঁচু করে চাইল ওদিকটা। কুয়ার আশপাশে কেউ নেই। ‘রাস্তা পরিষ্কার।’

‘এদিকেও কেউ নেই,’ বলল সোহেল। ‘এবার?’

কুয়ার পারে পিস্তল ফেলল রানা, শার্টের ভিতর থেকে বের করল দড়ি। খুঁজে এক করল দুই প্রান্ত। একেক দিকে রইল চার ফুট দড়ি। দু’দিক ধরে রেখে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিল অন্যদিক। উঠে গিয়ে পেরিয়ে গেল দড়ি A-ফ্রেম। একটা ইউ তৈরি করে পড়ল রানার পাশে। ওটা ধরে ওই অর্ধ বৃত্তের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিল অন্য দুই প্রান্ত। নীচের দিকে টান দিতেই A-ফ্রেমে শক্তভাবে আটকে গেল দড়ি।

সোহেলের দিকে দড়ির এক অংশ দিল রানা। ‘শক্ত করে ধর।’ নিজের দড়ি দু’বার পেঁচিয়ে নিল ট্রাইসেপে। একই কাজ করল সোহেল।

‘দড়ি ঠিকভাবে ধরেছিস তো?’ জানতে চাইল রানা।

‘পুরস্কার জেতা লটারির টিকেটের মতই, কার সাধ্য কেড়ে নেবে!’ বলল সোহেল।

‘গুড! জানিসই তো, এবার পা সরিয়ে নিলেই...’

‘জানি রে, জানি, শালা! কপালে আছে কাঁধের ব্যথা।’

‘কাঁধের ব্যথা তোর কপালে উঠবে?’ হাসল রানা। ‘রেডি হ’!

‘আমি রেডি।’

দু’হাতে শক্ত করে দড়ি ধরল রানা।

‘থ্রি... টু... ওয়ান... এবার!’

একই সময়ে পা সরিয়ে নিল ওরা, ঝুলে পড়েছে দড়িতে।

A-ফ্রেমে ঝট্যাং করে টানটান হলো দড়ি। দুলতে দুলতে সামনে গেল রানা-সোহেল, বাড়ি খেল দেয়ালে। কুয়ার ঠোঁটের দু’ফুট নীচে ঝুলছে। ধুপ্ করে নীচে গিয়ে পড়ল টায়ার।

‘একই সঙ্গে উঠব,’ বলল রানা। ‘নইলে অন্যজন আবার নীচে গিয়ে পড়ব।’

পাশাপাশি হয়েছে ওরা। দু’হাতে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্ত পর পৌঁছে গেল উপরের A-ফ্রেমের কাছে। ভীষণ জ্বলছে হাতের তালু। তাই বলে হাল ছাড়ছে না। উঠে এল কুয়ার নিচু দেয়ালে, ওটা টপকে ওদিকে ধুপ্ করে পড়ল।

মুখ খুবড়ে পড়েছে রানা, অখুশি নয়। ওর পাশেই ক্র্যাশ করা বিমানের মত নেমেছে সোহেল।

কয়েক মিনিট হাঁপিয়ে নিয়ে সুস্থির হলো ওরা।

ওদের মনে হলো, কয়েক যুগ ধরে বন্দি ছিল কুয়ার ভিতর।

চট্ করে বাম কবজি দেখল রানা। ওর ঘড়ি আছে মালের ওই গার্ডের কাছে। হাত তুলল পাটে বসা সূর্যের দিকে।

‘কী করিস?’ জানতে চাইল সোহেল।

‘সানডায়াল তৈরি করতে গিয়ে ডাক্তার মারলাম,’ হাল ছেড়ে দিল রানা। ‘তোমার তো ঘড়ি আছে, কয়টা বাজে?’

‘আমার ঘড়ির সময় তোকে দেখাব কেন?’

‘দুলাভাইকে দেখাতে হয়।’

‘চোপ, শালা! ...পৌনে সাতটা। খুন করতে চাওয়ার একঘণ্টা পেরোবার আগেই রেকর্ড টাইমে আবারও নেমে পড়েছি অ্যাকশনে।’

মরুভূমির উপর দিয়ে আগের পথ ধরেই ভেসে আসছে আরেকটা জেট বিমান। দম আটকে ফেলল রানা-সোহেল। ওটা যাবে ওদের মাথার উপর দিয়ে। ক্রমেই হয়ে উঠছে আরও বড়।

পলাতক আসামীর মত শুয়ে পড়ল ওরা কুয়ার নিচু দেয়ালের পাশে। অবশ্য চিন্তা না করলেও চলে। দেড় শ’ নট গতি তুলে আসছে পাইলট, চোখ রেখেছে সামনের রানওয়েতে। পিঁপড়ের মত দুই লোককে খুঁজে নেয়া তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু নীচে হয়তো চেয়ে আছে কোনও যাত্রী।

বিকট গর্জন ছেড়ে রানা-সোহেলের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বিমান। এবারেরটা গেছে আরেকটু উপর দিয়ে। এবারও অস্বাভাবিকতা দেখেছে রানা। পেটের নীচে বিমানের অদ্ভুত কী যেন। ফিউজেলাজের অনেকটা উপরে লেজের কাছে ডানায় পুরু বাক্সের মত এক সেকশনে দুই ইঞ্জিন। জেট বিমানটা দেখতে ডিসি-৯, সুপার ৮০ বা গালফস্ট্রিম জি৫ এয়ারক্রাফটের মত। দ্রুতগামী, কিন্তু বাইরের দিকে বাড়তি কিছু পার্টস।

‘আগেরটার মতই,’ বলল রানা। ‘রাশান মেড মনে হচ্ছে।’

সোহেল বলল, ‘কে জানে, হয়তো একই বিমান আরেক চক্রর কেটে গেল।’

ধূসর-সাদা বিমান নামবে সামনে কোথাও। হারিয়ে গেল বেশ কিছু বালির ঢিবির ওপাশে। পাওয়া গেল টাচডাউনের আওয়াজ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কমল ইঞ্জিনের গর্জন। চারপাশের মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল চাপা হুঙ্কার। পনেরো সেকেন্ড পর অনেক কমে গেল ওই শব্দ। www.boighar.com

‘থ্রাস্টার রিভার্সার,’ বলল সোহেল।

‘হ্যাঁ, ঈগল নেমেছে মাটিতে। এবার ওদের একটাকে নিয়ে ভাগতে হবে।’

মাথা কাত করে সায় দিল সোহেল।

‘স্যাটলাইট ফোটোতে এদিকে এয়ারক্রাফট আছে দেখিনি,’ বলল রানা। ‘তার কারণ বোধহয়, সারাদিন মরুভূমিতে থাকে না। রাতে নিয়ে আসে দরকারী কার্গো। আবারও উধাও হয় ভোরের আগেই।’

‘হঁ। কিন্তু এদের কাউন্টারে গেলেই টিকেট পাব না।’

‘কে চায় টিকেট,’ বলল রানা, ‘আমরা উঠব রাতের আঁধারে। কেউ জানে না আমরা বেঁচে আছি।’

‘অচেনা বিমানে চাপব?’ আপত্তির সুর সোহেলের কণ্ঠে, ‘জানিই তো না কোথায় যাবে।’

‘সঙ্গে পানি নেই,’ বলল রানা। ‘জিপিএস নেই বলেই বুঝব না কোথায় ভিডার্লিউ। তুই মরুভূমি হেঁটে পেরোতে চাস? নাকি আবারও ঢুকবি জায়েদের গুহায়?’

‘তা চাই না।’

‘মরুভূমিতে কঙ্কাল হয়ে পড়ে থাকতে না চাইলে, উঠতে হবে বিমানে,’ বলল রানা।

‘গলা শুকিয়ে গেছে আমার,’ বলল সোহেল।

‘আমারও।’

বেল্ট থেকে ক্যান্টিন নিয়ে বারকয়েক ঝাঁকি দিল সোহেল। আছে বড়জোর এক ঢোক পানি। ক্যান্টিন বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘নে।’

‘তুই খা।’

‘এত বড় পশু না আমি।’

‘তা হলে ভাগ কর।’

ক্যান্টিনের ছোট্ট কাপ নিয়ে খুব সাবধানে ওখানে পানি ঢালল
সোহেল, কাপ বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে।

ওটা নিয়ে চুমুক দিল রানা। ফেরত দিল কাপ।

দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেই ফুরিয়ে গেল ক্যান্টিনের পেট।
সোহেলের কণ্ঠে নেমেই শুকিয়ে গেল সামান্য পানি।

কুয়ার পাশ থেকে পিস্তল তুলে নিল রানা। ‘চল, এবার যাই।’

মাথা কাত করে সায় দিল সোহেল।

রওনা হয়ে গেল অকুতোভয় দুই বন্ধু।

তিন

বালির টিবির চূড়ায় শুয়ে আছে রানা-সোহেল। সাঁঝের আবছা
আলোয় চোখ রেখেছে শুকনো লেকে। আধ মাইল দূরে বিদঘুটে
দুই জেট বিমান। একটু আগে ওদিকে নেমেছে তৃতীয় আরও
একটা বিমান, একই আকার-আকৃতির। চুপ করে বসে আছে
রানওয়ের ডান পাশে।

বুক পকেট থেকে কমপ্যাঙ্ক বিনকিউলার বের করে কাঁচ থেকে
বালি ঝাড়ল রানা, তারপর চোখে লাগিয়ে তাকাল বিমানের
দিকে। ‘শুকনো লেকটাকে ব্যবহার করছে রানওয়ে হিসেবে।’

‘উদ্দেশ্য কী এদের?’

রাগী পিঁপড়ের মত ব্যস্ত ভঙ্গিতে গুহার ভেতর ঢুকছে-বেরুচ্ছে জায়দে বিন মনযুরের লোক, কী যেন করছে। কাছেই কয়েকটা ট্রাক। চলছে ইঞ্জিন, এগয়স্ট থেকে বেরোচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। নানান ইকুইপমেন্ট তুলছে তিনটে ফর্কলিফ্ট। টিলার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল এক ট্যাঙ্কার ট্রাক, বিমানের দিকে চলেছে শামুকের গতিতে।

‘টিলার ভেতরে নানাদিকে র‍্যাম্প আর টানেল,’ বলল রানা। বেরিয়ে আসছে একের পর এক লোক, আবারও উধাও হচ্ছে সুড়ঙ্গে।

‘দেখতে পেয়েছিস কী এনেছে?’ জানতে চাইল সোহেল।

এয়ারক্রাফটের পিছনে খুলে গেছে কার্গো দরজা। কিন্তু কিছুই নামানো হচ্ছে না ওদিক দিয়ে।

‘কিছু দিতে আসেনি,’ বলল রানা। ‘ওরা মাল নেবে। মনে হচ্ছে কোনও লোডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলছে তিন পাইলট।’

‘বিমানের লেজের নম্বর দেখা যায়?’ জানতে চাইল সোহেল। ‘পরে হয়তো কাজে আসবে।’

একটু আগে রক্তিম আলো ছড়িয়ে ডুবে গেছে সূর্য, ক্রমেই নেমে আসছে কালো আঁধার। কাছের এয়ারক্রাফটের পিছনে বিনকিউলার তাক করল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘সাদা লেজে কোনও মার্কিং নেই। সন্দেহ নেই রাশান বিমান।’

‘কোন্ টাইপের?’

‘মডিফায়েড মনে হচ্ছে। মেইন ল্যান্ডিং গিয়ারে ছয়টা চাকা। এএন-৭০ এমনই হয়। সি-১৩০ বা অন্য সব মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট বিমানের মতই টেইল র‍্যাম্প। কিন্তু আরও কিছু...’ চুপ হয়ে গেল রানা। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে এসব বিমান কী কাজে ব্যবহার করা হয়। কিছু দিন আগে পর্তুগালে দেখেছিল। আগুনের বিরুদ্ধে লড়ে এরা। ‘এগুলো অলটায়ার্স,’ বলল রানা। ‘বেরিভ বিই-২০০এস।

জেট পাওয়ার্ড ফ্লাইং বোট। অনায়াসেই নামবে নদী বা সাগরে। হাজার হাজার গ্যালন পানি নিয়ে উড়ে গিয়ে ফেলবে আগুনের উপর।’

কুঁচকে গেল সোহেলের ভুরু। ‘এই জিনিস দিয়ে কী করবে জায়েদ? এখানে আগুন কই? আর থাকলেও সেটা নেভাতে পানি পাবে কোথায়?’

রানা দেখল, সামনের জেট বিমানের পাশে হাজির হয়েছে ট্যাঙ্কার ট্রাক। ওদিকে চেয়ে হঠাৎ করে একটা ব্যাপার বুঝল ও। ‘এভাবেই সাগরে যায় ন্যানোবট।’

‘বা পানির রিয়ারভয়েরে,’ বলল সোহেল।

‘সামনের জেটপ্লেনে হুক লাগিয়ে দিয়েছে ট্যাঙ্কার ট্রাক,’ বলল রানা। ‘কিন্তু ওই বিমান মোটেই জেট এ বা জেপি-৪ না। ভুল জায়গায় থাকবে না ফিউয়েল পোর্ট। ধরে নে, ওরা অন্য কিছু পাম্প করছে হোল্ডে।’

‘তার মানে সব গুছিয়ে নিয়ে ভাগছে না,’ বলল সোহেল। ‘ড্যামের মডেল দেখে তোর কী মনে হয়েছে?’

জবাব না দিয়ে ওর হাতে বিনকিউলার দিল রানা। ‘ট্রাক বহরের পাশে দ্যাখ।’

চোখে বিনকিউলার লাগাল সোহেল। ‘হলদে সব ড্রাম।’

‘চিনতে পেরেছিস?’

‘হুঁ।’ মাথা দোলাল সোহেল। বিনকিউলার তাক করল এয়ারক্রাফটের উপর। ‘প্লেনে ড্রাম তুলছে না। বদলে লোড করছে ওয়েপস আর অ্যামিউনিশন। সিল টিম যেসব যোডিয়াক ব্যবহার করে, ওরকম কয়েকটা তুলে দিয়েছে। সঠিক সময়ে পানিতে নামাবে।’

‘কোথাও যাচ্ছে ওরা,’ আনমনে বলল রানা।

মরা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে ওদের গলা। জিভ হয়েছে

কাঁচা গোল্লার মত খসখসে । কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ।

‘যে মডেল ড্যামটা ভাঙল ন্যানোবট, তার সঙ্গে বোধহয় তোর ড্রাফটিং রুমের কারেন্ট ডায়াগ্রামের সম্পর্ক নেই,’ বলল রানা, ‘ভারত মহাসাগরের কাহিনি আলাদা ।’

‘তার মানে আলাদা দুটো টার্গেট?’

আরও গম্ভীর হলো রানা । ‘দু’ধরনের ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা । দু’ভাবে বহন করবে ন্যানোবট ।’

‘আমরা বোধহয় আগুরএস্টিমেট করে ফেলেছি জায়েদকে ।’

‘আমারও তাই ধারণা ।’

‘তো কী করবি?’

‘আমার প্রথম প্ল্যান ছিল বিমান নিয়ে বেরিয়ে যাব,’ বলল রানা । ‘কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, দুটো প্ল্যান চাই । বিমানে চড়বি, না ট্রাকে?’

‘নিঃসন্দেহে ট্রাকে,’ বলল সোহেল ।

‘বিমান নয় কেন?’ বিস্মিত হলো রানা । ‘জলদি করে ভাগতে পারতি । চাইলে কেড়েও নিতে পারতি বিমান ।’

‘ওই মাল কখনও চালাইনি । আর ইজরায়েলি বা সৌদি বর্ডার, সেভেঙ্চু ফ্লিট, তাদের নো-ফ্লাই যোন... মিডল ইস্ট পেরোতে গিয়ে মরতে পারি রকেট খেয়ে । তোরও উচিত হবে না বিমান হাইজ্যাক করা ।’

ভুল বলেনি সোহেল, ভাবল রানা ।

‘ভয়ঙ্কর কোনও জায়গায় গিয়ে নামলে?’ বলল সোহেল, ‘ভেবে দ্যাখ, ট্রাকে করে গেলে যাব রাস্তা ধরে । একবার একটায় চেপে বসলেই পাব লোকালয় ।’

‘সঙ্গে কোটি কোটি ন্যানোবট,’ বলল রানা ।

বিনকিউলার দিয়ে হলদে ড্রামগুলো দেখল সোহেল । ট্রাকের বেডে সারি দিয়ে রাখা ওই জিনিস । ‘জায়েদের লোক যেভাবে

ড্রাম থেকে সরে থাকছে, ওরা ভাল করেই জানে ভেতরে কী। আর এজন্যে কপাল খুলতে পারে আমাদের। চট করে ধরা পড়ব না। আবারও ফেলতে পারবে না কুয়ায়।’

চুপ করে আছে রানা।

‘আরও কথা আছে,’ সোহেল ধরে নিয়েছে জিতে গেছে তর্কে, ‘ধরা পড়ে গেলে ট্রাক থেকে নেমে যাব এক লাফে। তিরিশ হাজার ফুট উপর থেকে ঝাঁপাতে হবে না।’

‘তোর কথাই ঠিক,’ কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা।

‘তা হলে বিমানে উঠবি না, এই তো?’ স্বস্তি পেল সোহেল।

‘তোর প্রতিটা কথা ঠিক।’

রানার হাতে বিনকিউলার দিল সোহেল, খুশি যে বোঝাতে পেরেছে বন্ধুকে। চাপড়ে নিল ইউনিফর্ম। ‘চল, রওনা হই।’

বুক পকেটে বিনকিউলার রাখল রানা। ‘হ্যাঁ, চল।’

চন্দ্রহীন নিকষ কালো রাত ঝাঁপিয়ে পড়েছে মরুভূমির বুকে। একই সঙ্গে চলছে রাশান জেট বিমানের লোডিং আর সার্ভিসিং। আলো বলতে কয়েকটা স্পটলাইট, রাখা হয়েছে কয়েকটা জিপ বা হামভির উপর।

আলোকিত এলাকা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন নয়। ঘন কালো মরুভূমি পাড়ি দিয়ে বিমানের কাছে পৌঁছে গেল রানা-সোহেল।

অপারেশন এরিয়ায় ঢুকবার আগেই কাফিয়ে দিয়ে মুখ-মাথা ঢেকে নিয়েছে ওরা। পোশাক নোংরা, তাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। লোডিঙে ব্যস্ত লোকগুলোর পরনেও একই পোশাক।

‘হাতে কিছু নে,’ বলল রানা।

ইকুইপমেন্টের ছোট একটা ক্রেট তুলে নিল সোহেল, ‘ভাল হলো। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত।’

নিজেও একটা ক্রেট হাতে হাঁটতে শুরু করেছে রানা। চট করে দেখে নিল, কেউ চেয়ে নেই ওদের দিকে। চলল ওরা

বিমানের দিকে। অবশ্য, রানার চোখ গেল এক ডজন ড্রামের উপর। আরও গোটা পঞ্চাশেক ড্রাম তুলে দেয়া হয়েছে ট্রাকে।

সোহেলকে হাতের ইশারা করে ন্যানোবটের ড্রামের দিকে চলল রানা। অন্ধকারে একটু দূরে একটা ফর্কলিফটের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুকছে ওটার ড্রাইভার আর হেল্লার। ড্রাইভার আফসোস করে বলছে, তার ছেলে ক্লাস টেনে উঠেছে, এখন আর ওর কথা শুনতে চায় না, এখুনি বিয়ে করতে চায়।

ড্রাইভারের সাগরেদ সান্ত্বনা দিচ্ছে তাকে।

একবার পরস্পরকে দেখে নিয়ে দু'দিকে রওনা হয়ে গেল রানা ও সোহেল। দু'মিনিট পর লোক দু'জনের পিছনে উদয় হলো সাক্ষাৎ পিশাচের মত। ড্রাইভারের মাথার তালুতে নামল রানার পিস্তলের বাঁট। ধুপ করে পড়ল লোকটা বালির ওপর। একই সময়ে সোহেলের হাতের দড়ির প্যাঁচে শ্বাস আটকে গেছে হেল্লারের। ছটফট করছে, ঠিক তখনই রানার পিস্তলের নল নামল তার ঘাড়ের পাশে। মাপা হাতের কাজ, অন্তত একটা ঘণ্টা ঘুমাবে। ড্রাইভারের পাশে সটান হয়েছে সে, অচেতন। চট করে চারপাশ দেখে নিল রানা-সোহেল। আশপাশে কেউ নেই। দু'মিনিট পেরোবার আগেই ফর্কলিফটের ক্যাবে নিঃসাড় দেহ দুটো তুলে ফেলল ওরা।

প্রায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে নেমে এল নীচে। ড্রাইভারের প্যাকেট থেকে এক শলা সিগারেট এনেছে সোহেল, ওটা জ্বেলে নিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টানল। রানা কী যেন বলতে গিয়েও থমকে গেল। খানিকটা দূরে ওদের উদ্দেশে আরবিতে নির্দেশ দিচ্ছে কে যেন!

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা।

দাড়িওয়ালা সেই লোক। টেস্টিং রুমে জায়েদের পিছনে ছিল। অলস গাধা বলে ধমক মারছে কর্মীদের।

রানাদের দিকেই আঙুল তাক করল সে। আরেক চিৎকার ছেড়ে ওদের বলল ফর্কলিফটে উঠতে।

হাতের ইশারায় রানা বুঝিয়ে দিল হুকুম পালন করবে।

‘এই জিনিস চালু করতে বলছে ব্যাটা,’ রানার পাশে হাঁটছে সোহেল। ‘নতুন ধরনের মনে হচ্ছে। কখনও চালিয়ে দেখেছিস?’

‘এটা? না! খুব কঠিন হবে না বোধহয়।’

অপেক্ষা করল সোহেল। ধূসর-নীল ফর্কলিফটের কেবিনে উঠল রানা। ঝটপট দেখে নিতে চাইল কন্ট্রোল লিভারগুলো।

আবারও চিৎকার জুড়েছে খালিফ বিন আদনান।

‘দেরি না করে ইঞ্জিন চালু কর, ব্যাটা!’ নিচু স্বরে তাড়া দিল সোহেল।

ইগনিশনে চাবি আছে। মুচড়ে দিল রানা। ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে চালু হলো ইঞ্জিন। ‘আয়, উঠে পড়!’

ক্যাবের পাশের বোর্ডে চাপল সোহেল। ক্লাচ চেপে প্রথম গিয়ার ফেলল রানা। এই রিগে সবমিলে তিনটে গিয়ার। লো, হাই আর রিভার্স। অ্যাক্সেলারেটর চাপতেই সামনে বাড়ার কথা, কিন্তু কিছুই হলো না।

‘আমরা কিন্তু নড়ছি না রে!’ হতাশ সুরে বলল সোহেল।

‘জানি।’ ক্লাচের উপর থেকে পা সরাল রানা, সেই সঙ্গে বাড়াল অ্যাক্সেলারেটরের চাপ। গর্জন ছাড়ল ইঞ্জিন, সামান্য হেঁচট খেয়ে রওনা হলো সামনে।

‘সাবধানে যা, ধরা খাব তো!’ সতর্ক করল সোহেল।

অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে খালিফ বিন আদনান, হাতের ইশারা করে দেখিয়ে দিল হলদে ড্রামের সারি। ওগুলো রাখা আছে একটা প্যালেটের উপর।

গাড়ি ঘুরিয়ে ওদিকে চলল রানা। হলদে ড্রামের একটা প্যালেট তুলে নিয়েছে আরেক ফর্কলিফট। ড্রাইভার কাজটা

করতেই দ্বিতীয় এক কর্মী ভালভাবে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে দিল ড্রাম। কেউ চাইছে না ভিতরের জিনিস ছলকে পড়ুক।

রিভার্সে গেল ফর্কলিফট, ঘুরে চলল গন্তব্যের দিকে। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে আছে সহকারী।

‘বুঝতে পেরেছিস তোর কাজ কী?’ বলল রানা।

‘হুকুম দেয়া মাত্র।’

‘শিকল খুঁজে বের কর।’

ফর্কলিফটের রুফ গার্ডে শিকল পেল সোহেল। ওটা খুলে লাফ দিয়ে নামল মরুভূমিতে। চলেছে হলদে ড্রামের দিকে। বড় মেশিন, সামলে রাখতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে রানা। অবশ্য, ঠিক জায়গার কাছে চলে গেল। নতুন উৎসাহ নিয়ে ফর্ক লিভার ধরল। নীচের দিকে নেমে গেল ফর্ক। কিন্তু ওগুলোর নাক তাক করে আছে ভিন্ন দিকে। আরেকটু হলে ফুটো করে দিত হলদে ড্রাম।

কষে ব্রেক চাপল রানা। প্যালেটের একটু আগেই থেমে গেল ফর্কলিফট। ফর্ক নামিয়ে একটু দূরে সোহেলকে দেখল ও। থামতে বলছে, চোখ বিস্ফারিত। ওকে দোষ দেয়া যায় না। পরের চেষ্টায় সঠিক উচ্চতা আর অ্যাংগেল পেয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়ল ফর্ক, তুলে নিল প্যালেট।

শিকল দিয়ে আচ্ছামত ড্রামগুলো বাঁধল সোহেল, তারপর হাত তুলে রানাকে বুঝিয়ে দিল, এবার সরে যেতে হবে।

খুব সাবধানে পিছিয়ে ঘুরল রানা, রওনা হয়ে গেল সামনে। রিগের নাকের কাছে হলদে ড্রামের ওজনে আগের চেয়ে ভালভাবে চলছে গাড়ি।

ধীর গতি তুলে ট্রাকের বহরের দিকে চলল রানা। এই পথেই গেছে অন্য সব ফর্কলিফট।

সবমিলে পাঁচটা ট্রাক। প্রতিটা ফ্ল্যাটবেড। ধাতব পাঁজরের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে ক্যানভাসের তারপুলিন। মনে হলো

প্রথম ট্রাকের বেড ভরে গেছে ড্রামে। অন্য ট্রাকে তোলা হচ্ছে এখন।

বহরের শেষ ট্রাকের দিকে ইশারা করল খালিফ।

ওদিকেই চলল রানা। থামল ট্রাকের রিয়ার বাম্পারের পিছনে। উপরে তুলল ফর্ক। ওটা ট্রাকের বেডের সমান হতেই কাজে নামল সোহেল। ড্রাম থেকে খুলল শিকল। প্যাালেটের নীচে চাকা, ঠেলা দিতেই অনায়াসে ট্রাকে উঠে গেল ড্রামভরা প্যাালেট।

এবার নতুন করে শিকল দিয়ে ড্রাম বাঁধল সোহেল, উঠে এল ফর্কলিফটের পাশে। বন্ধুকে বলল, ‘একেই বলে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো।’

ফর্কলিফট ঘুরিয়ে ফিরতি পথে চলল রানা। ‘রিপোর্টে নিশ্চয়ই বুড়োকে এসব বলবি না তুই? কিছু কথা চেপে যাওয়াই ভাল।’

‘কী বলছিস?’ অবাক হলো সোহেল।

‘এক কাঠি সরেস তুই,’ হাসল রানা। ‘শেষ ড্রাম ট্রাকে তোলার পর ওখানেই রয়ে যাবি। আর আমিও এটা পার্ক করে রেখে এসে গোপনে উঠব তোর ট্রাকে।’

ভাল পরিকল্পনা।

কাজও হচ্ছে ঠিকভাবেই।

কিছুক্ষণ পর শেষ চালানের ব্যারেলের দিকে চলল রানার ফর্কলিফট। আর তখনই সুড়ঙ্গ থেকে লোকজন সহ বেরিয়ে এল জায়েদ বিন মনযুর।

ট্রাফিক পুলিশের মত হাত প্রসারিত করল খালিফ। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সব ব্যস্ততা। জায়েদের সামনে গিয়ে থামল লোকটা।

ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা। মনে আশা, কথা শুনতে পাবে।

আরেকদল লোক জড় হলো জায়েদের সামনে। তাদের সঙ্গে রয়েছে সুন্দরী জ্যাসিণ্টা কাপুল।

‘একে সঙ্গে নিতে চান?’ জানতে চাইল খালিফ।

‘হ্যাঁ,’ বলল জায়েদ। ‘এই কমপ্লেক্স আর নিরাপদ নয়।’

‘আমি যোগাযোগ করেছি সেরেংগেরেল বাদসাইখানের সঙ্গে,’ বলল খালিফ, ‘আপনি তো জানেন, মঙ্গোলরা গাদ্দার, কিন্তু ধরা পড়েনি। বাদসাইখানই পাঠিয়েছিল এসআইএস ডেপুটি চিফ জাফর লালাকে। লোকটা সহজে ভুলবে না চাবুক মারা হয়েছে তার হলুদ পাছায়। এখন বাধ্য হয়েই অনেক বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে, জানতে চায় আরও ফাণ্ড লাগবে কি না। আর সে-সুযোগে নিজেদের হাতে সব নিয়ন্ত্রণ তুলে নেব আমরা।’

‘মঙ্গোলদের নিয়ে ভাবছি না,’ বলল জায়েদ, ‘আমেরিকার পা চাটা ওই বেয়াড়া লোকটা ঠিকই বলেছিল। এবার হামলা করবে আমেরিকানরা। কোনও দেশের সীমান্ত মানছে না ওরা। আমরা এখানে থাকলে বিপদে পড়ব।’

‘ঠিক বলেছেন, আসবে ওরা,’ বলল খালিফ।

‘নতুন হেডকোয়ার্টার লাগবে,’ জোর দিয়ে বলল জায়েদ। ‘এমন একটা, যেটার কথা কেউ ভাবতেও পারবে না। পুরো নিশ্চিত হতে হবে, যেন আমাদের কাজে ঝামেলা করতে না পারে কেউ।’

মেয়েটির দিকে আঙুল তাক করল জায়েদ। ‘মালামাল তোলা পর্যন্ত একে আটকে রাখবে। তারপর তুলে দেবে তৃতীয় প্লেনে। ওটাতে থাকবে অল্প কয়েকজন। চাই না ওর সঙ্গে আবার মাখামাখি করুক কেউ।’

‘বেশ। পাহারার ব্যবস্থা করব,’ কথা দিল খালিফ।

‘বুঝলে, ওর মন ভেঙে দেয়া হয়েছে,’ বলল জায়েদ। ‘শীঘ্রি আমার কথা মত উঠবে-বসবে। কিন্তু পাহারার কথা যখন উঠল, পাহারা দেয় যেন কমপক্ষে দু’জন। তাদের বলে দেবে, কেউ ওকে একটু ছুঁলেই তাকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারব আমি।’

মাথা দোলাল খালিফ। সবার মাঝ থেকে বাছাই করে নিল

দু'জনকে। তারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল জ্যাসিস্টিকে একটা জিপের কাছে। তুলে দিল পিছনে।

চট করে পরস্পরকে দেখল রানা-সোহেল।

নতুন করে ইঞ্জিন চালু করল রানা। চুপচাপ চলল শেষ হলুদ ড্রামগুলোর দিকে। দক্ষতার সঙ্গে তুলে নিল প্যাালেট, আর শিকল দিয়ে ড্রাম বাঁধল সোহেল। ঘুরে আবারও রওনা হলো ফর্কলিফট।

‘জানি তুই কী ভাবছিস,’ বলল সোহেল।

‘কথা দিয়ে ভোলাতে চাস নে,’ বলল রানা।

‘না, মানা করব না,’ বলল সোহেল। ‘তুই কি চাস্ আমি তোর সঙ্গে আসি?’

‘ভাল হতো, কিন্তু তা সম্ভব না,’ বলল রানা। ‘এসব ড্রাম কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জানা তোর কাজ। প্রয়োজনে যেভাবে হোক ঠেকাবি এদের। কাজেই দু'জনের কাজ এখন আলাদা।’

টিটকারির ভঙ্গিতে বলল সোহেল, ‘আজ দু'জনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে...’ বাকিটুকু বলতে পারল না চাঁটি খেয়ে।

ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ড্রাম তুলে দিতে শুরু করল রানা-সোহেল।

‘একবার গ্রাম বা শহর পেলেই যোগাযোগ করবি বসের সঙ্গে,’ বলল রানা। ‘আসিফ আর তানিয়াকেও জানিয়ে দিবি, ওদের সঙ্গে ওই মেয়ে যে নকল।’

মাথা দোলাল সোহেল। ‘আসল মেয়েটাকে পেলে বোলতার চাক থেকে সরে পড়তে দেরি করিস না।’

প্যাালেটের ড্রাম সরাতে শুরু করেছে ও।

‘বোলতার চাক?’ বলল রানা। ‘আমার মনে হচ্ছে জায়েদের ওটা সিংহের গুহা।’

‘সিংহ আকাশে ওঠে না,’ বলল সোহেল, ‘তুই আকাশে উঠলে দেখবি ওটা বোলতারই চাক।’

‘নিজেও সাবধান থাকিস,’ বলল রানা। ‘আর শুধু মেয়েটার জন্যে যাচ্ছি না, তুইও জানিস। আমাদের জানতে হবে, কোথায় সরিয়ে নিচ্ছে ব্যাটা ওর হেডকোয়ার্টার।’

পরস্পরের চোখে তাকাল দুই বন্ধু। একের পর এক অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করেছে পাশাপাশি। ঝাঁপিয়ে পড়েছে একজন আরেকজনের বিপদে। সব সময় ভেবেছে, বাঁচলে একসঙ্গে, মরলে একসঙ্গে। এখন আলাদা হতে হচ্ছে বলে মন খারাপ। এ ছাড়া উপায়ও নেই। ওদিকে মস্ত বিপদে আছে ওদের বন্ধুরা। ভয়ঙ্কর অশুভ কোনও পরিকল্পনা করছে জায়েদ বিন মনযুর, যেমন করে হোক তাকে ঠেকাতে হবে।

‘তুই তা হলে সত্যিই বিমানে উঠবি?’ বলল সোহেল।

‘আরে! এতক্ষণ কী বললাম?’ মাথা দোলাল রানা। ‘তুই যাবি রাস্তা দিয়ে, আর আমি আকাশ পথে। তুই হয়তো আগেই পৌঁছবি কোনও শহরে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবি।’

‘হয়তো পারব।’ ড্রাম সরাতে শুরু করেছে সোহেল।

‘আর... কেউ আমাদের মেরে না ফেললে, ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে দেরিতে গিয়ে পৌঁছবে যে, অন্যজনের ইচ্ছামত ডিনার কিনবে সে।’

‘ঠিক আছে,’ ড্রামগুলো শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছে সোহেল।

মরুভূমি পাড়ি দেয়ার ক্রস-কান্ট্রি ট্রাক নয় এগুলো, খেয়াল করল রানা। সোহেল যাবে সড়ক পথে। যাওয়ার পথে পেয়ে যাবে কোনও শহর। ওখানে গলা ভিজাতে পারবে, যোগাযোগ করতে পারবে বিসিআই অফিসে। রানা টের পেল, ওর নিজের গন্তব্য অনেক অনিশ্চিত।

ড্রামের উপরের তারপুলিন টেনে নিতে শুরু করেছে সোহেল। একবার রানাকে দেখে নিয়ে বলল, ‘ভাল থাকিস, দোস্ত।’

‘তুইও,’ বলল রানা। ‘ভুলিস না, ডিনারটা যে তুই খাওয়াবি।’

তারপুলিনের নীচে উধাও হয়েছে সোহেল। ফর্কলিফট ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো রানা, একবারও ঘুরে চাইল না পিছনে।

এবার গোপনে উঠতে হবে ওকে নির্দিষ্ট বিমানে। ছুটিয়ে নিতে হবে সত্যিকারের জ্যাসিণ্টা কাপুলকে।

চার

সামনে হলদে ড্রামের সারি নিয়ে ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে গুড়ি মেরে বসে আছে সোহেল আহমেদ, পিছনে স্টিলের দেয়াল। কেউ দেখেনি ও রয়ে গেছে ট্রাকে। ড্রাম গুনতে আসেনি কেউ। সবই ঠিক আছে ধরে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়ে গেছে তারপুলিন।

কানের কাছে ‘খটাং!’ আওয়াজ পেল সোহেল। কয়েক মুহূর্ত পর ‘ধুপ!’—ইঞ্জিন চালু করে গিয়ার ফেলে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেছে ড্রাইভার মরুপথে।

ঘণ্টায় দু’ঘণ্টায় থামল ট্রাক, তখন গোপনে চারপাশ দেখে নিল সোহেল। অবশ্য, আঁধার বালির ধূ-ধূ প্রান্তর আর কনভয়ের অন্য ট্রাক ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। কোথায় চলেছে বুঝতে গিয়ে হতাশ হতে হয়েছে ওকে।

অবশেষে চার ঘণ্টা চলবার পর কমল গতি।

বোধহয় বিশ্রামের জন্যে থামবে, ভাবল সোহেল। ক্যানভাস তুলে সাবধানে উঁকি দিল। কোনও গ্রাম বা শহর দেখা গেল না। একটু পর থামল ট্রাকের বহর। কিন্তু চালু থাকল ইঞ্জিন।

এ সুযোগে সরে যাব, ভাবল সোহেল। আগে মরুভূমিতে

নামা উচিত হতো না, কারণ জানত না কোথায় আছে। পানি ছাড়া মরুভূমির ভিতর এক দিনও টিকত না। কিন্তু এবার নামতে পারবে, এখান থেকে বেশি দূরে থাকবার কথা নয় গ্রাম বা শহর।

নেমে পড়ব, দ্বিতীয়বার ভাবল সোহেল। কিন্তু তাতে সমস্যা আছে। ওর ট্রাক আছে কনভয়ের সামনে। পিছনের ট্রাকগুলোর হেডলাইট দিন করে রেখেছে এদিকটা। নামলেই ধরা পড়বে। আরও ভাল কোনও সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে।

আঁধার থেকে এল একের পর এক নির্দেশ। হোঁচট খেয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়ল ট্রাক। মনে হলো পেরোতে শুরু করেছে একটা বাঁক। সামনের আর পিছনের চাকা পেরোল স্পিড ব্রেকারের মত কিছু। এদিক-ওদিক দুলতে লাগল হলদে ড্রাম। কাছেরটা ধরে নিজেকে সামলে নিল সোহেল।

‘আরে, শালা, আস্তে যা,’ বিড়বিড় করল।

নীচে নাক তাক করেছে ট্রাক। বোধহয় চেপেছে কোনও র‍্যাম্পে। নড়ছে শিকল দিয়ে বাঁধা ড্রাম, চেপে আসতে চাইছে। চেপ্টে গিয়ে মরব না কি! ভয় পেয়ে গেল সোহেল।

অবশ্য, পঞ্চাশ ফুট যেতেই সমান হলো ট্রাক। মসৃণভাবে চলেছে সমতল জায়গায়। আবারও থামল। ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ড্রাইভার আর তার প্যাসেঞ্জার। কাছে চলে এল দ্বিতীয় ট্রাক। ওটার হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করেছে সোহেলের নীল তারপুলিন।

মনোযোগ দিয়ে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনছে সোহেল। চিৎকার করে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে একের পর এক। তৈরি হচ্ছে প্রতিটি শব্দের প্রতিধ্বনি। মরুভূমির পথে চলবার সময় বারবার ঝাঁকি খেয়েছে ট্রাক, কিন্তু এইমাত্র বন্ধ করে দেয়া হলো ইঞ্জিন।

‘আমি আছি কোনও ওয়্যারহাউসে,’ ভাবল সোহেল।

তার মানে খুব কাছেই আছে শহর বা গ্রাম। ওখানে থাকবে

কমপিউটার বা ফোন। মেটাতে পারবে তৃষ্ণাও। পানির কথা ভাবতে গিয়ে মৃদু হেসে ফেলল সোহেল।

ইঞ্চিঃ ইঞ্চিঃ করে ওর ট্রাকের পিছনে এসে থামল দ্বিতীয় ট্রাক। বন্ধ হলো ইঞ্জিন। হাসিটা আরও চওড়া হলো সোহেলের। আর চিন্তা নেই। রাতের মত থেমেছে ট্রাকের কনভয়।

লোকগুলো সরে গেলেই রাতের আঁধারে হাওয়া হয়ে যাবে ও।

বন্ধ ওয়্যারহাউসে ইঞ্জিনের ডিজেল পোড়া গন্ধ। অল্প জায়গায় পার্ক করা হচ্ছে ট্রাক। একটু পর থেমে গেল শেষ ইঞ্জিনটাও। একটু পর দূরে সরে যেতে লাগল কথাবার্তার আওয়াজ।

‘শালারা গেছে,’ বিড়বিড় করল সোহেল, ‘এবার সরে যাব।’

দূর থেকে দূরে সরছে লোকগুলোর কণ্ঠের আওয়াজ। তারপর থেমে গেল সব। বন্ধ করে দেয়ার আওয়াজ হলো ভারী ধাতব দরজা। সোহেল বুঝে গেছে, এখন ও একেবারে একা।

অধৈর্য হলো না, অপেক্ষা করল চুপচাপ।

কয়েক মিনিট পর বুঝল, কেউ নেই এদিকে। এখন বেরিয়ে যেতে পারবে। গার্ড থেকে থাকলেও আছে বাইরে। ওয়্যারহাউসে কাউকে ঢুকতে দেবে না, সেজন্য পাহারা দিচ্ছে।

হলদে ড্রাম এড়িয়ে ট্রাকের পিছনে চলল সোহেল। ভাবল, ভাল হতো রানা সঙ্গে এলে। কয়েক মিনিট পর ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে যাবে ও। ফোনে যোগাযোগ করবে বিসিআই অফিসে। চিফ কথা বলবেন নুমা চিফের সঙ্গে। তিনি আবার যোগাযোগ করবেন ইউএস আর্মিতে, জানিয়ে দেবেন বিই-২০০এস বিমানের কথা। স্যাটালাইট সুইপ করলেই জানা যাবে কোথায় চলেছে ওসব বিমান। রওনা হবে স্পেশাল ফোর্স। রানা এত ঝুঁকি না নিলেও পারত। মস্ত বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটা মাত্র নাইন এমএম পিস্তল নিয়ে। অথচ অনায়াসেই ইউএস আর্মির

স্পেশাল ফোর্সের লোক হাসতে হাসতে উদ্ধার করবে জ্যাসিগ্টি কাপুলকে। ধ্যাৎ, আসলে এর কোনও মানে আছে?

এবার আমেরিকানদের জানিয়ে দেবে ও রানা আর জ্যাসিগ্টির খোঁজ, তা হলেই ঝামেলা থেকে রক্ষা পাবে ওরা, ভাবল সোহেল। ঠোঁটে ফুটে উঠল মৃদু হাসি, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ডিনারে আর পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না ওকে। এবার যাবে কোথায় রানা!

ট্রাকের পিছনে পৌঁছে গেল সোহেল, তারপুলিন একটু উঁচু করে তাকাল এদিক-ওদিকে। ওয়্যারহাউসের ভিতর কোনও আলো নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওর ট্রাকের লেজে আরেকটা ট্রাকের নাক।

‘ব্যাপারটা কী?’

ভাল করেই পার্ক করেছে পিছনের ড্রাইভার।

আবারও কান পাতল সোহেল। কোথাও আওয়াজ নেই। না, আছে। দূরে গুমগুম আওয়াজটা কীসের? যেন দেয়ালের ওপাশে চলছে শক্তিশালী কোনও ইঞ্জিন। কিন্তু ওই ইঞ্জিন ট্রাকের নয়, দূরের কোনও মালগাড়ির ইঞ্জিনের মত। মালগাড়ি মানেই রেললাইন। ওটা কোথাও যাবে। আরও খুশি হয়ে উঠল সোহেল।

খুলে ফেলল পিছনের ফ্ল্যাপ। আস্তে করে নেমে পড়ল দুই ট্রাকের মাঝে। কিন্তু কেমন ঘুরে উঠল মাথা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকেছে বলেই বোধহয়। তা ছাড়া, পানি আর খাবারের অভাবেও এমন হতে পারে।

দ্বিতীয় ট্রাকের হুডে হাত রাখল সোহেল। সামলে নিতে চাইল নিজেকে। দুই সারি ট্রাকের মাঝে আছে ও। খুব চাপাচাপি করে রাখা হয়েছে ট্রাক। রিয়ার ভিউ মিরর গুটিয়ে রাখা, নইলে ভেঙে যেত।

দুই সারি ট্রাকের মাঝ দিয়ে যাওয়ার জন্য আছে সরু একটা

জায়গা। ট্রাকের কনভয়ের পিছনে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল
সোহেল। ওদিকেই আছে ধাতব দরজা।

কিন্তু আবারও ঘুরে উঠল মাথা, আরেকটু হলে টলে পড়ছিল।
ভয় পেল, ড্রাম থেকে বেরিয়ে ওর কানে ঢুকেছে ন্যানোবট?

আসলে জিনিসগুলো এতই ছোট, চোখেও দেখা যায় না।

‘কী হচ্ছে আমার...’ বিড়বিড় করল।

এক সেকেন্ড পর ফিরে পেল ভারসাম্য। পরক্ষণে বনবন করে
ঘুরল মাথা। যেন পিছন থেকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ওর হাঁটু আর
ঘাড়। শুনতে পেল ক্যাচকোঁচ আওয়াজ।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হতে চাইল সোহেল। আবারও
ঘুরতে শুরু করেছে মাথা। এটা সামান্য কোনও মাথাঘোরা নয়।
এমন নয় যে, হামলা করেছে ন্যানোবট, আসলে সমস্যা অন্য
কোথাও।

বুকের ভিতর ধূপ-ধাপ শব্দে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ট্রাকের সারির
মাঝ দিয়ে হাঁটতে চাইল সোহেল। মেঝে লোহার। ট্রাকের শেষে
লোহার মস্ত দরজা। পায়ের নীচে দুলছে মেঝে। এদিক-ওদিক
সরে উঠছে-নামছে! তার একটা ছন্দ আছে!

বহু দূর থেকে ভেসে এল ফগহর্নের আওয়াজ।

আঁধারে বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন সোহেল নিশ্চিত হয়ে
গেল, ও আছে একটা জাহাজে।

এটা কোনও ওয়্যারহাউস নয়।

কোনও মালবাহী জাহাজ।

ডানে-বামে সরে উপরে-নীচে নড়ছে ডেক।

খুঁজে নিল পিছনের দরজার ল্যাচ। বাইরে থেকে আটকানো
ভারী বল্টু।

মনে পড়ল রানার সঙ্গে ওর কথা, সড়ক পথে গেলে যখন
খুশি ট্রাক থেকে নেমে পড়তে পারবে।

‘যা-স্না!’ বিড়বিড় করল সোহেল। ন্যানোবটের ট্রাক এসে উঠেছে এখানে। আর ওল কচুর জাহাজ কোথায় যাবে কে জানে!

পাঁচ

বিশী, নোংরা এক টয়লেটে আশ্রয় নিয়েছে মাসুদ রানা। ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ মুহূর্তে কাজটা মোটেই উচিত হবে না। অসংখ্য ইকুইপমেন্ট ভরা জায়গা বিন মনষুরের তৃতীয় বিমান এটা। ভেতরে লোকজন নেই বললেই চলে। এখন কার্গো কমপার্টমেন্টের সামনের টয়লেটে সৈঁধিয়ে অপেক্ষা করছে নাকে রুমাল চেপে। এই জঘন্য পরিস্থিতিতে ভাঙা কল থেকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মিটিয়েছে আকর্ষণ তৃষ্ণা। এখন দুই পা ঠিকভাবে রেখে দাঁড়িয়ে আছে কমোডের ওপর। দরজার পাশ দিয়ে গেলে কেউ দেখবে না ওর পা।

টেনে দিয়েছে দরজার কোঁচকানো পর্দা। কান পেতে শুনছে রানা। একের পর এক মস্ত সব ক্রেট ভর্তি ইকুইপমেন্ট তোলা হচ্ছে বিমানে। ব্যস্ত হাতে বেঁধে রাখা হচ্ছে খুঁটির সঙ্গে। ভারী জিনিস সরাবার সময় মাঝে মাঝে অভিশাপ দিচ্ছে কেউ কেউ। কী যেন পড়ল ধুম্ করে। কিছুক্ষণ পর আরবিতে আলাপ শুরু করল দুই পাইলট, খাটো মই বেয়ে উঠে গেল ফ্লাইট ডেকে।

কর্কশ স্বরে নির্দেশ দেয়া হলো কাউকে।

জবাবে ইংরেজি বলে উঠল এক মহিলা কণ্ঠ: ‘প্লিথ! যাচ্ছি, দয়া করে পিঠে ধাক্কা দেবেন না!’

জায়েদ বিন মনযুরের সুড়ঙ্গের সেই মেয়ে, আন্দাজ করল রানা। জ্যাকো কাপুলের আসল বোন। তার মানে, ঠিক বিমানেই উঠেছে ও।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গর্জন ছাড়ল এয়ারক্রাফট। কমোডোর উপর রানার টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠল। ট্যাক্সিইং করে রানওয়েতে উঠল রাশান ফ্লাইং বোট। ফুল পাওয়ার দিতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। রক্ষ বালির লেকের উপর দিয়ে ছুটল তুমুল গতি তুলে। রানার মনে হলো, অনন্তকাল পর টেকঅফ করল ওরা। ক্রমেই বাতাস কেটে উঠেছে বিমান ওপরে। ভারী মালামাল আর পেট ভরা ফিউয়েল, তাই গতি স্লথ। গন্তব্য হয়তো বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে।

আগে হোক বা পরে, কেউ না কেউ ঢুকবে টয়লেটে। জ্যাসিন্টা এলে তার সঙ্গে কথা বলে বোঝাতে পারবে, ওকে সরিয়ে নিতে এসেছে। দুই পাইলটের কেউ এলে, তার কপালে পিস্তল ধরে নিয়ে যাবে ককপিটে। দখল করে নেবে বিমান। আর জ্যাসিন্টার দু'গার্ডের কেউ এলে, ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে তাকে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে প্রথমে এল গার্ডদের একজন।

দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে আকাশে।

বিমানের পিছনে তার বুটের আওয়াজ পেল রানা। গটমট করে আসছে এদিকে। শক্ত হাতে পিস্তলের বাঁট ধরল ও, ক্রুযিটের মত টয়লেটে সম্পূর্ণ তৈরি। www.boighar.com

খপ্প করে পর্দা ধরল লোকটা, কিন্তু হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে না দিয়ে ঘুরে চাইল বিমানের পিছনে। সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল আরবি নোংরা কৌতুক। খ্যাক-খ্যাক করে হাসল তার সঙ্গী।

ঘুরে টয়লেটে ঢুকল গার্ড, মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। মুখে চেঁপে বসেছে একটা হাত, সাঁই করে মাথার তালুর উপর নামল কী যেন। চোখের সামনে কোটি কোটি নক্ষত্র

দেখল সে। বুঝল না কখন হারিয়েছে চেতনা। খপ্ করে ধরা হয়েছে ঘাড়, আস্তে করে নামিয়ে দেয়া হয়েছে মেঝেতে।

মাপা হাতে বাড়ি দিয়েছে রানা, নিশ্চিন্তে দুই ঘণ্টা ঘুমাবে এ। পিস্তল পকেটে রেখে দেরি না করে তাকে সার্চ করল ও। তার ছোরা আর পিস্তল গেল কমোডের পিছনে।

গার্ডের আকার প্রায় রানার মতই। পরনে একই ইউনিফর্ম। কাছ থেকে না দেখলে কেউ বুঝবে না অন্য কেউ হাজির হচ্ছে।

পকেট থেকে দড়ি নিয়ে গার্ডের দু'কবজি পিছমোড়া করে বাঁধল রানা। মুখে গুঁজে দিল নিজের নাক ঝাড়ার রুমাল। লোকটাকে বসিয়ে দিল বালকহেডে ঠেস দিয়ে।

প্রথম কাজ শেষ। পরের কাজ অনেক জটিল।

খাপ থেকে ছোরা বের করে উঠে দাঁড়াল রানা। ওটা থাকল ওর কবজির ভিতরের অংশে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল জ্যাসিন্টা আর দ্বিতীয় গার্ডের দিকে। সহজ ভঙ্গিতে হাঁটছে ও। হোল্ড ভরা ইকুইপমেন্টের ভিতর রয়েছে রিজিড ইনফ্লেক্টেবল বোট, নানান ধরনের অস্ত্র আর অটেল অ্যামিউনিশন। দেখল বেশ কিছু গ্রাউণ্ড-টু-এয়ার মিসাইলও রয়েছে।

যাত্রীদের জন্য সামান্য জায়গা করে দেয়া হয়েছে। বিমানের দুই দেয়ালের সিটে মুখোমুখি বসেছে জ্যাসিন্টা আর গার্ড। শেষেরজন রানাকে আসতে দেখেও দেখল না। আরাম করে চোখ বুজে মাথা রাখল হেডরেস্টে।

চোখ বুজেছে জ্যাসিন্টাও।

নয় হাজার ফুট ওপর দিয়ে আকাশ চিরে ছুটছে বিমান, বাতাস খুব শুষ্ক। এজন্য অস্বস্তিকর অনুভূতিসহ ঝিমুনি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু একই কারণে ঘুমিয়ে পড়া সত্যিই কঠিন।

জ্যাসিন্টার উল্টো দিকে গার্ডের এক ফুট দূরের সিটে বসল রানা। খাপে রেখে দিল ছোরা, বদলে বের করল পিস্তল। পা

বাড়িয়ে খোঁচা দিল মেয়েটার গোড়ালিতে ।

চোখ খুলেছে জ্যাসিন্টা, ঠোঁটে আঙুল রেখে সতর্ক করল রানা । ওর মনে পড়েছে, জ্যাকো বলেছিল ওর বোন বধির বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখায় । ওই ভাষা খানিকটা নিজেও জানে রানা । ধীরে ধীরে ইশারা করল ।

আমি... তোমার... শত্রু... নই...

দপ্ করে এক হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল মেয়েটার চোখে ।

এবার রানা জানাল: আমি এসেছি নুমা থেকে ।

বড় বড় হয়ে গেল মেয়ের চোখ ।

কিছু বলবার আগেই আবারও ঠোঁটে আঙুল তুলল রানা । চট করে দেখিয়ে দিল গার্ডকে । এবার দেখাল নিজের পিস্তল ।

ওটা কক করতেই শব্দ শুনে চোখ মেলল গার্ড ।

‘নড়বে না, খবরদার!’ আরবিতে বলল রানা । বাম হাতে লোকটার হোলস্টার থেকে তুলে নিল পিস্তল ।

বরফের মূর্তি হয়ে গেছে গার্ড ।

বিমানের লেজের দিকে ইঙ্গিত করল রানা । ওদিকে ঘুরে চাইল লোকটা, আর তখনই তার মাথার পিছনে ঠাস্ করে নামল রানার পিস্তলের বাঁট । ভেজা ময়দার বস্তুর মত ধুপ্ করে পড়ল গার্ড মেঝেতে । কিন্তু চোখ এখনও খোলা, উঠে বসতে চাইল । কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল চাঁদির ওপর দ্বিতীয় বাড়ি খেয়ে ।

আবারও জ্ঞান ফিরল কয়েক মিনিট পর । কিন্তু ততক্ষণে বেঁধে ফেলা হয়েছে মুখ-হাত-পা । বিমানের লেজের কাছে একটা বোটে তাকে শুইয়ে দিল রানা । নিজের কাজে সন্তুষ্ট ।

প্রথমবারের মত মুখ খুলল জ্যাসিন্টা, ‘আপনি কে?’

‘নাম মাসুদ রানা,’ বলল ও । ‘তোমার ভাই আর আমি পরিচিত । নুমার হয়ে কাজ করেছি । আমাকে বলা হয়েছে, তার

কী হয়েছে তা খুঁজে বের করতে ।’

‘ওকে পেয়েছেন?’ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল মেয়েটা ।

মৃদু মাথা নাড়ল রানা । ‘না, সরি ।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢোক গিলল মেয়েটা । নিচু স্বরে বলল, ‘হ্যাঁ, কেউ জানে না ওর কী হয়েছে । আমার মন বলে, আমার ভাই আর নেই ।’ ভাবাবেগ আড়াল করতে দুই হাতে মুখ ঢাকল ।

‘তবে খুঁজতে শুরু করে জায়েদ বিন মনযুরের কাছে পৌঁছেছি আমরা । তখনই পেলাম তোমাকে ।’

চট করে ককপিট দেখে নিল জ্যাসিণ্টা ।

‘ভয় নেই, ওরা এদিকে আসবে না,’ বলল রানা । প্রসঙ্গ পাণ্টে ফেলল, ‘এরা তোমাকে ধরল কী করে?’

‘মালে দ্বীপে,’ বলল জ্যাসিণ্টা । ‘হোটেল উঠতেই ।’ শিউরে উঠল একবার । ‘লাথি দিয়ে একজনের দাঁত ভেঙে দিয়েছি । কিন্তু অন্যরা...’ চুপ হয়ে গেল ।

এই মেয়ে আর ইটালিয়ান বিজ্ঞানীর দ্বীপের মেয়েটার মাঝে অনেক তফাৎ । এর বয়স হবে বাইশ কি তেইশ ।

‘ঘুম ভাঙল মরুভূমির ভেতর,’ বলল জ্যাসিণ্টা । ‘কোথাও পালাতে পারতাম না । জানিই তো না কোথায় আছি । ইন্টারোগেট করল । পাসওয়ার্ড, ফোন নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট... সব । আগেই কেড়ে নিয়েছে পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্স ।’

এত কিছু জানতে পেরেছে বলেই নিশ্চিত্তে থেকেছে নকল জ্যাসিণ্টা । আমেরিকান এম্বেসি নুমাকে জানিয়ে দিয়েছে, ওই মেয়ে এখন মালে দ্বীপে ।

‘তোমার কিছু করার ছিল না,’ বলল রানা । জানাল না, কখনও কখনও দক্ষ এজেন্টও ইন্টারোগেশনের মুখে ভড়-ভড় করে বলে দেয় অনেক তথ্য ।

‘জায়েদ বিন মনযুর আমাকে মাদি ঘোড়া মনে করেছে,’ বলল

জ্যাসিন্টা। ‘আমাকে নাকি বশ করবে। গায়ে হাত দিতে শুরু করেছিল। বলেছে, খুব মজা পাব তাকে কাছে পেলে।’

‘লোকটা আস্ত গাধা,’ মন্তব্য করল রানা। ‘আশা করি একটু পর বেরিয়ে যাব আমরা।’

‘বিমান থেকে?’

‘ঠিক তা নয়।’ প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা, ‘তুমি কি জানো কোথায় চলেছি আমরা?’

‘ভেবেছিলাম আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন,’ বলল জ্যাসিন্টা। ‘আমি তো ছিলাম বন্দি।’

‘তুমি বন্দি আর আমি ফেরারী,’ বলল রানা। ‘ভাল টিম।’ পাশের বৃত্তাকার ছোট জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। চারপাশ এখনও অন্ধকার। অনেক নীচে মসৃণ, ঝলমলে ধূসর কী যেন।

‘আমাদের নীচে সাগর,’ বলল রানা। ‘চাঁদ উঠেছে।’ বাম কবজির দিকে চোখ গেল ওর। মনে মনে বলল, জীবনে আর জামানত হিসাবে কাউকে ঘড়ি দেব না। ঘড়ির চেয়ে একটা কিডনি দিয়ে দেয়াও ভাল ছিল। গার্ডের ঘড়ি থাকলে দখল করত, কিন্তু তা নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে স্টারবোর্ডের জানালা দিয়ে উঁকি দিল রানা। সেই আগের দৃশ্য, নীচে বিস্তৃত সাগর। হয়তো নীচের ওই সাগর মেডিটারেনিয়ান। কিন্তু সম্ভাবনা কম। ওর ধারণা, ওরা চলেছে দক্ষিণ মুখে। সামনে থাকবার কথা ভারত মহাসাগর। ওখানে ফেলা হবে ট্যাঙ্ক ভরা ন্যানোবট। ইয়েমেন থেকে উড়লে কয়েক ঘণ্টায় সাগরের মাঝে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

আসলে কোথায় চলেছি আমরা, ভাবল রানা। হয়তো সাগরে কোথাও রয়েছে পরিত্যক্ত কোনও দ্বীপ। আর ওটাই জায়েদ বিন মনযুরের নতুন বেস। আবারও জানালা দিয়ে চাইল। দেখবার মত কিছুই নেই সাগর ছাড়া।

রানাকে লক্ষ করছে জ্যাসিণ্টা। জানতে চাইল, ‘এরপর কী করব আমরা? প্যারাসুট খুঁজে নিয়ে... শুনেছি ওরা ওই জিনিস সঙ্গে করে এনেছে।’

আগেই প্যারাসুট দেখেছে রানা। বলল, ‘ওগুলো মানুষ নামিয়ে দেয়ার জন্যে নয়। বোটের সঙ্গে আটকে নেয়, আর ওগুলো নিরাপদে বোট নামিয়ে দেয় সাগরে। এসব প্যারাসুটকে বলে: এলএপিইএস বা লো অল্টিচুড প্যারাসুট এক্সট্রাকশন সিস্টেম।’

দ্বিধাবিহীন মনে হলো জ্যাসিণ্টাকে।

‘কখনও ড্র্যাগ রেস দেখেছ?’ জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল মেয়েটা।

প্রতিটি বোটের সামনে এবং পিছনের নাইলনের প্যাক দেখাল রানা। ‘ওগুলো সাগরে ফেলার নোঙর প্যারাসুট। স্পেস শাটল ল্যাণ্ড করার সময় যেভাবে গতি কমিয়ে দেয় প্যারাসুট, ঠিক সেইভাবে গতি হ্রাস করে এই জিনিস। ওপর থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্যে নয়।’

‘বুঝলাম,’ বলল জ্যাসিণ্টা। ‘কিন্তু আপনার প্ল্যান কী?’

মৃদু হাসল রানা। ‘তুমি মনে পড়িয়ে দিলে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে।’

‘তিনি কি এখন এ বিমানে আছেন?’ জানতে চাইল মেয়েটা।

‘না, সে বোধহয় আছে দোহার কোনও হোটেলের ফাস্ট ক্লাস লাউঞ্জে,’ বলল রানা। ‘লোভনীয় খাবারের মেনু দেখে জিভ থেকে টপটপ করে পড়ছে জল।’

আস্তে করে মাথা কাত করে রানাকে দেখল জ্যাসিণ্টা। ‘সুযোগ পেলে আমিও তা-ই করতাম। কিন্তু যা-ই হোক, আপনি কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করে বলছেন না।’

‘আমরা বিমান থেকে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেব না,’ বলল

রানা, ‘দখল করব বিমান। প্রথমে ঢুকব ককপিটে, নিরাপদ কোথাও নামতে বাধ্য করব পাইলটকে। তারপর আমার বস বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেই প্রথম সুযোগে পৌঁছে যাব ঢাকায়, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। মিস্টার সোহেল আহমেদের নামে বুক করব দুনিয়ার সেরা ডিনার।’

‘আপনি নিজে এই বিমান চালাতে পারেন?’ জানতে চাইল জ্যাসিন্টা।

‘ঠিক তা নয়। এটার কন্ট্রোল সম্পর্কে কিছুই জানি না।’

‘তার মানে, আমরা পাইলটদের বাধ্য করব আমাদের ইচ্ছেমত চালাতে,’ বলল মেয়েটা। হাসি-হাসি মুখ। ‘অর্থাৎ আমরা হব হাইজ্যাকার।’

‘ঠিক ধরেছ।’

বিমানের সামনের দিকে চাইল জ্যাসিন্টা। ‘মনে হচ্ছে না ককপিটের দরজা আর্মার্ড। ওই মই বেয়ে উঠে গেলেই ঢুকে পড়তে পারব।’

‘সমস্যা অন্যদিক থেকে আসবে,’ বলল রানা। ‘আমরা যাচ্ছি হাই অল্টিচ্যুডে। বিমান প্রেশারাইজড। আর ককপিটে আছে কাঁচের জানালা। যদি লড়াই বেধে যায়, আর গোলাগুলি হয়, কাঁচ ফুটো হলেই সঙ্গে সঙ্গে ডিকমপ্রেশন হবে।’

‘তার মানে কী?’

‘চারদিকে ছিটকে যাবে সব,’ বলল রানা। ‘জানালা দিয়ে গুঁষে নেবে আমাদেরকে। নামতে শুরু করে দশ মিনিট পর পড়ব সাগরে। খুশি হওয়ার কিছু নেই তাতে। চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে পৌঁছব সাগরের নীচে।’

‘অমন হোক তা চাই না,’ বলল জ্যাসিন্টা।

‘আমিও না,’ অন্তর থেকে বলল রানা। ‘লড়াই ছাড়াই দখল করতে হবে বিমান। সেজন্যে দরকার আরও শক্তিশালী অস্ত্র।’

তাকিয়ে রইল জ্যাসিণ্টা, আর কার্গো প্যালেটের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর পৌছে গেল প্রথম প্যালেটের পাশে।

তখনই ইঞ্জিনের আওয়াজ এক অস্টেভ নেমে গেল বিমানের। রানার মনে হলো ভেসে উঠছে ও।

নামতে শুরু করেছে বিমান।

‘আমরা নামতে শুরু করেছি,’ বলল জ্যাসিণ্টা।

‘গন্তব্য কাছেই,’ মাথা দোলাল রানা। ‘যা করার করতে হবে এখনি।’

ছয়

একদল ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীর মুঠোয় চলে গেছে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রবার্তো ম্যানিনির স্বপ্নের ভাসমান দ্বীপ— দি আইল্যান্ড। এখন ব্রিজে দাঁড়িয়ে চটাং-চটাং কথা বলছে আলেয়া বিনতে আব্বাস, নির্দেশের পর নির্দেশ দিচ্ছে সবাইকে। এমন কী পিয়েরে ডিবোয়ে বা ফিল হ্যাভেলাও রক্ষা পাচ্ছে না তার কটু কথা থেকে।

বেশ কয়েক ডেক নীচে ম্যানিনির তৈরি পাঁচতারা হোটেলের মত জেলখানার মস্ত ঘরে বন্দি বাঘের মত পায়চারি করছে আসিফ রেজা। চারপাশ দেখে অবাক না হয়ে পারেনি। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত জানালা, রূপালি আলো আসছে ঘরে। একপাশে পুরু, নরম বালিশের নীচে দামি ম্যাট্রেস। একদিকে কোক, জুস আর কফি মেশিন। আরেক পাশে ম্যাসাজ চেয়ার আর ব্যায়ামের নানান

যন্ত্রপাতি ।

‘যখন খুশি জুস খেতে পারি,’ বিড়বিড় করল আসিফ ।

‘ভাল কথাই বলেছেন,’ ম্যাসাজ চেয়ার থেকে বললেন ম্যানিনি, ‘আপনি জুস নেবেন? আমার জন্যে নেবেন তা হলে পেয়ারা-আনারসের জুস ।’

বিজ্ঞানীকে একবার দেখে নিল আসিফ । লোকটা চেয়ারে বসে বিড়ালের মত পিঠ ডলিয়ে নিচ্ছেন শিয়াটসু টামলার দিয়ে । খুশি খুশি সুরে বললেন, ‘আরাম... আরাম! ঠিকভাবে পিঠ চুলকে দে, বাবা!’

তাকে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার থেকে ফেলে দেবে কি না, ভাবল আসিফ । উচিত হবে না । বন্ধ পাগল, কুকুরের মত খেপে গিয়ে কামড়ে দিলে? সেক্ষেত্রে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন । হঠাৎ ম্যানিনিকে খুব হিংসা হলো আসিফের । আগুন নেভাতে গিয়ে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও । সারা শরীর টনটন করছে ব্যথায় । লোকটা এবার জুস নেয়ার জন্য উঠুক না, চট্ করে ম্যাসাজ চেয়ারে বসে পড়বে ও ।

না, উঠছে না ।

বিরক্ত হয়ে মেশিন থেকে তিন গ্লাস পেয়ারা-আনারসের জুস নিল আসিফ । ফিরতি পথে রওনা হয়ে শুনল, তুষ্ট বিড়ালের মত ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলছেন বিজ্ঞানী । আর তাঁর দিকে স্কুলের ভয়ঙ্কর রাগী কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপালের মত ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে তানিয়া । যখন তখন কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেবে, বা করাবে নিলডাউন ।

তানিয়ার হাতে জুসের গ্লাস ধরিয়ে দিল আসিফ ।

আপত্তির ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়ল তানিয়া । ‘ঠিক আছে, তোমাদের আয়েস শেষে আমরা ভাবতে শুরু করব কীভাবে এখন থেকে বেরোনো যায় ।’

‘আমি জানালাগুলো পরীক্ষা করেছি,’ আত্মরক্ষা করতে চাইল

আসিফ ।

‘জীবনেও বেরোতে পারবেন না,’ সম্ভ্রষ্ট স্বরে বললেন ম্যানিনি । ‘দশ নম্বর ঘূর্ণিঝড় এলেও ভাঙবে না কাঁচ ।’

‘ব্যাটা কয় কী...’ বিড়বিড় করল আসিফ ।

‘কোনভাবে খোলা যায় না দরজা?’ জানতে চাইল তানিয়া ।

‘দরজা বাইরে কি-কোডেড,’ চেয়ারে আরও আরাম করে বসলেন বিজ্ঞানী । ‘কন্ট্রোল বক্স আওতার বাইরে । হয়তো খেয়াল করেননি, এদিকে কোনও হাতলও নেই ।’

‘হ্যাঁ, দেখেছি,’ বলল তানিয়া ।

পিঠ গদির মধ্যে আরও গঁথে নিলেন ম্যানিনি । থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে টামলার । বলতে গিয়ে গলা থেকে বিদঘুটে সুর বেরোল তাঁর: ‘আসলে... হু-হু... কিছুই... করার... হু-হু... নেই । হু-হু...আরাম করে... হুক্... বিশ্রাম...’

তানিয়ার চোখে আগুন দেখল আসিফ । আস্তে করে সরে গেল ও । যদি বিজ্ঞানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তানিয়া...

তাই হলো, বাঘিনীর মত চেয়ারের কাছে পৌঁছে গেল ওর বউ, হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল প্লাগ । চুপ হয়ে গেল ম্যাসাজ চেয়ার ।

হতাশ চেহারা করলেন ম্যানিনি ।

‘আমার আর সুযোগ এল না,’ মনে মনে হতাশ হলো আসিফও ।

‘এখনও সিরিয়াস হওয়ার সময় আছে,’ কড়া স্বরে বলল তানিয়া । ‘এরা ঠাট্টা করতে এখানে আসেনি । ওই আলেয়া বিনতে আব্বাস খুন করেছে আপনার এক লোককে । আগেও এই একই কাজ কয়বার করেছে কে জানে! আমরা যদি বেরিয়ে যেতে না পারি, নিজেদের কাজ শেষ হলেই খুন করবে আমাদেরকে ।’

সাহায্যের জন্য আসিফের দিকে চাইলেন বিজ্ঞানী । মিত্রের

চোখে দেখলেন অসহায়তা। বাধ্য হয়ে তানিয়ার দিকে ফিরলেন ম্যানিনি। ‘আসলে ব্যাপারটা কতটা সিরিয়াস, তা বুঝতে পারিনি। যার কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার থাকে, তার চারপাশের সব কাজ ঝটপট ফুরিয়ে যায়। ভেবেছিলাম, এবারও তাই হবে।’

‘এবারের সমস্যা একেবারে অন্য রকম,’ বলল তানিয়া।

আস্তু করে মাথা দোলালেন রবার্তো।

‘আপনার কোনও সিকিউরিটি প্রোটোকল নেই?’ জানতে চাইল আসিফ। ‘এমন কোনও ইমার্জেন্সি কোড, বা শিডিউল চেক ইন, যেটার জন্যে আপনাকে অন্যরা খুঁজবে?’

খস-খস করে টাক চুলকাতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানী। কয়েক মুহূর্ত পর হতাশ হয়ে বললেন, ‘না! কেউ আমাকে খুঁজবে না। বিলিয়নেয়ার হয়ে যাওয়ার পর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম।’

‘আপনার কোম্পানি চালান কীভাবে?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘ওসব আপনা-আপনি চলে।’

‘যদি কোনও আদেশ দিতে চান?’ জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

‘বড় কোনও সিদ্ধান্ত পাল্টে নিতে, বা কিছু বিক্রি করতে বা কেনার জন্যে আপনার সই লাগে না?’

‘সেসব করে ফিল হ্যাভেলা।’

ধ্যুৎ, এ দেখছি কোনও কাজই করে না, মনে মনে বলল তানিয়া।

‘তার মানে হ্যাভেলা সব যোগাযোগের কাজ সামলে নিত, আপনাকে খুঁজত না কেউ,’ বলল আসিফ। ‘কারও জানা নেই আপনি কী করছেন, বা কোথায় আছেন।’

মাথা দোলালেন ম্যানিনি। ‘আসলে তা-ই।’

বাংলার পাঁচের মত পঁ্যাচানো চেহারা করল তানিয়া। বলল, ‘যাক্, বোঝা গেল, আপনাকে খুন করার আগে কোনও গল্প তৈরি করতে হবে না ওদের।’

‘হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে মস্ত ভুল করেছি,’ বললেন ম্যানিনি।

‘আগেও এমন ঘটনা শুনেছি,’ একটু নরম হলো তানিয়ার কণ্ঠ, ‘হাওয়ার্ড হিউয়েস নাকি মারা গিয়েছিলেন অফিশিয়াল ডেথের এক বছর আগে। হয়তো মিথ্যা, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে: কেউ নিজেকে গুলিতে নিলে কখনও কখনও অন্যরা জানেও না তার আসলে কী হয়েছে। একই বোটে চেপেছেন আপনি। ...আবারও যদি শুনেছি এটাকে দ্বীপ বলেছেন, কিলিয়ে আপনার নাক-মুখ ভচকে দেব।’

‘না-না, এটা আসলে বোট,’ চমকে গিয়ে বললেন ম্যানিনি, ‘একেবারেই বোট। আর একবার ছাড়া পেলে সবার সঙ্গে খাতির রাখব।’

ভাল, ভাবল আসিফ। কিন্তু এতে বর্তমান বিপদ কাটছে না ওদের। ‘জানেন কোথায় রেখেছে আপনার ক্রুদের?’

‘কয়েকজনকে দেখলাম ওই মেয়ের পক্ষ নিয়েছে,’ বলল তানিয়া।

‘অন্যরা বোধহয় আমাদের মতই বন্দি,’ বললেন ম্যানিনি। ‘নীচে এখানে পাঁচটা সেল আছে।’

‘আলাদা করে রেখেছে,’ বলল আসিফ, ‘যাতে দল পাকিয়ে ঝামেলা করতে না পারি।’

‘আপনাদের লোকেদের কী হলো,’ এবার জানতে চাইলেন বৈজ্ঞানিক। ‘তারা ওয়াশিংটনে বসে বসে কী করছে? আপনাদের নিশ্চয়ই রিপোর্ট দেয়ার কথা? কোনও খবর না পেলে আপনাদের খোঁজ নেবে না হেড অফিস?’

চট করে তানিয়াকে দেখে নিল আসিফ, তারপর বলল, ‘খোঁজ নেবে। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশ হয়ে গেলে?’

‘তার মানে কে নিতে দেরি করতে পারে?’ জানতে চাইলেন

ম্যানিনি ।

‘হ্যাঁ,’ বলল আসিফ । ‘আমরা চব্বিশ ঘণ্টা পর পর ডেটা পাঠাই । কিন্তু সেই ডেটা গায়েব করে দেয়া আলেয়া বা ডিবোয়ের জন্যে একটুও কঠিন নয় । ওই মেয়ে ভাল করেই জানে, আমরা কী ধরনের ডেটা পাঠাচ্ছি । নুমার কেউ সন্দেহ করতে করতে...’

‘হয়তো কল দেবেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন,’ ক্ষীণ আশা নিয়ে বলল তানিয়া । ‘ভিডিয়ো লিঙ্কআপ নকল করতে পারবে না এরা ।’

‘হুমকি দেবে, যেন মুখ না খুলি,’ বলল আসিফ । ‘আর কথা না শুনলে, আই এস জঙ্গিদের মত খুন করবে ।’

‘কোনও গোপন সংকেত দিতে পারি না?’ স্বামীর দিকে চাইল তানিয়া ।

‘রানার কাছে শুনেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একবার মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে ফ্রান্সে বন্দি হয়েছিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন । সংক্ষেপে বলতে পারি ওই কথা । আশা করি উনি বুঝে নেবেন কী বলা হয়েছে ।’

‘তার মানে গোপন কোড?’ খুশি হলেন ম্যানিনি । ‘গুড!’

‘ট্রলার মাদাম কুসে,’ বলল তানিয়া । ‘ওটা থেকে ধরা পড়েন ওঁরা ।’

‘আলাপের মাঝে ওটা উল্লেখ করব,’ বলল আসিফ ।

‘তাতেই হবে?’ সন্দেহ নিয়ে চাইলেন ম্যানিনি । ‘যদি বুঝতে না পারেন?’

‘প্রখর বুদ্ধির মানুষ,’ বলল আসিফ । ‘খপ্ করে ধরবেন সূত্র ।’

‘ভাল,’ মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী । ‘উদ্ধার পাওয়ার পরিকল্পনা হলো । কিন্তু এরা যদি আপনাদের ডেকে না নেয় ভিডিয়ো কনফারেন্সে?’

পরস্পরের দিকে চাইল ওরা তিনজন । দ্বিতীয় কোনও প্ল্যান

নেই। ভাবতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল ওদের। প্লাগ লাগিয়ে ম্যাসাজ চেয়ার চালু করে দিল তানিয়া।

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলেন ম্যানিনি।

কাঁধ ঝাঁকাল তানিয়া। ‘ঝাঁকি খেলে হয়তো ভাল কোনও বুদ্ধি বেরোবে আপনার মগজ থেকে!’

সাত

আগেই রানা দেখেছে, রাশান ট্রান্সপোর্ট বিমানের কার্গো বে-তে গাদা করে রাখা হয়েছে অস্ত্র, অ্যামিউনিশন, রকেট ইত্যাদি। এখন নানান ইকুইপমেন্ট ঘেঁটে খুঁজছে দরকারী জিনিস। অবাক চোখে ওকে দেখছে জ্যাসিন্টা কাপুল।

‘কী করছেন?’ জানতে চাইল।

‘ভাল জেনারেল শত্রুদের কাছ থেকে রসদ জোগাড় করে,’ মৃদু হাসল রানা।

‘কথাটা বুঝলাম না,’ জানাল মেয়েটা।

‘সান ত্যু,’ বলল রানা। ‘দি আর্ট অভ ওয়ার।’

‘ও, হ্যাঁ, শুনেছি তার নাম।’

একটা ক্রেটের যিপ টাই খুলে ফেলল রানা। ওটা দিয়ে ভালভাবে আটকে দেয়া যায় বন্দির হাত।

পুরু প্লাস্টিকের লুপ দেখল জ্যাসিন্টা। ‘আগেও দেখেছি এই জিনিস।’

www.boighar.com

‘এরা ভাবছে, আরও জিম্মি জোগাড় করবে,’ বলল রানা।

মনে মনে বলল, কোথায় যাচ্ছে এরা?

পকেটে পুরল কয়েকটা প্লাস্টিকের টাই। বসল পরের ক্রেটের সামনে।

‘আরও কী নেবেন?’

‘ফ্লাইট ডেকে দু’জন বা তিনজন থাকবে। সম্ভবত দুই পাইলট আর এক ইঞ্জিনিয়ার। চতুর্থ আরেকজনও থাকতে পারে ওখানে।’

‘কিন্তু আমরা তো গুলি করতে পারব না,’ বলল জ্যাসিণ্টা। ‘সেক্ষেত্রে লড়ব কী করে?’

‘আমরা লড়ব না,’ বলল রানা।

দ্বিধা মেয়েটার চোখে। ‘আপনার কথা কনফিউয়িং।’

কুং ফু-র ভঙ্গিতে তর্জনী আকাশে তাক করল রানা। ‘লড়াই করা বা জিতে যাওয়া যথেষ্ট নয়। আসল কথা: লড়াই করার আগেই নষ্ট করে দিতে হবে শত্রুর সাহস।’

‘আবারও সান ত্যু?’

আস্তে করে মাথা দোলল রানা।

‘আসলে কী করতে চাইছেন?’ বিরক্তির ছাপ পড়ল জ্যাসিণ্টার মুখে।

‘এত ভয় লাগিয়ে দিতে হবে, যাতে কিছু করার সাহসই না পায়,’ বলল রানা। ‘কিন্তু সেজন্যে চাই এমন কিছু, যেটা ছোরা বা পিস্তলের চেয়ে ঢের বিপজ্জনক। যেন আত্মা-খাঁচাছাড়া হয়ে যায় পাইলটদের। সিট থেকে নড়তেই না পারে।’

আরেকটা ক্রেটের ঢাকনি খুলল রানা। ভিতরে চোখ যেতেই হাসল।

ভয়ের ছাপ পড়ল জ্যাসিণ্টার মুখে। নিচু স্বরে বলল, ‘কী করছেন, মিস্টার রানা!’

‘ভয় নেই,’ বলল রানা। ‘ঠিক এই জিনিসই খুঁজছিলাম।’

খুলে দেয়া হয়েছে বিমানের ডানার ফ্ল্যাপ, ধূপ্ আওয়াজ শুনল

ওরা। বিমানটাকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে পাগলা হাওয়া।

‘আমরা ল্যাণ্ড করছি,’ বলল জ্যাসিণ্টা।

জানালা দিয়ে তাকাল রানা। পূর্ব দিগন্তে দেখা দিয়েছে লালচে রেখা। কিন্তু আশপাশে কোথাও জমিন নেই। ‘ঠিক ল্যাণ্ডিং বোধহয় বলা যাবে না।’

‘তার মানে?’

‘এটা সি-প্লেন,’ বলল রানা। ‘নিখুঁতভাবে বললে ফ্লাইং বোট। নামতে পারে পানিতে।’ দুটো চিন্তা একই সঙ্গে মনে এল ওর। তাড়াতাড়ি করতে হবে যা করার, বেশি দূরে নেই রদেডুঁ। আর, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

জায়েদ বিন মনযুরের কথা মনে পড়ল ওর। গোপন কোনও বেস চাই তার।

এখন ওর প্রথম কাজ বিসিআই-এ যোগাযোগ করা। নুমাকে জানিয়ে দিলে আমেরিকান সেনাবাহিনী উড়িয়ে দেবে জায়েদের বেস।

পরক্ষণে ভাবল রানা, এই বিমানের পেটে আছে টনকে টন ন্যানোবট। এগুলো এরা ছড়িয়ে দেবে সাগরে। তার আগেই ঠেকাতে হবে এদেরকে।

আগের চেয়ারে গিয়ে বসল রানা, বের করেছে ছোরা। ক্রেট থেকে আনা জিনিসটার উপর কাজ শুরু করেছে।

‘আমি জিজ্ঞেসও করব না কী করছেন,’ মুখ আরেক দিকে সরিয়ে নিয়েছে জ্যাসিণ্টা।

কাজ শেষে প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটুর পাশের খাপে ছোরা রেখে দিল রানা। এবার নিল নাইন এমএম ল্যুগার, বের করল ম্যাগাযিন। দ্রুত বের করে ফেলল সব বুলেট। বাদ পড়ল না চেম্বারেরটাও। খালি ম্যাগাযিন আবারও ভরল পিস্তলে। সেফটি অফ করে ধরিয়ে দিল জ্যাসিণ্টার হাতে।

‘আমি অস্ত্র পছন্দ করি না,’ বলল মেয়েটা।

‘এটাকে পিস্তল হিসাবে ভেবো না।’

‘কিন্তু জিনিসটা তো অস্ত্র,’ আপত্তির সুরে বলল জ্যাসিস্টা।

বিমানের সামনের দিকে চলেছে রানা। একবার থেমে বলল, ‘বুলেট ছাড়া পিস্তল কোনও অস্ত্র নয়। এ দিয়ে খুন-খারাবি করতে পারবে না তুমি। তুমি যা করবে, তা স্রেফ ধোঁকাবাজি। ডার্টি হ্যারির মত বাগিয়ে ধরো।’ অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। ‘অথবা এঞ্জেলিনা জোলির মতই ধরো।’

‘আমি কিন্তু সত্যিই গুলি করতে পারব না,’ স্পষ্ট জানিয়ে দিল জ্যাসিস্টা।

‘লাগবে না,’ বলে ককপিটে উঠবার মইয়ের দিকে চলল রানা। আশা করছে, ওর দেয়া ধোঁকাই যথেষ্ট হবে। এই মেয়ে মানতে পারছে না, ধাপ্পা দেয়া হবে কাউকে। ‘পিছনে, ডানদিকে থাকবে। পিস্তল তাক করবে শত্রুদের দিকে।’

‘আর কিছু?’

‘হ্যাঁ, খেপা বনবিড়ালির মত খিঁচিয়ে রাখবে দাঁত-মুখ।’

নামছে বিমান, ফ্লাইট ডেকের দিকে ঝুঁকে গেছে মই, ধাপ বেয়ে উঠছে রানা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল দুই বৈমানিক। হতবাক হয়ে গেল পাইলট। সিট-বেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াতে চাইল কো-পাইলট। কিন্তু রানার হাতের জিনিসটা দেখে উঠতে পারল না সিট ছেড়ে।

থমকে গেছে দুই বৈমানিক।

রানার হাতে আনারসের আকৃতির গ্রেনেড। বাঁকা হেসে পিন খুলে ফেলল বিসিআই এজেন্ট। টিপে ধরেছে সেফটি লিভার বা স্পুন।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল জ্যাসিস্টা কাপুল, শক্ত হাতে ধরেছে পিস্তল। ধমকে উঠল, ‘খবরদার!’

আগেই হুঁশিয়ার হয়েছে দুই বৈমানিক, কিন্তু মনে মনে মেয়েটার প্রশংসা না করে পারল না রানা। ‘হ্যাঁ, সাবধান,’ জোর দিয়ে বলল নিজেও, ‘সবুজ থাকুক সিট-বেল্ট সাইন, উঠে এলেই ফাটিয়ে দেব!’

কন্ট্রোলের দিকে আবারও ঘুরল পাইলট। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে কো-পাইলট। ‘কী করতে চান?’

‘হাত ইয়োক!’ নির্দেশ দিল রানা। ‘চোখ সামনে!’

মেনে নিল কো-পাইলট, নিচু স্বরে কী যেন বলল পাইলটকে।

‘আপনি আমাদের বিমান হাইজ্যাক করতে চান?’ জানতে চাইল পাইলট। ‘ওই মেয়ের জন্যে? সামান্য এক মেয়ের জন্যে এত বড় ঝুঁকি নেবেন নিজের জানের?’

‘চোপ!’ ধমক মারল জ্যাসিণ্টা। ‘আবার মুখ খুললে বুক ভর্তি করে দেব গরম সীসা দিয়ে!’ চট করে দেখে নিল রানাকে। ‘কী বুঝলেন?’

‘খারাপ না, তবে আরও চোখা হতে হবে ডায়ালগ,’ মতামত দিল রানা। চট করে একবার দেখে নিল জানালা দিয়ে। পুবার দিগন্তে বাড়ছে আলো। আকাশ অবশ্য এখনও কালচে লাল। বোঝা গেল না কোথায় সাগরের শেষ, আর কোথায় দিগন্ত।

সামনে আরও দুই জেট বিমানের ন্যাভিগেশন বাতি দেখল রানা। কাছের এয়ারক্রাফট মাত্র এক মাইল দূরে। এক হাজার ফুট নীচে। আর একেবারে সামনের বিমান কমপক্ষে তিন মাইল দূরে। ওদের থেকে অন্তত দুই হাজার ফুট নীচে। নামতে শুরু করেছে তিন বিমান। ককপিটে কোনও ট্রান্সমিশন নেই। বন্ধ করে রাখা হয়েছে রেডিয়ো।

‘তোমরা কোথায় যাচ্ছ?’ জানতে চাইল রানা।

‘কিছু বলতে যেয়ো না,’ স্যাঙাতকে সতর্ক করল পাইলট।

লোকটা এ কথা বলার পর, এখন শুধু বিমান উড়িয়ে দেয়ার

হুমকি দিলেই চলবে না, ভাবল রানা। চোখ সরু করে দেখে নিল আল্টিমিটার। ওরা নামছে আট হাজার ফুট উচ্চতা থেকে। আর দশ মিনিট এভাবে নামলে সাগরে গিয়ে পড়বে বিমান। জানালা দিয়ে ওদিকে চেয়ে কোনও জমির নিশানা দেখল না রানা।

যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে, এবার বলল, ‘মন দিয়ে শোনো: যদি বাঁচতে চাও, আমার কথা মত চলতে হবে!’

‘আর যদি না চলি?’ তেড়া সুরে জানতে চাইল কো-পাইলট।

‘উড়িয়ে দেব এই বিমান,’ বলল রানা।

‘চাপা মারছ,’ বলল কো-পাইলট। ‘তোমার সাহস হবে না যে...’

বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই তার মাথার তালুর উপর শক্তিশালী ঘুমি নামাল রানা।

কো-পাইলটের ঘাড়ের হাড় জোরালো ‘কড়াৎ!’ শব্দ তুলল।

ফিউজেলাজের দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিতে চাইল সে। মুখ কুঁচকে ফেলেছে তীব্র ব্যথায়।

‘তোমার কি মনে হয় আবারও জায়েদের মুঠোর ভেতর যাব?’ নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

খাঁচায় বন্দি হিংস্র জানোয়ারের মত নাক কুঁচকে ফেলল কো-পাইলট।

পরস্পরকে দেখল দুই বৈমানিক।

রানা ধারণা করছে: এরা জানে কত বড় উন্মাদ জায়েদ বিন মনযুর। ওই কুয়ার ভিতর যাদের লাশ আছে, তাদের বাদ দিলেও আরও বহু লোককে খুন করেছে সে।

নিচু স্বরে আরবি ভাষায় দ্রুত তর্ক শুরু করল দুই বৈমানিক।

পুরো বুঝতে পারছে না রানা। সামনে বেড়ে কষে চড় দিল কো-পাইলটের কানের উপর। ‘ইংরেজিতে বল!’

লালচে চেহারায় ক্ষুব্ধ চোখে রানাকে দেখল কো-পাইলট।

সাবধানে হাত নামিয়ে দিল সিট-বেল্ট লক খুলতে। মুখে বলল, 'ঠিকই বলেছ। জায়েদ বিন মনযুর তোমাকে ধরতে পারলে, বারবার আল্লার কাছে প্রার্থনা করবে, যাতে জলদি তোমাকে তুলে নেন উনি। কিন্তু আমরা যদি তোমাদের ছেড়ে দিই, নিষ্ঠুর অত্যাচার শেষে খুন করা হবে আমাদের। আমাদেরও রক্ষা নেই।'

ক্লিক আওয়াজ তুলে খুলে গেল সিট-বেল্ট। বন্ করে সিট ঘুরিয়ে নিল কো-পাইলট, উঠে দাঁড়াল। ছোট ককপিটে তাকে দেখাল দানবের মত। রানার চেয়ে কমপক্ষে সাত ইঞ্চি উঁচু সে।

'তো দাও আমাদের উড়িয়ে,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'আমরা যাব বেহেস্তে, আর তুমি নরকে।'

কঠোর চোখে চেয়ে আছে রানা। চোখের পলক পড়ছে না লোকটারও। এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'বেশ, তাই হোক!' বলেই স্পুন ছেড়ে তার দিকে ঝেঁনেড ছুঁড়ল রানা।

ধুপ্ করে কো-পাইলটের বুকে গিয়ে লাগল ওটা। হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল সে। পরক্ষণে গোসলে ব্যস্ত লোক যেভাবে ধরতে চায় পিছল সাবান, সেভাবেই থাবা দিল, কিন্তু ঝেঁনেড পিছলে গিয়ে নামল পাইলটের ঘাড়ের। কো-পাইলটের চোখ দুটো হয়ে উঠেছে হাঁসের ডিমের সমান। ঝেঁনেড ধরতে গিয়ে পাইলটের ঘাড়ের চেপে বসতে চাইল সে।

সম্ভব হলো না বোমা ধরা, সামনে বেড়ে দানবের চোয়ালে ডানহাতি ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে রানা। ডানে আধ পাক ঘুরে কোমর-কাঁধের পুরো শক্তি ব্যয় করেছে।

ধুপ্ করে পাইলটের ঘাড়ের পড়ল দানব, অজ্ঞান।

ওদিকে পাইলটের হাত থেকে ছুটে গেছে ইয়োক।

গুরু হলো বিমানের খাড়া ডাইভ।

ওজন শূন্যতায় এক সেকেন্ডের জন্য ছাতে গিয়ে লাগল রানার

মাথা। ভারসাম্য রাখতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। দেরি না করেই সামনে বেড়ে খপ্পু করে ধরল কো-পাইলটের বেল্ট, হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল নিজের দিকে। ওদিকে ঘাড় থেকে সহকর্মী নেমে যেতেই কাজে নেমেছে পাইলট। সিধে করতে চাইছে বিমান। তারই ভিতর হাতে দেখা দিয়েছে ছোট একটা পিস্তল।

সোজা হয়ে বসেই বামহাতি ঘুষি মারল রানা তার কবজির উপর। ‘বুম!’ আওয়াজে বেরিয়ে গেল গুলি। বাম পাশ দিয়ে বিঁধেছে কো-পাইলটের বুকে। পরের বুলেট ফুটো করল তার সিট।

থাবা মেরে ক্যাপ্টেনের বাহু সরিয়ে দিতে চাইল রানা। কিন্তু ঝটকা দিয়ে হাত পিছিয়ে নিয়েছে সে। পিস্তল তাক করতে চাইল শত্রুর বুকে।

ক্ষিপ্ত বানরের মত সরল রানা। তারই ফাঁকে হাতের তালুর ধাক্কায় সামনে ঠেলে দিয়েছে ইয়োক। আকাশে এদিক ওদিক দুলতে শুরু করেছে বিমান, এমন সময় আবারও গুলি করল পাইলট।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বুলেট, লাগল মাথার উপরের প্যানেলে। ওখান থেকে নানাদিকে ঝরঝর করে পড়ল লাল-হলদে ফুলিঙ্গ। জ্বলে উঠল কিছু লাল বাতি। বাজতে শুরু করেছে কয়েক ধরনের সতর্ক-ধ্বনি।

সাগরের দিকে সাঁই-সাঁই করে নামতে শুরু করে গড়াচ্ছে বিমান। এটা-ওটা ধরে টিকে আছে তিনজন। একবার সুযোগ পেয়ে পাইলটের ঘাড় ঘুষি বসাল রানা, কিন্তু জুতসই হলো না মার। ওকে ধরে বসেছে দুলন্ত বিমানের সেপ্টিকিউগাল ফোর্স।

তারই ফাঁকে বাম হাতে ছোরা বের করতে চাইল রানা। একই

সময়ে সুযোগ পেল পাইলট— এবার এক গুলিতে ফুটো করে দেবে রানার কপাল ।

বাম হাতে ধরা ছোরা ঝটকা মেরে সামনে বাড়াল রানা, পিস্তল তাক করবার আগেই হঠাৎ থমকে গেল পাইলট । খচ্ করে হুৎপিণ্ডে ঢুকেছে ছোরার ডগা । অবাক বিস্ময় ফুটল চোখে-মুখে । হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল । উল্টে গেল দুই চোখের মণি । এলিয়ে পড়ল সিটে । লাশ ।

আরও কাত হচ্ছে বিমান । ডান হাতে সরু হ্যাণ্ডেলবার ধরেছে রানা, বাম হাতে ধরল ইয়োক । ঠেকাতে চাইল পতন ।

সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সমান হলো বিমানের দুই ডানা । কিন্তু বাজছে গ্রাউণ্ড প্রক্সিমিটি ওয়ার্নিং । আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়া সুরে কমপিউটার বারবার রাশান ভাষায় জানাচ্ছে: ‘উপরে উঠুন! উপরে উঠুন! উপরে উঠুন!’

ইয়োক পিছিয়ে আনতে চাইছে রানা, কিন্তু বেশি জোরাজুরি করলে মট করে ভেঙে যাবে বিমানের ডানা । আস্তে আস্তে নাক তুলছে বিমান, কিন্তু উল্টো দিকে ঘুরছে আল্টিমিটার । অবশ্য, একটু পর আবারও দিগন্ত দেখল রানা । সামান্য উপরে নাক তাক করেছে বিমান ।

থেমে গেল কয়েকটি লাল বাতি আর সতর্ক-সংকেত ধ্বনি । আবারও সাগর থেকে এক হাজার ফুট উপরে উঠল বিমান । কমপিউটার বলতে শুরু করেছে এবার কী করতে হবে রানাকে ।

কিছুক্ষণ পর বিমান ঠিকঠাক ভাসতে দেখে ককপিটে চোখ বোলাল রানা । মৃত ক্যাপ্টেনের কোলে বসে আছে ও । তাজা রক্তে ভেসে গেছে সিট । দুই সিটের মাঝে গুঁজে আছে কো-পাইলট । তাকেও জীবিত মনে হলো না । হুৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে বুলেট । মেয়েটা ধারেকাছে নেই ।

‘জ্যাসিস্টা?’ গলা ছাড়ল রানা ।

‘আমি এখানে,’ সাড়া দিল মেয়েটা। মুখ তুলেছে ফ্লাইট ডেকের মই থেকে।

‘তোমার কী হয়েছিল?’

‘মই থেকে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।’ আবারও উঠে এল জ্যাসিণ্টা। মনে হলো অসুস্থ। নিচু হয়ে কী যেন তুলে নিল মেঝে থেকে। ওটা সেই গ্রেনেড। ‘ফাটল না কেন?’

‘ফিউয় সরিয়ে নিয়েছি,’ বলল রানা, ‘ভেতরে এক্সপ্লোসিভ আছে, কিন্তু ফিউয় না থাকলে ফাটবে কী করে!’

সাবধানে গ্রেনেড কাপ হোল্ডারে রাখল জ্যাসিণ্টা। ‘এদের বেঁধে রাখা উচিত না?’

‘দেরি হয়ে গেছে, এদের ঘুম আর ভাঙবে না,’ বলল রানা। ‘এসো, সাহায্য করো, একে সিট থেকে নামাতে হবে।’

উঠে দাঁড়াল রানা, সামনে বেড়ে মৃত ক্যাপ্টেনের সিট-বেল্ট খুলল জ্যাসিণ্টা। এ সময়ে বিমানের কন্ট্রোলার দায়িত্বে থাকল রানা।

‘আপনি যে বিমান চালাচ্ছেন,’ বিস্ময় জ্যাসিণ্টার কণ্ঠে।

‘চালাচ্ছি, তা বলা যায় না,’ বলল রানা।

‘আপনি না বলেছিলেন এই বিমান চালাতে পারবেন না?’

‘ঠিকই বলেছি। ডানে-বামে যেতে পারব। ওপরে বা নীচেও যেতে পারব। গতি কমাতে পারব, বাড়াতেও পারব। কিন্তু এই বিমান ল্যাণ্ড করানো আমার সাধের বাইরে। চেষ্টা করলে জমিতে তৈরি হবে পোড়া গর্ত, অথবা পানিতে পড়ে চুর-চুর হবে সব।’

‘তাই? তুমি আচ্ছা লোক তো!’ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জ্যাসিণ্টা।

‘তবে ঝটপট অনেক কিছু শিখে নেব,’ মেয়েটার বুকে আস্থা তৈরি করতে চাইল রানা। ‘এ ছাড়া উপায়ও নেই। দুই পাইলট তো এখন আরও উপরের আকাশের উদ্দেশে ফ্লাই করছে।’

রাশান এই পেটমোটা বিমানের নাক হাতির মত ভারী, ভাবছে।

‘এলএপিইএস ব্যবহার করলে হয় না?’ রানার চিন্তা বাধা পেল। আরও জানতে চেয়েছে জ্যাসিণ্টা, ‘বিমানের পেছন থেকে নেমে গেলে?’ ভয় পেয়েছে ভীষণ।

‘আগে জানব কোথায় যাওয়ার কথা, তারপর দরকার হলে নেমে পড়ব,’ বলল রানা। চোখ বোলাল ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। পেয়ে গেল কোন্ লিভার টানলে খুলবে রিয়ার ডোর আর টেইল র‍্যাম্প। ওই দুটো লিভারের কথা মনে রাখল।

আবারও পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছে বিমান। আগের কোর্সে ফিরেছে রানা। ফরসা আকাশে কয়েক মাইল দূরে দেখা গেল অন্য দুই জেট বিমান। এখনও নামছে। কিন্তু গোস্তা খাওয়ার ভিতর নানাদিকে গেছে বলে ওই দুই বিমানের চেয়ে নীচে রয়ে গেছে রানার বিমান।

‘ওরা জানে না কী হয়েছে পিছনে,’ বলল জ্যাসিণ্টা।

‘আমারও তা-ই ধারণা,’ বলল রানা, ‘রেডিয়ো বন্ধ করে রেখেছে। গাড়ির মত রিয়ার ভিউ মিরর নেই, আর চালু করেনি পিছনের রেইডার।’

‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা।

ছোট কমপিউটারের স্ক্রিনে ন্যাভিগেশন রিডআউট পড়ল রানা।

ওরা আছে ভারত মহাসাগরের ঠিক মাঝে। এখান থেকে চার শ’ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিশেল্‌স্, একঘণ্টা লাগবে পৌঁছতে।

‘সিশেল্‌স্ সবচেয়ে কাছের সভ্যতা,’ বলল রানা। ‘সভ্যতা বলতে বোঝাতে চাইছি এমন এক জায়গা, যেখানে ফোন আছে। আর যখন তখন খুন করবে না কেউ।’

‘তোমাদের বাংলাদেশে তো আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা

হয়,' রানাকে চমকে দিল জ্যাসিণ্টা। 'টিভিতে দেখেছি, বয়স্ক লোক তো আছেই, এমন কী শিশুদেরকেও ছাড়ছে না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল রানা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, একদল নীচ পশু রাজনীতি বা ইসলাম ধর্মের নামে অরাজনৈতিক কুকীর্তি, ভয়ঙ্কর অধর্ম করছে। এরা ক্ষমতার লোভে অন্ধ, কিন্তু একদিন ঠিকই পাবে উপযুক্ত শাস্তি।'

রানার গম্ভীর মুখ দেখে কথা বাড়াল না জ্যাসিণ্টা। অন্তরে বুঝে গেছে, মানুষটা নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসে দেশকে।

বিমান নিয়ে পশ্চিমে বাঁক নিল রানা। সামনের বিমানের কেউ দেখবার আগেই হয়তো সরে যেতে পারবে অন্তত এক শ' মাইল দূরে।

কিন্তু তখনই অন্য কিছু দেখল রানা।

ওটা রূপালি সাগরের বুকে ছোট, কালো বিন্দু।

দেখেছে জ্যাসিণ্টাও। 'ওটা কি কোনও দ্বীপ?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সবচেয়ে কাছের দ্বীপ এখান থেকে শত শত মাইল দূরে।'

'জাহাজও নয়, অনেক বড়,' বলল জ্যাসিণ্টা।

মনোযোগ দিয়ে ওদিকটা দেখল রানা, চমকে গেল। সূর্যের ঝকমকে সোনালি আলোয় ওই যে ত্রিকোণ, উঁচু কয়েকটা দালান!

'ওটা জাহাজ নয়, নাম: দি আইল্যাণ্ড। ধাতব দ্বীপ।' রানা টের পেল, ওর রক্তে মিশতে শুরু করেছে অ্যাড্রিনালিন। অস্ত্র ভরা তিন বিমান নিয়ে জায়েদ বিন মনযুর চলেছে বৈজ্ঞানিক রবার্তো ম্যানিনির দ্বীপ দখল করতে। বিলাস করতে যাচ্ছে না তারা। অ্যাটাক ফোর্স, রেডিয়ো বা রেইডার বন্ধ, হামলা করবে। কেড়ে নেবে সব। দরকার পড়লে দ্বিধা করবে না সবাইকে খুন করতে।

'সিট-বেন্ট বেঁধে নাও,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

'কেন?' জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা। 'তুমি কী করতে চাও?'

শেষমাথায় থ্রটল পৌঁছে দিল রানা। শান্ত স্বরে বলল, ‘এবার আমরা আমাদের সরব উপস্থিতি জাহির করব।’

আট

বিমানের কন্সোলে চোখ বোলাচ্ছে রানা, কয়েক সেকেন্ড পর পেয়ে গেল রেডিয়ো। ট্রান্সিভারে সেট করা অদ্ভুত একটা ফ্রিকোয়েন্সি।

‘কম-১,’ ভাবল রানা, ‘বোধহয় জায়েদ বিন মনযুরের ফ্রিকোয়েন্সি।’ ঘাড় কাত করে জ্যাসিগ্টাকে দেখল। ‘একটা হেডসেট জোগাড় করতে পারো?’ www.boighar.com

কুঁজো হয়ে মেঝে দেখল জ্যাসিগ্টা। মৃত পাইলটের হেডসেট খুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ঠিক জায়গায় প্লাগ লাগিয়ে নিল রানা। দ্বিতীয় ট্রান্সিভার দেখে ওটার সুইচ অন করল। কম-১-এর কথা শুনবে, এদিকে ব্রডকাস্ট করবে কম-২ ব্যবহার করে। হেলিকপ্টার পাইলট জন ব্র্যাডলির ফ্রিকোয়েন্সিতে দ্বিতীয় ট্রান্সিভারের ফ্রিকোয়েন্সি সেট করবে রানা। বিজ্ঞানীর দি আইল্যাণ্ডে থাকবার কথা লোকটার।

‘কী করছ?’ জানতে চাইল জ্যাসিগ্টা। ‘তুমি না বলেছিলে, সরে যাবে ওদের কাছ থেকে? এখন তো উল্টো ওদের দিকেই যাচ্ছ!’

‘ওই দ্বীপে আমার ক’জন বন্ধু আছে, ওরা খুঁজে বের করতে চাইছে তোমার ভাইয়ের কী হয়েছে,’ বলল রানা। ‘সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আর তাই ওদের মুখ বন্ধ করতে হামলা

করবে জায়েদ বিন মনযুর ।’

‘হামলা করবে?’

‘তিন বিমানে লোক তুলেছে, যাতে দখল করে নিতে পারে ওই দ্বীপ,’ বলল রানা ।

‘সেক্ষেত্রে সতর্ক করে দেয়া উচিত,’ বলল জ্যাসিণ্টা ।

‘তাই করতে চাইছি।’ ফ্রিকোয়েন্সি সেট করেছে রানা ।
ডিসপ্লে উইণ্ডোতে দেখল ১২২.৭৮ । ‘হুঁ, এটাই ছিল জন ব্র্যাডলির ফ্রিকোয়েন্সি ।’

কান পাতল, কিন্তু কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কোনও কথা শুনতে পেল না । ট্রান্সমিট করল: ‘দি আইল্যাণ্ড! আমি মাসুদ রানা! শুনতে পাচ্ছ?’

কোনও সাড়া নেই ।

একই কথা বারকয়েক বলল রানা, চোখ রেখেছে নীচে নেমে যাওয়া দুই বিমানের উপর । মনে হলো না সামনের বিমানের কেউ কিছু টের পেয়েছে ।

‘দি আইল্যাণ্ড, কাম-ইন!’

‘অন্য ফ্রিকোয়েন্সি দেখো,’ বুদ্ধি বাতলে দিল জ্যাসিণ্টা ।

‘তাতে কাজ হবে না, এটাই সঠিক ফ্রিকোয়েন্সি।’ আবারও ট্রান্সমিট বাটন টিপল রানা । ‘দি আইল্যাণ্ড, শুনছ? আমি মাসুদ রানা । আকাশ থেকে আসছে হামলা, ঠেকাবার চেষ্টা করো ।’

বাটনের উপর থেকে আঙুল তুলল রানা ।

‘ওরা জবাব দিচ্ছে না কেন?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা ।

নানান কারণ থাকতে পারে, জানে রানা । তার ভিতর সবচেয়ে খারাপ: দি আইল্যাণ্ডে আছে নকল জ্যাসিণ্টা । হয়তো ডিয়েবল করে রেখেছে রেডিয়ো । বা আরও কোনও সর্বনাশ করেছে ।

সামনের দুই বিমান এখন সাগর থেকে মাত্র দুই হাজার ফুট উপরে । কয়েক মিনিট পর সাগরে নামবে । দি আইল্যাণ্ডের যিরো

ডেকে উঠতে ওদের বড়জোর পাঁচ মিনিট। তার আগে এলএপিইএস প্যারাসুট ব্যবহার করে নামাবে বোট। এই বিমানের আকার দেখে রানা আন্দাজ করছে, অন্য দুই বিমানে তোলা যাবে এক শ' চল্লিশজন কমাণ্ডো। কিন্তু বোট আর ইকুইপমেন্টের কারণে হোল্ড ভরা, কাজেই একেক বিমানে থাকবে বড়জোর তিরিশজন। তা-ও কম নয়, ষাটজন কমাণ্ডোর বিরুদ্ধে কী করবে রবার্তো ম্যানিনির বিশ ক্রু? লড়াই বাধলে কাজে আসবে না আসিফ বা তানিয়া। বিকল করা হয়েছে সব রোবট। আক্রমণাত্মক বেদুঈন বাহিনীর সামনে টিকবে না কোনও বাধা।

রেডিয়োতে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। রানা বুঝে গেছে, দেরি হয়ে গেছে, এখন আর সতর্ক করে কোনও লাভ হবে না। যা করবার করতে হবে ওকে একা।

দি আইল্যান্ডের কমিউনিকেশন রুমে ডিবোয়ে আর হ্যাভেলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আলেয়া বিনতে আব্বাস, শুনছে মাসুদ রানার সতর্কবাণী: ‘আকাশ থেকে আসছে হামলা, ঠেকাবার চেষ্টা করো।’

অসুস্থ চেহারা করেছে ডিবোয়ে। ‘জায়েদ না বলেছিলেন মাসুদ রানা আর তার সঙ্গের লোকটা মারা গেছে?’

‘মনে হচ্ছে, কোনওভাবে বেঁচে গেছে,’ বলল আলেয়া বিনতে আব্বাস।

‘রেডিয়ো করছে কোথা থেকে?’ জানতে চাইল হ্যাভেলা।

‘যে-কোনও জায়গা থেকে রেডিয়ো করতে পারে,’ চট করে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল আলেয়া। দিগন্তে কোনও জাহাজ নেই। অবশ্য আকাশ পথে আসছে তিনটে বিমান। তৃতীয়টা অনেক পিছনে, কোনও ফর্মেশনে নেই। ভয়ে বুক আঁকড়ে আসতে চাইল ওর। অন্য দুই বিমানের পিছু নিয়েছে মাসুদ রানা!

‘আমাদের একটা জেট দখল করেছে,’ রুদ্ধ স্বরে বলল।

‘জায়েদকে সতর্ক করতে হবে। হাতের কাছে জিম্মি রাখা উচিত। আপনারা নিয়ে আসুন রানার বন্ধুদেরকে’। দেরি করবেন না!’

সামনের দিকে পুরো ঠেলে দিয়েছে রানা থ্রটল। ঝটকা দিয়ে এগোতে শুরু করেছে এক শ’ দশ ফুট দৈর্ঘ্যের এয়ারক্রাফট। বাড়ছে ইঞ্জিনের গর্জন, সেই সঙ্গে গতি।

পরিকল্পনা গুছিয়ে নিচ্ছে রানা। গতি অনেক কমিয়ে এনেছে সামনের দুই বিমান, নেমে চলেছে সাগরের দিকে। দি আইল্যান্ডের ডেকের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় থাকবে অসহায়। তখনই নামিয়ে দেবে কমাণ্ডেদেরকে। তার আগেই করতে হবে হামলা, তাড়া করে সরিয়ে নিয়ে ফেলতে হবে সাগরে।

নীচের দিকে নাক তাক করা দুই বিমানের মাঝে মাত্র আধ মাইল ফারাক, উচ্চতা মাত্র তিন শ’ ফুট। ঝড়ের গতি তুলে তাদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে রানা ও জ্যাসিন্টার বিমান। অনেক কমে এসেছে তফাৎ। তখনই কম-১-এ রানা শুনল আরবি আলাপ।

একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখাল দুই বিমান, উপরের দিকে তাক করেছে নাক। ইঞ্জিনের পিছন থেকে বেরোল বাষ্পের মত ফিউম।

‘চমকে দেয়ার সুযোগ থাকল না,’ নিচু স্বরে বলল রানা।

গতি বাড়ছে সামনের দুই বিমান, কিন্তু উপর থেকে ভয়ঙ্কর উন্মাদের মত নেমে আসছে রানা। গতি কমপক্ষে এক শ’ নট বেশি। নাক তাক করেছে পিছনের বিমানের লেজ বরাবর।

বাজপাখির মত নীচের শিকারের উপর হামলে পড়বে রানা। উপরে উঠছে সামনের দুই বিমান, তবে গতি কম। যেন মস্ত কোনও মন্তুরগতি পায়রা।

ক্রমেই বড় হয়ে কাছে চলে আসছে।

রানার উইণ্ডজিনের খুব কাছে চলে এল ওগুলো, তারপর সাঁই

করে হারিয়ে গেল পিছনে ।

রাশান বিমানে ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের সিটে বসে আছে জায়েদ বিন মনযুর, ইঞ্জিনের বিকট গর্জনের উপর দিয়ে পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছে । ইঞ্জিনের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করে উপরে উঠছে বিমান, সেই সঙ্গে বাড়ছে গতি ।

‘সাবধান! ও তোমাদের ওপরে!’ রেডিয়োতে চিল-চিৎকার জুড়েছে আলেয়া বিনতে আব্বাস ।

যেন শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর ঝড়, থরথর করে কাঁপছে জায়েদের বিমান । উইণ্ডশিল্ডের উপর পড়ল কালো ছায়া । ভয় পেয়ে সামনে থ্রটল ঠেলল ক্যাপ্টেন । রানার বিমানের ইঞ্জিনের ধোঁয়া, তাপ আর এগযস্ট ছিটকে লাগল ককপিটে । অবশ্য, সংঘর্ষ হলো না দুই বিমানে ।

শেষ মুহূর্তে নিজের বিমান সরিয়ে নিয়েছে রানা । মাঝে ছিল বড়জোর দশ ফুট । ভীষণ ভয় পেয়েছে জায়েদের বিমানের ক্যাপ্টেন, পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ওজনের জেট বিমান বাম পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই বইছে তীব্র হাওয়া । ভারসাম্য রক্ষা করবার আগেই সাগরের ঢেউ লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেছে তার বিমান ।

‘ওপরে ওঠো! ওপরে ওঠো!’ ঘেউ-ঘেউ করে উঠল জায়েদ ।

ব্যস্ত হাতে দুই ডানা সিধা করল ক্যাপ্টেন, পিছিয়ে নিল ইয়োক । ঢেউয়ের সামান্য উপর দিয়ে চলেছে বিমান । নামছে ভারী পাথরের মত । অবশ্য, কয়েক মুহূর্ত পর আবারও আকাশের দিকে নাক তুলল বিমান ।

‘সামলে উঠে আসছে আবার,’ জানাল জ্যাসিস্টা । চেয়ে আছে পাশের জানালা দিয়ে । ‘কী করে যে উঠে এল!’

আবারও ঘুরে শত্রুদের পিছনে যাবে, ভেবেছে রানা । কিন্তু তা

এখন অসম্ভব। এখন সামনে দ্বিতীয় বিমান, আগে বারোটা বাজাতে হবে ওটার। ওর প্রথম পরিকল্পনা সফল হয়নি। দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট উঠে গেছে এক হাজার ফুট উচ্চতায়। গতি বাড়ছে আরও। ওটাকে বাগে পেতে হলে কিছু না কিছু করতে হবে।

ওর বিমানের বাড়তি গতি ব্যবহার করে উপরে উঠে এসেছে রানা। কাত হয়ে রওনা হয়ে গেল শত্রু বিমানের উদ্দেশে। এখনও জানে না, কী করবে। তখনই চট করে বুদ্ধি এল। সোহেল পাশে থাকলে ওকে বলত: ভালভাবে চাপড়ে দে ওটার পিঠ!

ককপিটে চোখ বোলাতে শুরু করেছে রানা। গেইজ, সুইচ আর অজস্র স্ক্রিনের মাঝে পেয়ে গেল যেটা খুঁজছে।

‘ওই হ্যাণ্ডেল ধরো!’ আঙুল তাক করে জিনিসটা দেখিয়ে দিল রানা।

হলদে-কালো ওয়ার্নিং লেখা পুরু ধাতব বারে হাত রাখল জ্যাসিণ্টা।

‘বললেই জোরসে টান দেবে!’

শিকারের খুব কাছে পৌঁছে গেছে রানা। ভীষণ কাঁপতে শুরু করেছে ওর বিমান। সামনের বিমান থেকে ঝোড়ো হাওয়া আসছে। ওর মনে হলো, পাওয়ারবোটের পিছনে ওয়াটার স্কি করছে। তুমুল বাতাস ঠেলে উপরে তুলল বিমান। দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করে সামনে বাড়ল, তারপর চলে গেল শত্রু বিমানের উপরে। পিছনে ফেলতে শুরু করেছে।

‘এবার!’

হলদে-কালো বার ঝটাং করে নীচে নামিয়ে দিল জ্যাসিণ্টা।

ভীষণ জোরালো হুইশ্ আওয়াজ উঠল বিমান জুড়ে। রানা টের পেল, মহাশূন্যের দিকে নাক তাক করেছে ওর বিমান। পিছনে ধূসর বাষ্পের মত মেঘ। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল ওটা, জোর ধপাৎ আওয়াজ তুলে লাগল পিছনের বিমানে। ধূসর মেঘ

তখনও আস্ত । বারো হাজার পাউণ্ড ওজনের পানি আর ন্যানোবট আঘাত হেনেছে পিছনের বিমানের ককপিটে । জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে চুরচুর হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ড, চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল দুই বৈমানিক ।

ভারী পানি আর ন্যানোবট এক টানে ছিঁড়ে ফেলল বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিন । প্রচণ্ড সংঘর্ষে বিস্ফোরিত হলো টার্বোফ্যান, নানান দিকে ছিটকে গেল পাখা । ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল কাউলিং ।

পানির ভারী আঘাত আর চাপে বাম ডানার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ডান ডানা, মড়াং করে ভেঙে ছিটকে চলে গেল পিছনে । আকাশে গড়াতে শুরু করে নীচে নাক তাক করল বিমান । মাত্র কয়েকটা মস্ত ডিগবাজি দিয়ে পড়ল গিয়ে সাগরে । নানান দিকে গেল জেট ইঞ্জিন, লোকজন আর কার্গো । হাজার হাজার ধাতব টুকরো ছড়িয়ে পড়ল সাগরে ।

খচ-খচ করছে রানার মন, সাগরে ফেলেছে জায়েদের কোটি কোটি ন্যানোবট । এ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না । অস্ত্র বলতে ছিল ওটাই । ডানদিকে বাঁক নিল, নীচে দেখল ধ্বংসস্তূপ । সতর্ক হয়ে উঠল আরও, অন্য জেট বিমানের হামলায় জ্যাসিস্টা আর ওরও একই পরিণতি হতে পারে ।

তখনই রেডিয়োতে শুনল চেনা কণ্ঠস্বর ।

কথা বলতে শুরু করেছে তানিয়া রেজা ।

দি আইল্যান্ডের কমিউনিকেশন রুমে রেডিয়োম্যানের কস্মোলের সামনে বসে আছে তানিয়া, মাথার পিছনে ঠেসে ধরা হয়েছে কালো পিস্তলের শীতল মাযল ।

‘কথা বলো ওর সঙ্গে!’ কর্কশ স্বরে ধমক দিল আলেয়া । ‘বলো সারেংগর করতে! নইলে খুন করব তোমাদের! আগে মরবে তোমার স্বামী!’

মেঝেতে শুয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়েছে আসিফকে। ওর পিঠে বুট সমেত পা হ্যাভেলার। ঘাড়ের দিকে তাক করেছে ল্যুগার আকৃতির পিস্তল। পাশে ডিবোয়ে, হাতে আরেক পিস্তল।

‘কথা শুরু করো!’

মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরল তানিয়া, অন্য হাত ট্রান্সমিট সুইচে। ‘রানা, আমি তানিয়া। শোনা যাচ্ছে?’

‘তানিয়া, হামলা হবে দ্বীপে। কাভার নাও। ম্যানিনিিকে বলো, যেন অ্যাকটিভেট করে রোবট।’

‘ওকে সারেগার করতে বলো!’ ধমকে উঠল আলেয়া।

একবার জানালার ওদিক দেখল তানিয়া। একটু আগে সাগরে পড়েছে একটা জেট বিমান। অন্য দুটো ওপরে উঠে বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে। একটা আরেকটাকে ধাওয়া করছে। কিন্তু কোন্টা রানার বিমান, তা বলতে পারবে না ও।

পিস্তলের মাযল দিয়ে তানিয়ার মাথা সামনে ঠেলল আলেয়া, ‘পরেরবার একটা কথাও বলব না!’

মাইক্রোফোন হাতে দ্বিধা করছে তানিয়া।

‘ওর স্বামীকে গুলি করো!’ ডিবোয়েকে হুকুম দিল আলেয়া।

‘একমিনিট!’ ফুঁপিয়ে উঠল তানিয়া। ট্রান্সমিট সুইচ অন করল। ‘রানা, আমি তানিয়া! আমরা ওদের হাতে বন্দি! জেলখানায় আটকে রেখেছে! তুমি প্লেন নামিয়ে সারেগার না করলে খুন করবে আমাদের সবাইকে!’

নীরব হয়ে গেল তানিয়া। জানালা দিয়ে চাইল। এদিক ওদিক সরে যাওয়া বন্ধ করেছে একটা বিমান। ওটাই বোধহয় রানার। যে-কোনও সময়ে পিছন থেকে হামলা করবে অন্য বিমানটা।

দুই সেকেণ্ড ওদিকে চেয়ে আবারও সুইচ টিপল তানিয়া। ‘সাবধান! ওরা তোমার পেছনে! যে-কোনও সময়ে...’

কথা শেষ করতে পারল না, কারণ পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে

ওকে চেয়ার থেকে ফেলে দিয়েছে আলেয়া বিনতে আব্বাস। হুমড়ি খেয়ে দেয়ালে পড়ল তানিয়া। ঘুরেই ঘুমি মারতে চাইল বদমাস মেয়েটার মুখে। কিন্তু তৈরি ছিল সে, ধাম করে লাথি বসিয়ে দিল তানিয়ার তলপেটে।

ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল তানিয়া, ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে। ঝাপসা চোখে দেখল, বাইরে সংঘর্ষ হতে হতেও সরে গেল দুই বিমান। একটার গতিপথ থেকে সরে গেছে আরেকটা। পিছনের বিমানের পিছন থেকে বেরোতে শুরু করেছে কালো ধোঁয়া।

তানিয়া সতর্ক করতেই বিদ্যুৎদ্বিগে কাজে নেমেছে রানা, দেরি না করে সরে যেতে শুরু করেছে বামে। আরেকটু হলে চেপে বসত জায়েদ বিন মনযুরের বিমানের বুকে। শেষ মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে ডানে ইয়োক সরিয়ে নিয়েছে ও। গড়াতে শুরু করে সরে গেছে। তখনই শুনেছে, ঠক্ ঠক্ আওয়াজে ফিউজেলাজে বিঁধছে বুলেট।

পাল্টা হামলা করেছে জায়েদ বিন মনযুর। খোলা কার্গো ডোর থেকে .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান ব্যবহার করছে সে।

এখন আবার শত্রু-বিমানের দিকে সরছে রানা, কাত হয়ে চলে গেল ওটার গতি-পথের উপর। আরেকটু হলে গুঁতো লাগত দুই বিমানে। সরে যেতে যেতে রানা টের পেল, ককপিটে দপ-দপ করে জ্বলছে সতর্ক-বাতি। গতি পাওয়ার জন্যে বিমানের নাক নীচে তাক করল রানা। পুরো খুলে দিল থ্রটল। খোলা ফ্ল্যাপ প্রথমবারের মত গুটিয়ে নিল।

রকেটের গতি পেল ওর বিমান, চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম লক্ষ্য করে। জ্বলছে নানান বাতি। কিন্তু কোনওটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বারবার বামে-ডানে সরছে বিমান নিয়ে। সোজা কোনও পথ ধরে এগোলে মরবে।

নানান দিকে বাঁক নেয়ার সময় রানার ধারণা হলো, ওর পিছনে আসেনি জায়েদের বিমান।

পুরো গতি তুলেছে ও, তারই মাঝে সরছে সামান্য পশ্চিমে। আশপাশে শত্রু-বিমানের চিহ্ন নেই।

ইয়োক হাতে ব্যস্ত রানা জানতে চাইল, ‘ওদের দেখতে পাচ্ছ?’

ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে জ্যাসিণ্টা। না, কোথাও নেই।

ডানদিকে বাঁক নিল রানা। আশা করছে এবার অনেক দূর দেখতে পাবে।

‘না, নেই,’ আবার বলল জ্যাসিণ্টা। ‘না, একমিনিট! হ্যাঁ! ওরা আমাদের পিছনে! পিছনে পড়ছে! নীচে নেমে গেছে!’

ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল রানার। ‘তুমি শিয়ার?’

‘হ্যাঁ। পিছিয়ে পড়েছে। বোধহয় ল্যাণ্ড করবে।’

নিজের কপালকে এতটা বিশ্বাস করবে কি না, বুঝতে পারছে না রানা।

এত বড় সুযোগ পেয়েও কেন ওদের ছেড়ে দিচ্ছে লোকটা?

রেডিয়োতে এল আলেয়া বিনতে আব্বাসের কণ্ঠ: ‘মাসুদ রানা, এক্ষুণি বিমান নামিয়ে সারেগার করো, নইলে মরবে তোমার বন্ধুরা!’

রেডিয়ো খোলা, কার যেন গুঙিয়ে উঠবার আওয়াজ পেল রানা। আতর্জিতকার করল কে যেন।

‘ওদের কষ্ট দিলে নিজ হাতে তোমাকে খুন করব, আলেয়া বিনতে আব্বাস!’ কঠোর শোনাৎ রানার কণ্ঠ। বুঝে গেছে, আপাতত সরে যেতে হবে ওকে। আত্মসমর্পণ করলে কোনও লাভ নেই। হাল ছেড়ে দেয়া মানাই বাঁচবে না ওর বন্ধুরা। সাক্ষী রাখবে না এরা। কিন্তু একবার যদি বেরিয়ে যেতে পারে, হয়তো

এদের ঘাড়ে উল্টে ফেলতে পারবে টেবিল। তারা যে-কোনও সময়ে ধরা পড়তে পারে, এটা ভাববে আলেয়া আর জায়েদ। খুন-জখম করলে সেক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেয়া হবে না, সেটাও বুঝবে। এসব কারণে কখনও কখনও জিম্মিকে বাঁচিয়ে রাখে জঙ্গী পিশাচরাও।

‘ক্ষতি করো ওদের, দুনিয়ার কোথাও পালাতে পারবে না!’

কম্বোলে জ্বলে উঠল বাতি। হেডফোনে এল স্ট্যাটিক, তারপর কথা বলে উঠল আলেয়া: ‘দেখব কী করতে পারো তুমি!’ গুলির আওয়াজ হলো, তারপর অফ করে দেয়া হলো ট্রান্সমিশন।

কালো হয়ে গেছে কমিউনিকেশন প্যানেল। বারকয়েক সুইচ অন-অফ করল রানা। কারও সাড়া নেই। ‘রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়েছে,’ বলল জ্যাসিগ্টাকে।

‘এবার আমরা কী করব?’ জানতে চাইল জ্যাসিগ্টা।

‘আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাব দক্ষিণ-পশ্চিমে।’ মন তিক্ত হয়ে আছে রানার। হয়তো শেষ করে দিয়েছে ওই আরব বদমাস মেয়েলোক আসিফ আর তানিয়াকে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কথা ভেবে লাভ নেই, এখন কিছুই করতে পারবে না ও। আগে পৌঁছতে হবে সিশেলসে, অথবা খুঁজে নিতে হবে কোনও জাহাজ বা শিপিং লেন। কোনও জাহাজে রেডিয়ো করে ওটার কাছের সাগরে নামলে বাঁচবে ওরা দু’জন। কিন্তু যা-ই করুক, আগে সরে যেতে হবে দি আইল্যান্ড থেকে।

গনগনে আগুনের ভাটার মত জ্বলছে জায়েদ বিন মনযুরের দুই চোখ। ওই দৃষ্টি গলিয়ে দিতে পারবে স্টিলের পাত। ওর বিমান আর মাসুদ রানার বিমানের মাঝে বাড়ছে ফারাক। লেজ তুলে পালাচ্ছে আমেরিকান সরকারের পা-চাটা লোকটা। আরেকটা কারণে পুড়ে যাচ্ছে জায়েদের অন্তর, তার পছন্দের মেয়েটাকে

নিয়ে ভাগছে শালা! ওই সুন্দরী মেয়েকে একবার বিছানায় তুললৈ... আরও একটা ব্যাপার ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক— হারামজাদা জানে ওর নতুন বেস কোথায়। যেভাবে হোক গোপন রাখতে হবে এ তথ্য।

‘আমাদের চেয়ে গুয়োরের বাচ্চার গতি বেশি কেন?’ ধমকে উঠল জায়েদ।

‘কার্গো ফেলে দিয়েছে তো,’ জবাবে বলল পাইলট, ‘আমাদের চেয়ে এখন ছয় টন হালকা। কমপক্ষে তিরিশ নট গতি বেড়ে গেছে। যদি ধরতে চান, আমাদের কার্গোও ফেলে দিতে হবে। নইলে প্রতি দুই মিনিটে এক মাইল পিছনে পড়ব।’

নতুন করে ভাবছে জায়েদ। এরই ভেতর মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে। বিধ্বস্ত হয়েছে একটা বিমান, আরেকটা নিয়ে ভাগছে শত্রু। ওই লোককে নিজ হাতে খুন করতে পারলে খুশি হতো, কিন্তু আপাতত সেটা সম্ভব নয়। কুত্তার বাচ্চা শেষ করে দিয়েছে দুই কার্গো। অত উপর থেকে পড়ে ন্যানোবটের কত ভাগ রক্ষা পাবে, বলা মুশকিল।

‘আমরা যদি এখন ফেলেও দিই কার্গো,’ আবারও শুরু করল পাইলট, ‘তবুও বড়জোর তার সমান গতি তুলব। ধাওয়া করে গিয়ে ধরে ফেলা সম্ভব হবে না।’

অন্য উপায় আছে, ভাবল জায়েদ। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ‘প্লেন ল্যাণ্ড করো! এখনই!’

নয়

জেট বিমান নিয়ে দি আইল্যাণ্ড থেকে পশ্চিমে উড়ে চলেছে রানা, খানিকটা পিছিয়ে নিল ইয়োক। ধীরে ধীরে এখনও উঠছে, ব্যবহার করছে ইঞ্জিনের পূর্ণ শক্তি আর সুবিধা। তিক্ততা আর রাগে জ্বলছে অন্তর। মানা সত্যিই কঠিন, বন্ধুদের ফেলে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে হচ্ছে ওকে। জোরালো সোলার ফ্ল্যারের কারণে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেনি বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে। কর্তৃপক্ষকে জানানো সম্ভব হয়নি কী কুকীর্তি করছে জায়েদ বিন মনযুর। আনমনে এসব ভাবছিল, হঠাৎ জ্বলে উঠল চোখের কোণ।

‘ধোঁয়া,’ কেঁপে গেল জ্যাসিন্টার কণ্ঠ।

চোখ তুলে চারপাশ দেখল রানা।

ককপিট ভরে উঠছে কালো ধোঁয়ায়। প্যানেলে জ্বলে উঠেছে নতুন কিছু সতর্ক-বাতি। আগের চেয়ে অনেক বেশি কাঁপছে বিমান, যেন হয়ে উঠেছে পাথরের মত ভারী। ইয়োক ব্যবহার করে লড়তে শুরু করল রানা। ওর মনে হলো, নষ্ট হয়ে গেছে সব হাইড্রলিক্স।

‘থামুন!’

‘থামুন!’

‘থামুন!’

আবারও বলে উঠেছে কমপিউটারের কর্কশ নারী কণ্ঠ। এবার

কিন্তু পরামর্শ দিচ্ছে না, সাবধান করছে।

বিমানের মেঝে সমতল হতেই থেমে গেল সতর্কবাণী।

কিন্তু শুরু হয়েছে নানান ধরনের ঝামেলা।

যেন খেপে উঠেছে ককপিটের প্রতিটি ডিভাইস। গ্যানেলের নানান দিকে জ্বলছে অসংখ্য লাল বাতি। চালু হয়েছে কয়েক ধরনের সতর্ক-ধ্বনি। এসবের মানে কী, জানা নেই রানার।

‘এবার নেমে পড়তে হবে,’ বলল রানা। অটোপাইলট বাটন টিপে সিট ছাড়ল। কো-পাইলটের কোমরে আটকানো পানির ক্যান্টিনটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ওর পিছু নিয়ে ছায়ার মত ককপিট থেকে নেমে হোল্ডে চলে এল জ্যাসিণ্টা।

‘গিয়ে শেষ বোটে ওঠো!’ পানির ক্যান্টিনটা মেয়েটার হাতে দিয়ে বলল রানা। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল বিমানের লেজের কাছে একটা রিজিড ইনফ্রাটেল বোট। থরথর করে কাঁপছে বিমান। খুঁজে নিল রানা কার্গো হ্যাচের লিভার, নামিয়ে দিল নীচে। নামছে পিছনের র‍্যাম্প। হুশ্-হুশ্ আওয়াজে ভিতরে ঢুকল হাওয়া। তাতে ভাসছে ধোঁয়া আর হাই-অকটেনের তীব্র গন্ধ।

‘ঘুরে বসো!’ হাওয়ার উপর দিয়ে বলল রানা। ‘পা সামনের দিকে!’

নির্দেশ পালন করল জ্যাসিণ্টা। ডাল থেকে খসে পড়া শুকনো পাতার মত কম্পমান বিমান যেন পড়েছে কোনও ভয়ঙ্কর ঝড়ে। খতম হয়ে গেছে হাইড্রলিক্স, ভাবল রানা। সব সামলে নিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে অটোপাইলট।

মেঝের সঙ্গে বেঁধে রাখা বোটের দড়ি খুলল রানা। এক লাফে চাপল বোটে। ধুপ্ করে পড়েছে জ্যাসিণ্টা আর অচেতন গার্ডের উপর। এখনও চেতনা ফেরেনি লোকটার।

‘শক্ত করে একটা কিছু ধরো!’ বলল রানা। মেয়েটার বুকে শুয়ে ওকে ঢেকে ফেলল, দু’হাতে ধরল ট্র্যানসমের দুই হ্যাণ্ড

হোল্ড । রক্ত সরে সাদা হয়ে উঠল আঙুল । কবজির জোরে এক টানে খুলে দিল এলএপিইএস প্যারাশুটের রিপ কর্ড ।

ভুট্ আওয়াজ তুলে প্যারাশুটের আগেই বেরিয়ে গেল ছোট একটা প্যারাশুট । ওটার টান খেয়ে বেরোল মূল প্যারাশুট । জোর হ্যাঁচকা টানে সঙ্গে নিল বোট । ওটা থামল রানাদের নিয়ে র‍্যাম্পের শেষ মাথায় ।

চট্ করে মুখ তুলে চাইল রানা । আগে খেয়াল করেনি, বোটের নাকের কাছে রয়ে গেছে তৃতীয় স্ট্র্যাপ । ওটাই কার্গো হোল্ডে আটকে রেখেছে বোট । চাপ পড়ায় সুতলির মত সরু হয়ে গেছে নাইলনের দড়ি, কিন্তু ছিঁড়ছে না ।

সাগরে বিমান নেমে যেতেই কার্গো হোল্ডে বেরিয়ে এসেছে জায়েদ বিন মনযুর । একটা ক্রেট খুলে বের করে নিল রকেট লঞ্চার । ওটা কাঁধে তুলে একবার দেখে নিল শত্রু-বিমান । ওটা দূর থেকে দূরে গিয়ে হয়ে উঠেছে ছোট্ট একটা বিন্দু ।

জায়েদ চালু করল রকেট লঞ্চারের সাইট । পলায়নরত রানার বিমানের তাপ পেয়ে লক হলো সিস্টেম । এক সেকেন্ড পর সাইটের পাশে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি, তীক্ষ্ণ টিট-টিট আওয়াজ তুলে জানিয়ে দিল, সে পেয়ে গেছে টার্গেট ।

‘না, স্যার!’ পিছন থেকে কাতরে উঠল পাইলট ।

পান্ডা না দিয়ে ট্রিগার স্পর্শ করল জায়েদ ।

লঞ্চার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল মিসাইল । চলেছে সাগরের ঢেউয়ের সামান্য উপর দিয়ে । প্রোপেল্যান্ট জ্বলে উঠতেই পিছনে উজ্জ্বল কমলা আগুনের হলকা ছাড়তে শুরু করে তীরের মত ছুটল রকেট মাসুদ রানার বিমান লক্ষ্য করে । মনে হলো কয়েক মুহূর্তে পৌঁছে যাবে টার্গেটে ।

আকাশের অনেক উপরে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো রানা ও জ্যাসিণ্টার বিমান, হাজারো জ্বলন্ত টুকরো ঝরঝর করে পড়ছে সাগরে। অবশ্য তার আগেই রেনিগেড স্ট্র্যাপে আটকা পড়া বোট ছাড়া পেয়ে গেছে। দুই হাজার ফুট নীচে সুনীল ভারত মহাসাগর। বোট নিরাপদে নামিয়ে নিত প্যারাসুট, কিন্তু হোল্ডের দড়ির কারণে ওটার পক্ষে সম্ভব হয়নি ভেসে ওঠা।

বেদুইনের উরুর উপর বসে বেল্ট থেকে পিস্তল তুলে নিয়েছে রানা, বাম হাতে ধরেছে বোটের গ্র্যাব হ্যাণ্ডেল, ডান হাতে করেছে নিশানা।

বুলেট লক্ষ্যভেদ করতেই টাশ্ আওয়াজ তুলে ছিঁড়ে গেছে হোল্ডে বাঁধা নাইলন দড়ি। ছাড়া পেয়ে গেছে বোট। মনে হয়েছে দানবীয় কোনও হাত ওটাকে সরিয়ে নিয়েছে বিমান থেকে।

দিনের সোনালি আলোয় আকাশ থেকে পড়ছে ওরা সাগরে। নীচে রওনা হয়ে গেছে লাল আগুন ভরা বিমান, সাগরে পড়বার আগে হলো কয়েকটা বিস্ফোরণ। থরথর করে কাঁপিয়ে দিল চারপাশ। আকাশে ব্যাঙের ছাতার মত মেঘ তৈরি করেছে হাই-অকটেনের কণা। তার সঙ্গে মিশে আছে ঘন কালো ধোঁয়া।

রানাদের কপাল ভাল, এখনও প্যারাসুটের সঙ্গে রয়ে গেছে বোট। নীচের ধোঁয়া আর ঝিলমিলে নানান রঙা কণার মাঝ দিয়ে নাগরদোলার মত নেমে যেতে লাগল ওরা সাগরের দিকে।

মাসুদ রানার বিমানে লেগেছে মিসাইল, নিজ চোখে দেখেছে জায়েদ বিন মনযুর। প্রথম বিস্ফোরণের পর আরও দু'বার বোমা ফেটেছে ওই বিমানে। শেষবার বিকট শব্দে। তখন নানান দিকে ছিটকে গেছে ঘন ধোঁয়ার মেঘ। ওটা থেকে ঝরছিল হাজার হাজার ধাতব টুকরো। সকালের রোদে একেকটা যেন পশ্চিমাকাশের জ্বলন্ত উল্কা। লেজে ধোঁয়া আর আগুন।

বিমান পড়েছে অন্তত পাঁচ মাইল দূরে। জায়েদের শুধু আফসোস, নিজ হাতে আগুনে পুড়িয়ে মারতে পারল না মাসুদ রানাকে। তার আগে ছিলে নিত চামড়া। পোড়া ওই লাশ দেখলেও মনে সান্ত্বনা থাকত। গুয়োরটার কারণে হারাতে হলো ওই সুন্দরী মেয়েটাকে। সবই আল্লার ইচ্ছা, যা হয়েছে তা হয়তো ভালর জন্যেই।

এখন একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, আর কখনও ফিরে আসবে না মাসুদ রানা। কিন্তু মরুর সেই কূপ থেকে উঠল কী করে ব্যাটা!

জায়েদ বিন মনযুর অন্তর থেকে বিশ্বাস করলেও, আসলে ধরা ধামে রয়ে গেছে যমের অরুচি, ত্যাড়া লোক ওই মাসুদ রানা। বিমানের পেটে মিসাইল লাগতেই শুনেছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। বুঝতে দেরি হয়নি এবার সাগরে গিয়ে পড়বে ওরা। দেরি না করে জ্যাসিণ্টা আর আরব প্রহরীকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে জ্বলন্ত বিমান থেকে। বিমানের লেজের কাছে আটকে গিয়েছিল বোট।

তখন কার্গো হোল্ডের দড়ি টেনে রেখেছিল ওদেরকে, আরেকটু হলে উল্টো হয়ে বুলত বোট। ওটার লেজের কাছে ছিল প্যারাসুট। ওটার কাজ গতি কমিয়ে দেয়া। বিমানের ডেক থেকে নেমে গেলেই খুলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। গুলি করে রানা ছিঁড়ে দিয়েছে দড়ি। তারপর নীচে রওনা হয়েছে, অল্পক্ষণেই অনেক কমে গেছে পড়বার গতি।

ওরা যখন ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘে ঢুকল, বোটের নাক ঝুঁকে ছিল মাত্র পনেরো ডিগ্রি। উপরের প্যারাসুট হ্রাস করেছে পতনের গতি। ওরা যেন হয়ে উঠেছে ডার্ট, আর পিছনের প্যারাসুট হচ্ছে ফেদার। স্কাই ডাইভের মত মসৃণভাবে নামতে পারেনি। ওরা যেন কালো হীরা ভরা কোণও ঢালে নেমেছে টোবোগানে চেপে।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পড়েছে বোট। ক্রমেই আরও খাড়া হয়ে উঠেছে ওটার নাক। ওদের উপরের একটা প্যারাসুটে জ্বলন্ত জঞ্জাল পড়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ওটা। সামনে বা নীচে শুধু কালো ধোঁয়া আর ঝিলমিলে হাই-অকটেন দেখেছে রানা।

তারপর হঠাৎ করে কোথেকে আকাশে উঠে এল সাগরের বুক। নাক তাক করে পানিতে নামল বোট, এক মুহূর্তের জন্য তলিয়ে গেল, তারপর উঠে এল ‘ভুশ্শ’ আওয়াজ তুলে। আকাশের দিকে রওনা হয়ে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু শক্ত হাতে ধরেছে হ্যাণ্ডেল। ওই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছে ও চেপে বসেছে রোডিয়োর খ্যাপা এক ষাঁড়ের পিঠে।

তুমুল গতির তোড়ে পিছলে বোট চলে গেছে পঁয়তাল্লিশ গজ দূরে, তারপর থেমেছে। ওদের পিছনের সাগরে ঝপ করে নেমেছে প্যারাসুট।

সাগরে বিধ্বস্ত বিমানের জঞ্জালের ভিতর চারপাশে ধোঁয়া আর ধোঁয়া। পানির উপর জ্বলছে হাই-অকটেনের আগুন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাসছে বিয়ের অনুষ্ঠানে হরেক রঙা কাগজের মত বিমানের ইনসুলেশন।

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারেনি ওরা কেউ। চুপ করে বসে থেকেছে বোটে। শক্ত করে ধরে রেখেছে পাশের হ্যাণ্ডেল। ওদের বন্দির জ্ঞান ফিরেছে, পিরিচের মত বড় চোখ করে দেখছে চারপাশ।

হ্যাণ্ডেল ছেড়ে চারদিক দেখে নিল রানা।

‘এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না বেঁচে আছি,’ ঢোক গিলে বলল জ্যাসিন্টা।

নিজেও রানা কম বিস্মিত নয়। ওর মন নীরবে বলল, এবার কেটে গেছে সব ফাঁড়া, এরপর খুলবে কপাল। বুকের কাছে চেপে ধরে রেখেছে মেয়েটা পানির ক্যান্টিন।

‘আমরা যে শুধু বেঁচে আছি, তাই নয়,’ মৃদু হাসল রানা, ‘আমাদের সঙ্গে পানি আছে, বোটে আউটবোর্ড মোটরও আছে।’

ওটার সামনে পৌঁছে ট্যাঙ্কে ফিউয়েল আছে কি না দেখল রানা। একবার ভাবল, ফেলে দেবে প্যারাসুট। তখনই মন বলল, কিছু হারালে পরে আর পাবে না। প্যারাসুট ব্যবহার করে বোটে ছাউনি তৈরি করা যেতে পারে।

দড়ি টেনে বোটের কাছে আনল রানা প্যারাসুট, গুটিয়ে তুলতে শুরু করেছে ডেকে।

ওর পাশে হাত লাগাল জ্যাসিন্টা।

‘এই জিনিস পরে কাজে আসবে,’ বলল রানা। ‘দেখো তো বালতির মত কিছু পাও কি না। পানি সৈঁচতে হবে।’

বোটের ভিতর উঠেছে কমপক্ষে বিশ গ্যালন পানি।

না, বালতি বা মগের মত কিছুই নেই বোটে।

রানার কাছ থেকে নিয়ে বোটের সামনের দিকে প্যারাসুট গুছিয়ে রাখল জ্যাসিন্টা। এদিকে আউটবোর্ড চালু করতে চাইল রানা। তৃতীয়বার চেষ্টার পর গর্জে উঠল ইঞ্জিন, চলছে মসৃণ আওয়াজে।

থ্রটল ঘুরিয়ে পশ্চিমে চলল রানা। ধোঁয়া আর আগুনের ভিতর থেকে সরে যাচ্ছে। একমিনিট পেরোবার আগেই সাগরের জঞ্জাল ভরা এলাকা থেকে দূরে সরে গেল ওরা। তাজা হাওয়ায় দম নিয়ে মনে হলো, নতুন করে বাঁচতে শুরু করেছে।

‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’ জানতে চাইল জ্যাসিন্টা।

‘ওদের কাছ থেকে দূরে কোথাও,’ বলল রানা। জ্বলন্ত তেল, ধোঁয়া আর জঞ্জালের ওপাশে কয়েক মাইল দূরে *দি আইল্যান্ড*। আশা করছে, ওদিক থেকে দেখতে পাবে না কেউ ওদেরকে।

‘কিন্তু এই বোটে চেপে তো যেতে পারব না সিশেলসে,’ রানার চোখে চাইল জ্যাসিন্টা।

‘তা পারব না, কিন্তু হয়তো পৌছে যাব শিপিং লেনে। কোনও জাহাজ থামিয়ে উঠে পড়া যাবে।’

আরেকবার ট্যাক্সের ফিউয়েল লেভেল দেখল রানা। উপর থেকে নামবার সময় ট্যাক্স থেকে ঝরঝর করে পড়েছে অনেক তেল। যা রয়ে গেছে, তাতে কত দূর যেতে পারবে, আঁচ করা কঠিন। আপাতত ইঞ্জিনের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করব, ভাবল ও। পরে কমিয়ে দেব গতি। ওর হাতের ছোঁয়ায় ছোট বোট হাওয়ার বেগে ছুটল ধূসর সাগরে।

কোনও বিপদ ছাড়াই পেরিয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিট, তারপর রানা দেখল, জোরে ধাক্কা খাওয়া তুবড়ে যাওয়া তরমুজের মত ইনফ্লেটেবল দেয়ালে গা চেপে ধরেছে জ্যাসিণ্টা।

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইল রানা।

ইনফ্লেটেবলের একটা চেম্বারে চোখ রেখে বলল জ্যাসিণ্টা, ‘একটা ফুটো। বড় হচ্ছে।’

‘ফুটো বড় হচ্ছে?’

www.boighar.com

আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাসিণ্টা। ‘পানি উঠছে না। কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস।’



দশ

পশ্চিম দিগন্ত লক্ষ্য করে বোটের নাক তাক করেছে রানা। ওদিকে কী দিয়ে বোটের রাবারের ফুটো গা মেরামত করবে, তা-ই ভাবছে জ্যাসিণ্টা। আগে জানতে হবে, আরও কোনও সমস্যা দেখা দেবে

কি না ফুটোর কারণে ।

‘কী বুঝলে?’ জানতে চাইল রানা ।

‘পিনের মত ছোট অন্তত বিশটা ফুটো আছে,’ বলল জ্যাসিণ্টা,
‘চাপ তৈরি করে বেরোচ্ছে বাতাস ।’

উঠে দাঁড়াল রানা । ‘আপাতত তুমি বোট চালাও, ওদিকটা
আমি দেখছি ।’

ট্র্যানসমে পৌঁছে থ্রটল বুঝে নিল জ্যাসিণ্টা ।

ফুটোগুলো দেখল রানা । সবমিলে বিশটার বেশি । দু’দিকের
রাবারের গা চেপে ধরলে থেমে যাচ্ছে বাতাস বেরোনো ।

‘এরকম হলো কী করে?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা ।

অদ্ভুতুড়ে প্যাটার্নে ছড়িয়ে আছে সব, যেন লেগেছে বন্দুকের
পাখি-মারা নয় নম্বর ছররা । বোটের সামনে থেকে শুরু করে
পিছনেও আছে । ‘বিমানের টুকরো,’ আন্দাজ করল রানা । ‘হাই-
অকটেনের জ্বলন্ত কণাও হতে পারে । জায়গায় জায়গায় পুড়ে
গেছে ।’

বাতাসের অন্য চেম্বারে হাত বোলাল রানা । ওগুলো রাবারের
টিউব দিয়ে তৈরি । সবমিলে আট ফুট লম্বা, ডায়ামিটারে সতেরো
ইঞ্চি । বোটে ‘সবমিলে চারটে । দুটো সামনে, দুটো পিছনে ।
সামনের দুটো সমান্তরাল । শেষ মাথায় বাঁক নিয়ে তৈরি করেছে
বোঁচা বো । পিছনে দুটো টিউব দু’পাশে । মাঝে বোটের ধাতব
ট্র্যানসম, শেষে আউটবোর্ড মোটর ।

সামনে ডানদিকের চেম্বারে আরও দুটো ফুটো পেল রানা ।
খরাপ সংবাদ আছে আরও । এখানে-ওখানে ছিট ছিট দাগ ।
ওখানে লেগেছে জ্বলন্ত তেল । হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেটে
যাবে ওসব জায়গা ।

‘দেখে কী মনে হচ্ছে?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা ।

চোখ বড় বড় করে কথা শুনছে বেদুঈন বন্দি । মুখ বেঁধে রাখা

হয়েছে, কিন্তু কান খোলা ।

‘পোর্ট সাইড ঠিকই আছে,’ বলল রানা । ‘কিন্তু তাতে লাভ হবে না । বাতাস বেরোলে নেতিয়ে পড়বে রাবারের স্টারবোর্ড ।’

বোটের সামনের ডেকে দুটো লকার, দুটোই খুলল রানা । ভিতরে পেল মাত্র একটা লাইফ জ্যাকেট, কয়েকটা ফ্লেয়ার, ছোট একটা নোঙর ও সামান্য দড়ি ।

‘রাবারের বোট, কিন্তু রিপেয়ার কিটে হ্যাণ্ড বা ফুট পাম্প নেই,’ বিড়বিড় করল রানা । ভাবল, সোহেল হলে বলত, আমি মরলে আমার উকিল কেস করবে ওই শালাদের বিরুদ্ধে!

‘আমাদের বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভাল,’ বলল জ্যাসিণ্টা । ‘গিয়ে উঠব ওই লোহার পচা দ্বীপে । সারেগার করব ।’

‘সেক্ষেত্রে জেলে আটকে রাখবে, আর নিজেদের কাজ শেষ হলেই খুন করবে,’ জানিয়ে দিল রানা ।

‘এখানে থাকলেও তো প্রায় একই কথা, মরতে হবে পানিতে ডুবে,’ বলল জ্যাসিণ্টা ।

‘দুটো টিউব চুপসে গেলেও ডুবে মরব না আমরা ।’

‘কিন্তু অন্য দুটো ধরে ভেসে থাকতে হবে,’ বলল জ্যাসিণ্টা । ‘জাহাজ-ডুবির মানুষের মত না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মরব । কিংবা যাব হাঙরের পেটে ।’

‘জায়েদ বিন মনযুরের গুলি খেয়ে মরার চেয়ে সাগরে বেঁচে থাকা ঢের ভাল,’ বলল রানা । ‘তা ছাড়া, আমাদের জিততে হবে জরুরি এক প্রতিযোগিতায় ।’

‘দেশে ফিরে বন্ধুর পয়সায় নামকরা হোটেলে ডিনার— এই তো?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা ।

মাথা দোলল রানা । ‘হ্যাঁ । আর দেখো, সাগরেই পেয়ে যাব কোনও সাহায্য ।’

‘যদি না পাও?’

‘পাব,’ জোর দিয়ে বলল রানা, আত্মবিশ্বাসী। লকার থেকে বের করল ফ্লোর। বুক পকেটে রেখে দিল বিনকিউলারের পাশে। লাইফ জ্যাকেট নিয়ে বাড়িয়ে দিল জ্যাসিস্টার দিকে। ‘পরে নাও। ভয় পেয়ো না। সব ঠিক থাকবে।’

মেয়েটা জ্যাকেট পরছে, লকার থেকে পনেরো পাউণ্ড ওজনের নোঙর বের করল রানা। ওটার গলার বড় ক্যারাবিনার দিয়ে গেছে দড়ি। ওটা খুলে নোঙর সরিয়ে নিল রানা। বন্দির পায়ের কর্ডে হুক দিয়ে লাগিয়ে দিল নোঙর।

ভীষণ ভয় নিয়ে রানাকে দেখল বেদুঈন।

‘সাবধান হওয়ার জন্যে,’ বলল রানা।

চেহারা দেখে মনে হলো না সে বিশ্বাস করছে ওকে।

বেদুঈনের মুখের বাঁধন খুলে দিল রানা। ‘তুমি ইংরেজি বুঝতে পারছ, তাই না?’

‘অল্প-স্বল্প বুঝি,’ আস্তে করে মাথা দোলাল লোকটা।

‘ডুবে যেতে শুরু করেছে এই বোট,’ বলল রানা। ‘বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। ওজন কমাতে গিয়ে তোমাকে ফেলে দিতে পারি সাগরে। অথবা ইচ্ছে হলে সাহায্য করতে পারো। কোনটা চাও?’

‘সাহায্য করব,’ তড়িঘড়ি বলল সে, ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, যা করতে বলবেন, তা-ই করব।’

‘তোমার পায়ে নোঙর থাকবে, চালাকি করতে গেলে ভুল করবে,’ বলল রানা। দেখিয়ে দিল বোটের সামনের দিক। ‘তুমি সামনের দুটো ফুটো চেপে রাখবে, যাতে বেরোতে না পারে বাতাস।’

মাথা দোলাল বেদুঈন। ‘পারব। কোনও চিন্তা নেই।’

‘গুড,’ বলল রানা, ‘আমাদেরও চিন্তা নেই, কারণ কাজটা করতে না পারলে ফাস্ট হবে তুমি— আমাদের আগে সাগরের তলা ছুঁতে পারবে।’

‘নাউযুবিল্লা!’ মাথা নাড়ল বেদুঈন।

বন্দির কোমরের দড়ি টিলা করল রানা, তারপর খুলে দিল।
‘নাম কী তোমার?’

‘ইউনুস বিন আদিল।’

‘এর টানে না আবার হাজির হয় খ্যাপা তিমি মাছ,’ মনে মনে বলল রানা।

বেদুঈনের দু’পা ভাল করে বাঁধা, গোড়ালিতে নোঙর, সামনে বেড়ে বোটের বো-তে পৌঁছে গেল সে। রানা দেখিয়ে দিতে বড় দুই ফুটের উপর রাখল দুই আঙুল।

‘শক্ত করে চেপে রাখো,’ বলল রানা।

দু’হাতের দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল সে ফুটো।
কয়েক সেকেন্ড পর চওড়া হাসল। ‘আর বাতাস বেরোচ্ছে না।’

‘আর সব ফুটোর কী হবে?’ জানতে চাইল জ্যাসিন্টা।

‘প্রথম শিফটে থাকছি আমি,’ বলল রানা। ‘পশ্চিমে যেতে থাকো তুমি।’

পরের তিন ঘণ্টায় দু’বার জায়গা বদল করল ওরা দু’জন।
কিন্তু নেতিয়ে আসতে শুরু করেছে পিছনের চেম্বার। স্টারবোর্ডে কাত হয়ে গেল বোট। ডেবে যাচ্ছে পিছনের অংশ। মাঝে মাঝে রাবারের দেয়াল টপকে ঢুকছে সাগরের পানি। ফুটো চেপে রাখতে গিয়ে ভিজতে লাগল ওরা। ধীরে ধীরে আরও নীচে নেমে গেল বোটের পিছনের অংশ।

ওদের কপাল ভাল, পৃথিবীর অন্য সব সাগরের চেয়ে অনেক শান্ত ভারত মহাসাগর। ঢেউও তুলনায় বেশ ছোট। বড়জোর এক বা দেড় ফুট উঁচু। এগোবার গতি কমিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কা এড়াল রানা।

দুপুর হয়ে গেল, কিন্তু কোথাও নেই কোনও জাহাজ। দিগন্তে কোনও ধোঁয়াও নেই। মাথার উপর গনগনে আগুন ঢালছে সূর্য।

পুট-পুট আওয়াজ ছাড়ল মোটর। ফুরিয়ে এসেছে তেল। বাধ্য হয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা।

‘আর ফিউয়েল নেই,’ আন্দাজ করল জ্যাসিণ্টা।

‘রিয়ার্ভ ট্যাঙ্কে আছে এক গ্যালনের মত,’ ফিউয়েল লাইনের স্টপকক দেখাল রানা। ‘ইচ্ছা করলে চালু করা যায় ইঞ্জিন। কিন্তু শেষটুকু তেল ব্যবহার করা উচিত হবে না।’

‘জমিয়ে রেখে কী লাভ?’

‘হয়তো দেখলাম দিগন্তে জাহাজ, তখন ওটার কাছে পৌঁছতে ওই ফিউয়েল কাজে আসবে,’ বলল রানা।

আন্তে করে মাথা দোলাল জ্যাসিণ্টা। ‘সরি, আগে বুঝিনি, সব দিক ভেবে কাজ করো তুমি।’

মৃদু হাসল রানা। ‘সরি কীসের?’

‘সরি, কারণ অনেক স্বল্প বুদ্ধির মানুষ ভেবেছিলাম তোমাকে।’

থেমে গেছে আউটবোর্ড ইঞ্জিনের জোরালো গুঞ্জন, এখন চারপাশ বড় বেশি নীরব। বাতাসও নেই বললেই চলে। থমথমে পরিবেশ। অবশ্য বোটের পাশে লাগছে ঢেউ, আওয়াজ তুলছে ছল-ছলাৎ, কখনও উঠে আসছে ডেকে।

শান্ত সাগরে বোতলের কর্কের মত উঠছে-নামছে বোট। মৃদু স্রোত নিয়ে চলেছে দূরে। লাখ লাখ বর্গ-মাইল এলাকায় ষোলো ফুট ইনফ্লুটেবল বোটে মাত্র তিনজন মানুষ ওরা।

‘এবার কী?’ রানার দিকে চাইল জ্যাসিণ্টা, চোখে ভরসা।

‘আপাতত শুধু অপেক্ষা,’ বলল রানা, ‘দেখা যাক ভাগ্য আমাদের কী উপহার দেয়।’

এগারো

অচেনা, পুরনো জাহাজের কার্গো হোল্ডে কোটি কোটি ন্যানোবটের ড্রামের পাশে পুরো পনেরো ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে সোহেল আহমেদ। সাধারণ কোনও মানুষ ভয়ে নষ্ট করে ফেলত পাজামা। দরজায় দমাদম ঘুষি মেরে চিৎকার জুড়ত: 'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে বেরোতে দাও!' কিন্তু মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের নিজ হাতে গড়া বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। চুপচাপ বসে না থেকে সময়টা ব্যয় করেছে জরুরি কাজে।

এক এক করে সার্চ করেছে প্রতিটি ট্রাক। পাওয়া গেছে পানি ভরা তিনটে বোতল। দুটো খালি করে মিটিয়ে নিয়েছে তৃষ্ণা। তৃতীয়টা রেখেছে সংগ্রহে। এ ছাড়া পেয়েছে যিপলক করা প্লাস্টিকের এক ব্যাগ ভরা এক ধরনের জার্কি। ওই মাংস গরুর নয়, হতে পারে ছাগল, উট বা ভেড়ার। খুশি মনে পেট পুরে খেয়েছে, বাকি অংশ রেখে দিয়েছে পরে খাবে বলে।

খাওয়া শেষ করে হুড খুলে খুলে দেখেছে প্রতিটা ট্রাকের ইঞ্জিন। কয়েকটা পরিকল্পনা এসেছে মনে। একবার ভেবেছে, স্যাবোটাজ করবে। ছিঁড়ে ফেলবে ডিস্ট্রিবিউটার কেবল, নষ্ট করে দেবে কার্বুরেটর বা খুলে ফেলবে অয়েল প্লাগ। এসব করলে সঠিক সময়ে রওনা হতে পারবে না ট্রাক বহর। অথবা কিছু দূর যাওয়ার পর হয়ে পড়বে বিকল।

কিছু এসবের কিছুই করেনি সোহেল। যদি রওনা দিতে না পারে ট্রাক, ও নিজেও আটকা পড়বে জাহাজে। আর বিশ মাইল যাওয়ার পর ট্রাক নষ্ট হলে সত্যিকারের সর্বনাশ হবে। ইয়েমেনে যে বিপদে পড়েছিল, হয়তো তার চেয়ে অনেক বড় ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে হবে। ক্রুদ্ধ জঙ্গীদের বুটের নীচে পিষ্ট হতে বেদম আপত্তি আছে ওর।

ভেবেছে, কোনওভাবে বেরিয়ে যাওয়া যায় কি না। প্রকাণ্ড দরজা এখনও বাইরে থেকে বন্ধ। অবশ্য, তা বঁড় কোনও সমস্যা হবে না। ভারী ট্রাকের গুঁতো খেলে মড়মড় করে ভেঙে পড়বে দরজা। কিন্তু তারপর? ওর মনে আছে, কীভাবে জাহাজের হোল্ডে উঠেছে ট্রাক। মেঝেতে চাকার অনেক দাগ। ওসব থেকে বুঝে নিয়েছে, জাহাজের পিছনের দিকে আছে এসব ট্রাক।

সাধারণ রোল অন/রোল অফ জাহাজ বা ফেরি নয় এ জাহাজ। সামনের দিকে কোনও দরজা নেই বলেই ওদিক দিয়ে বেরোতে পারবে না যানবাহন। আর যেভাবে দুলতে দুলতে চলেছে জাহাজ, বোঝা যাচ্ছে, আকারে খুব বড়ও নয়। অনেক বেশি দূরে নেবে না কার্গো।

জোর খাটিয়ে হোল্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া অনুচিত হবে বলে মনে হয়েছে ওর। কেউ দেখে ফেললে রেলিং টপকে ঝাঁপ দিতে হতো সাগরে। তার চেয়ে অপেক্ষা করা ঢের ভাল। এসব ভেবেই সামনের ট্রাকের বেডে ড্রামের ওপাশে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। দেরিও হয়নি ঘুমাতে। কয়েক ঘণ্টার ওই ঘুম ওর ভাঙল উপরের ডেকে হই-চই শুনে।

সোহেলের মনে হলো, অনেক কমে গেছে জাহাজের গতি। সেভাবে দুলছেও না। একটু একটু করে সরছে। অন্য জাহাজের ভেঁপুর আওয়াজ জানাচ্ছে, ওরা পৌঁছে গেছে কোনও বন্দরে। আর তার মানের কাজে নামবার সময় হয়েছে ওর। এখন

রহস্যজনক এই বন্দরে নামলেই হয়তো গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেবে ট্রাক বহর।

জাহাজের পিছনে কার্গো হোল্ডের দরজার বল্টু খুলবার ‘ঘট্! ঘট্যাং!’ আওয়াজ হলো। কয়েক মুহূর্ত পর ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলে খুলে গেল স্লাইডিং ডোর, হোল্ডে পড়ল হলদে আলো।

বারো

ঝলমলে দুপুর পেরিয়ে বিকেলের পথে হাঁটছে গনগনে সোনালি সূর্য, বিশাল মেঘহীন আকাশ পরিক্রমার এক পর্যায়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেবে পশ্চিমের উঠানে, তারপর তার বিদায়ের পালা সাগরের গভীর বুকে।

আজ সকালে বড় কোনও ঝামেলা ছাড়াই তার ত্রিশজন বেদুঈন জঙ্গীর সহায়তা নিয়ে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রবার্তো ম্যানিনির ভাসমান দ্বীপ দখল করেছে জায়েদ বিন মনযুর। তার দলের কাছে আছে ভারী মেশিনগান, আরপিজি আর এগারোটা গ্রাউণ্ড-টু-এয়ার মিসাইল। মাসুদ রানার পিছনে একটা মিসাইল খরচ হয়ে না গেলে পুরো এক ডজনই থাকত।

ম্যারিনায় ফিউয়েলিং শেষে নীরবে অপেক্ষা করেছে জায়েদের ফ্লাইং বোট, প্রয়োজন পড়লে ঝটপট রওনা দেবে। কিন্তু নিজেকে নিরাপদ মনে করেছে জায়েদ। এখানে টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না সেরেংগেরেল বাদসাইখান আর তার লোক। কনসোর্টিয়ামের কেউ জানে না, আমেরিকান বা বাংলাদেশি এজেন্টদের কাঁচ কলা

দেখিয়ে নিজের কাজ সারছে সে। পুরো অন্ধকারে থাকবে সবাই।

আর এ কারণেই খুশি খুশি তার মন। দাঁড়িয়ে আছে অবযার্ভেশন ডেকে। জায়গাটা দি আইল্যান্ডের কন্ট্রোল রুমের বাইরে বেরিয়ে থাকা একটা অংশ। দুই বাংলাদেশি যুবক-যুবতী আর ইটালিয়ান বিলিওনেয়ার বিজ্ঞানী আছে হেলিপ্যাডের মত খোলা এক জায়গায়। রেলিঙে হ্যাণ্ডকাফে বেঁধে রাখা হয়েছে ওদের হাত। কাছেই পাহারা দিচ্ছে আলেয়া বিনতে আব্বাস আর কয়েকজন বেদুঈন পাহারাদার, হাতে পিস্তল, কাঁধে রাইফেল। কন্ট্রোল রুমে বসে আছে ডিবোয়ে, ব্যস্ত ল্যাপটপের কি-বোর্ডে।

গুরুত্বপূর্ণ বন্দিদের উদ্দেশ্যে বলল জায়েদ, ‘হয়তো ভাবছ, এখনও কেন বাঁচিয়ে রেখেছি তোমাদের।’

‘নিজের প্রয়োজনেই, নইলে নিঃসন্দেহে খুন করতে,’ বলল তাল গাছের মত ঢ্যাঙা আসিফ রেজা। সবার হয়েই কথা বলেছে। ‘কোনও বিপদে পড়লেই ঝামেলা-মুক্ত হতে ব্যবহার করবে আমাদের। আর চিন্তা কোরো না, সামনে আসছে মস্ত বিপদ। তখন তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না কেউ।’

কুটিল হাসল জায়েদ। বোকা লোক নয় সে, এভাবে ওর সম্মান লোকটা নষ্ট করছে বলে অপমানিত বোধ করল। রাগ সামলে রেখে চলে গেল আসিফের পিছনে।

‘তোমার নাম তো আসিফ রেজা?’

‘জীবনে প্রথমবারের মত ঠিক কথা বললে।’

অপমান আরও বাড়ল জায়েদের। এই বদমাস ঢ্যাঙা লোকটা ওর চেয়ে লম্বায় বেশি কেন? খালিফের কথা মনে পড়ল তার। এক শাহ্ সবসময়ে দরবারের অন্যদের চেয়ে উঁচু চেয়ারে বসত। আর ইরানের শাহ্ অন্য আর কোনও চেয়ারই রাখত না দরবারে। অন্যদের চেয়ে কমপক্ষে এক মাথা উঁচু থাকত তার মাথা।

বুটের ডগা দিয়ে আসিফের হাঁটুর পিছনে জোর খোঁচা দিল

জায়েদ ।

ঝপ্ করে বসতে বাধ্য হলো আসিফ । তার আগে পড়বার সময় খুতনি লেগেছে রেলিঙে । ব্যথায় কুঁচকে ফেলেছে মুখ । রক্তে লাল হয়ে গেল ঠোঁট ।

পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আসিফকে দেখল জায়েদ বিন মনযুর । ‘আগের চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে তোমাকে, কুকুরের বাচ্চা! উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কোরো না!’

তানিয়া শান্ত স্বরে বলল, ‘তুমি কি জানো, জায়েদ বিন মনযুর, তুমি সত্যিকারের একটা গুয়োরের বাচ্চা?’

‘অনুগত স্ত্রী হওয়া খুবই ভাল,’ বলল জায়েদ, ‘তারা বেয়াড়া কথা বললে মাফ পেত না স্বামীর কাছ থেকে । আমি তোমার স্বামী নই, কিন্তু তুমি আমার কথা মত না চললে ভীষণ ব্যথা পাবে তোমার স্বামী ।’

‘দয়া করে অত্যাচার কোরো না, জায়েদ,’ করুণ সুরে বললেন ম্যানিনি । ‘তুমি না আমার ছাত্র? কত কিছু না শিখিয়ে...’

‘বহু বছর আগে ছাত্র ছিলাম । এখন নই ।’

‘আমাদের বিনিময়ে যা চাইবে, তাই দেব । কোটি কোটি টাকা দিতেও আপত্তি নেই । এখনই লিখে দেব এক শ’ মিলিয়ন ডলার । ছেড়ে দাও আমাদেরকে । এই টাকার কথা ডিবোয়ে বা হ্যাভেলা জানে না ।’

‘অনেক বছর আগে এক মরুদ্যানের মালিক অনুনয় করেছিল, কথা শুনে তার কথা মনে পড়ল,’ বলল জায়েদ । ‘সে বলেছিল, “সবই তোমাদের দেব । বদলে ক্ষতি কোরো না আমার ছেলের । যা খুশি নিয়ে যেতে পারো, বাধা দেব না ।” কিন্তু এখন জানি, কেন তার কথা প্রত্যাখ্যান করেছিল মরুদস্যুরা । ...পাগল বৈজ্ঞানিক, তুমি যা বলছ, তা বড়জোর বালতির ভেতর এক ফোঁটা পানি । এতে কিছুই হবে না । আমি চাই হাতের মুঠোয়

দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা ।’

www.boighar.com

চুপ করে চেয়ে রইলেন ম্যানিনি, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁর ছাত্র এত বড় পাষাণ । চোখে অবিশ্বাস ।

কণ্ট্রোল রুমের দিকে চোখ গেল জায়েদের । চোখাচোখি হলো ডিবোয়ের সঙ্গে । ‘এবার সব পাওয়ার সময় । ন্যানোবটের পালকে নির্দেশ দাও, ডিবোয়ে । উঠে আসুক ওরা ।’

‘জান,’ আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল আলেয়া, ‘তুমি পুরোপুরি শিয়ার তো?’

কঠিন চোখে প্রেমিকাকে দেখল জায়েদ । ‘চুপ করো, বোকা মেয়েলোক! সময় হয়েছে ওদের ভূমিকা রাখার! উঠে আসুক সাগরের ওপরে! শুরু করুক কাজ! শীতল হোক সাগর, তাতে অনেক দ্রুত কাজ হবে!’

‘কিন্তু বিদেশিদের স্যাটালাইট?’ তর্ক জুড়তে চাইল আলেয়া, ‘ওরা কিন্তু সবই দেখবে । নুমার চেয়ে অনেক বড় বিপদ তৈরি করতে পারে তারা ।’

‘গতিপথ প্লট করেছে ডিবোয়ে, দেখা হয়েছে প্রতিটি গুপ্তচর বা পরিবেশ স্যাটালাইটের গতিপথ । হিসেবে বাদ পড়েনি এদিকের সাগরের কিছুই । এখান থেকে নির্দেশ দিলে ন্যানোবটের পাল ঠিক সময়ে উঠে আসবে, আবার দরকারে তলিয়ে যাবে । ইয়েমেনে বসে এত নিখুঁতভাবে নির্দেশ দিতে পারতাম না । কেউ জানবে না ওরা কী করেছে । সব জাদুর মত ।’

‘কাজটা খুব জটিল মনে হচ্ছে,’ নিচু স্বরে বলল আলেয়া ।

‘জানো না, তাই এত ভয় পাচ্ছ,’ জোর দিয়ে বলল জায়েদ । ‘সাগরের এদিকে ক’টা রণতরী ছাড়া কিছুই নেই । বেশিরভাগ স্যাটালাইট এখন হাজার হাজার মাইল দূরে, উত্তর দিকে । চোখ রেখেছে নানান দেশের সেনাবাহিনী আর মধ্যপ্রাচ্যের তেলক্ষেত্রের ওপর । নজর ইরান, সিরিয়া বা ইরাকের ওপর । হিসাব কমছে, কী

করছে রাশান ট্যাঙ্ক, কাম্পিয়ান সাগরের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, বা পারস্য সাগরে আমেরিকান ব্যাটল গ্রুপ। এদিকে দৃষ্টিস্তার কোনও কারণ নেই আমাদের।’

পিয়েরে ডিবোয়ের দিকে চাইল জায়েদ। ‘আপাতত কতক্ষণ তুলে রাখতে পারবে ওপরে?’

চট্ করে কমপিউটার দেখে নিল ডিবোয়ে। ‘পরের স্যাটালাইট আসতে তেপান্ন মিনিট, তার আগ পর্যন্ত...’

‘তা হলে তুলে আনো,’ নির্দেশ দিল জায়েদ।

মাথা দোলাল ডিবোয়ে, কন্ট্রোল ফ্রিনে গিয়ে টাইপ করতে লাগল জায়েদের তেরো ডিযিটের কোড। ব্রডকাস্টের ট্রান্সমিশন চলবে দিগন্ত পর্যন্ত। ওখান থেকে দূরের ন্যানোবটকে সিগনাল দেবে আগের ন্যানোবট।

এন্টার কি টিপে দিল ডিবোয়ে। ‘সিগনাল শুরু হয়েছে।’

সাগরের দিকে চেয়ে রইল জায়েদ বিন মনযুর। অপেক্ষা করছে প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য। পেরিয়ে গেল এক মিনিট, তারপর শুরু হলো পরিবর্তন। দ্রুত পাল্টে যেতে লাগল সাগর।

সামান্যতম হাওয়া নেই কাঁচের মতন মসৃণ সাগরে। কিন্তু হঠাৎ বিন্দু বিন্দু কী যেন উঠে আসতে লাগল সাগরের বুকে। মনে হলো কোনও ধরনের অ্যালগি।

যেদিকে চোখ গেল, চারপাশে শুধু ওই জিনিস। কিন্তু জায়েদ জানে, দিগন্তের ওপাশেও উঠে এসেছে একইরকম ন্যানোবট। শত শত কোটি, হাজার মাইল জুড়ে।

‘ডানা মেলতে নির্দেশ দাও,’ বলল জায়েদ।

আবারও কি-বোর্ড টিপতে শুরু করেছে ডিবোয়ে। ‘অর্ডার এনকোডেড। এবার ট্রান্সমিট করছি...’

বুক পকেট থেকে দামি সানগ্লাস বের করে চোখে তুলল জায়েদ। ওকে বলে দেয়া হয়েছে, কালো লেন্স ব্যবহার করতে

হবে।

এদিকে একেবারেই পাল্টে যাচ্ছে সাগর-সমতল।

মনে হলো, কাছ থেকে বহু দূর পর্যন্ত তৈরি হয়েছে একটা ঢেউ। ঝকঝক ধূসর হয়ে উঠল সাগর। চকচক করছে রূপার মত। সূর্যের রোদ যেন ধাঁধিয়ে দেবে চোখ।

জায়েদ দেখল, চোখ কুঁচকে ফেলেছে বন্দিরা। অন্যদিকে সরিয়ে ফেলল মুখ।

কয়েক মুহূর্ত সাগরে চেয়ে রইল জায়েদ, গর্বে ফুলে গেল বুক।

সাগরের উপরে ভেসে উঠেছে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন খুদে মেশিন। ডানা মেলে আয়নার মত উল্টো মহাশূন্যে ছুঁড়তে শুরু করেছে আলো আর তাপ। মাইক্রোস্কোপে দেখলে মনে হবে, একেকটা খোলসহ ছোট গুবরে পোকা। বলমলে পোকা ছড়িয়ে পড়েছে সাগরের চারপাশে। ডানা খুলবার পর আয়নার মত আলো ছাড়ছে চার গুণ জায়গা নিয়ে।

ছড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার বর্গ-মাইল জুড়ে। আর এসব ন্যানোবটই শেষ করে দেবে ভারত মহাসাগরকে।

আসলে কী ঘটছে, প্রথমে বুঝতে পারল তানিয়া। নিচু স্বরে আসিফকে বলল, ‘পাল্টে যাচ্ছে পরিবেশ, এভাবেই কাজ করে ন্যানোবট।’

‘ঠিকই ধরেছ,’ মাথা দোলাল জায়েদ। ‘এর কারণে ঠাণ্ডা হবে সাগর। এখনই গত বছরের এ সময়ের তুলনায় কমে গেছে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা। আমার হিসেব ঠিক হলে, রাত নামার আগেই কমবে আরও এক ডিগ্রি। আর প্রতিদিন এভাবেই কমবে। কয়েক দিনের ভেতর উষ্ণ সাগরের মাঝে তৈরি হবে বিশাল এক ঠাণ্ডা পানির স্রোত। এদিকে অন্য এলাকার ন্যানোবট করবে উল্টো কাজ। সংগ্রহ করবে তাপ, ছড়িয়ে দেবে সাগরে। তাপমাত্রার

কারণে চালু হবে দু'ধরনের বাতাসের প্রবাহ। তারই একাংশ তৈরি করবে প্রবল ঘূর্ণিঝড়। আর তার ফলাফল: দীর্ঘ দিনের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ।'

'তুমি ভয়ঙ্কর একটা পিশাচ,' বলল আসিফ। 'তুমি যা করছ, তার ফলে কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মরবে!'

'আমি কিছুই করছি না,' বলল জায়েদ, 'যা করার করবে দুর্ভিক্ষ।'

হতবাক হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে আছে তানিয়া।

সাগরের ঝলমলে আয়নার মত ন্যানোবট দেখছে আসিফ আর ম্যানিনি।

উজ্জ্বল সোনালি আলোয় স্নান করছে জায়েদ বিন মনযুর। গর্বিত আর আত্মবিশ্বাসী, ভাল করেই জানে, হাতে পেয়ে গেছে সৃষ্টির অন্যতম ক্ষমতা। কোটি কোটি মানুষের জীবন-মৃত্যু এখন তার হাতে!

'পার পাবে না তুমি,' বলল তানিয়া।

'কে ঠেকাবে আমাকে?' নিষ্ঠুর হাসল জায়েদ।

'বাংলাদেশের সরকার ঠেকাবে, ঠেকাবে অন্য সব দেশের সরকার,' বলল আসিফ। 'বাদ পড়বে না ভারত সরকার, ন্যাটো বা ইউএন। তুমি এশিয়া মহাদেশের অর্ধেক মানুষকে না খাইয়ে রাখবে, তা সহ্য করবে না কেউ। সবাই জেনে গেলেই দলে-বলে খুন হয়ে যাবে তুমি।'

আসিফের দিকে কঠোর চোখে চাইল জায়েদ। 'একটু ভুল হলো তোমার। দুনিয়ার নোংরা রাজনীতির কাছে আমরা সত্যিই নগণ্য। কিন্তু তুমি জানো না, অনেক ক'টা দেশ চাইবে নতুন ক্ষমতা। আর তা দিতে পারি আমি। কাজেই নিজ স্বার্থেই আমাকে নিরাপত্তা দেবে তারা। ভারত উপমহাদেশ, দক্ষিণের দেশ বা মহাচিন পড়বে মস্ত বিপদে, কিন্তু তাতে পশ্চিমাদের কী? আমার

कारणे तैरि हवे नतून सीमांत । मध्यप्राच्या, राशा, आफ्रिका वा पाकिस्तान हवे सबुज । आर तोमादेर देश मरुभूमि । ताते आपत्ति तुलवे ना वडलोक अनेक देश । यारा पानिर जन्ये उपयुक्त टाका देवे, तारा पावे एक बहरेर फसल । तोमादेर किछुई नेई, ताई भिस्कुकेर मत छडिये पडवे दुनिया जुड़े; आर सबाई दूर-दूर ह्या-ह्या करवे ।’

‘तुमि महायुद्धेर बुँकि निछ्,’ बलल तानिया । ‘एर फलाफल थेके निजेओ रक्षा पावे ना ।’

‘युद्ध?’ थ्याक-थ्याक करे हासल जायेद । ‘ना, ता हवे ना । या हवे ता हछे: दुनिया जुड़े पानिर जन्ये मस्त सब निलाम ।’

खुशि खुशि लागछे तार, आगामी दुई-एक दिनेर भेतर पायेर नीचे पिसे फेलवे से तार सबचेये वड शत्रु मिशरेर जेनारेल नासिफ आबिल-बिलके । आर दुनियाओ जेने यावे जायेद बिन मनयुर आसले कत वड शक्तिधर । एरपर बहरेर पर बहर धरे मुनाफा तुलवे से निजेर घरे । महाचिन, भारत उपमहादेश वा दक्षिणेर देश पयस्स दिते चाईवे । तादेर शत्रुरा दिते चाईवे आरओ बेशि । एशियार सब मिठा पानि निलामे तुलवे से ।

‘सुस्थ मस्तिष्केर एकदल लोक ऐसे शेष करवे तोमाके,’ बलल आसिफ ।

‘चेष्टा करवे हयतो,’ बलल जायेद, ‘किञ्च खुँजे पावे ना कोथाओ । चाईलेओ धरंस् करते पारवे ना आमार एई सृष्टि । कोटि कोटि न्यानोबट नष्ट करलेओ रये यावे ट्रिलियन ट्रिलियन एकई जिनिस । सामान्य मात्र समय दिलेई निजेर मत आरओ न्यानोबट तैरि करवे । एखनओ ताई करछे । एजन्येई एठावे न्यानोबटेर प्रोग्रामिं करेछे एई पागला, रवार्तो म्यानिनि ।’

‘तुमि आमार छात्र ना!’ तिक्त सुरे बललेन इटालियान

বিজ্ঞানী, ‘তুমি একটা নরপিশাচ! তোমার মৃত্যুও হবে তেমনি ভয়ঙ্কর!’

‘কোনও দেশ আমার ক্ষমতার জোর কোথায়, তা বুঝতে না পারলে, তার ফলাফল সে দেশের জন্য হবে ভীষণ কষ্টকর,’ বলল বেদুঈন-নেতা। ‘দরকার পড়লে দুনিয়ার সব সাগরে ছড়িয়ে দেব ন্যানোবট। সাত সমুদ্র তেরো নদী জয় করে নেব। কোনও দেশ বিদ্রোহী হলে, পানির উপযুক্ত দাম দিতে না চাইলে, পালে পালে মরবে সে দেশের মানুষ। ধ্বংস করে দেব তাদের সাগরের সব জলজ-প্রাণী। চোখের সামনে দেখবে শুকিয়ে গেছে ফসলের কচি চারা। বন্ধ হবে সব জলবন্দর, খেয়ে ফেলা হবে সব জাহাজ।’

‘সবাই মিলে খুঁজে বের করে শেষ করবে তোমাকে,’ বলল আসিফ। ‘তুমি একটা বিষাক্ত সাপ, আর তোমাকে শেষ করতে চাইলে তোমার ওই পচা মাথাটা কেটে নেয়াই যথেষ্ট।’

‘তাদেরকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব, সাপের আশপাশে না আসাই ভাল,’ বলল জায়েদ। ‘এ ধরনের বিপদের কথা ভেবেই সাত সাগরকে শেষ করার নির্দিষ্ট কোড দিয়েছি ন্যানোবটের পালকে। আমি যদি নির্দেশ দিতে বাধ্য হই, বা মারাও যাই, চারপাশের সবই খেয়ে নেবে ওরা। তৈরি করবে নিজেদের মত হাজারো কোটি ন্যানোবট। শেষ করবে এই পৃথিবীকে। মরুভূমির পঙ্গপাল যা করে, ঠিক তাই করবে। খাবার বলতে কিছুই থাকবে না মানুষের জন্যে।’

পরস্পরকে দেখল আসিফ আর তানিয়া।

ওদের দিকে চেয়ে দুষ্ট হাসি হাসল জায়েদ। বুঝে গেছে, আগেই হেরে গেছে এরা।

চুপ করে রইল দুই বাঙালি বিজ্ঞানী।

হাঁ করে জায়েদকে দেখছেন রবার্তো ম্যানিনি।

আঙুল দিয়ে ভুরু থেকে ঘাম ঝরাল জায়েদ।

ধাতব দ্বীপের আশপাশে অন্তত কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেছে তাপ। এমনই হওয়ার কথা, বইতে শুরু করেছে তপ্ত বাতাস। ওই লু-হাওয়া তৈরি করবে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়।

তেরো

ভারত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট বোট নিয়ে ভাসতে ভাসতে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। আগুন ঢালছে সূর্য। প্যারাসুট দিয়ে তৈরি ছাউনির নীচেও দাবদাহে মরা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে গলা। সমান তিনটে ভাগ করে ক্যান্টিনের পানি খেয়েছে ওরা। সে-ও অনেকক্ষণ আগের কথা। ফুরিয়ে গেছে বোটের পিছনের চেম্বারের বাতাস। এখন পানির নীচে ঝুলে আছে নেতিয়ে পড়া টিউবের মত। ফুটোর কারণে স্টারবোর্ডে কাত হয়েছে বোট। ব্যর্থ হয়েছে বেদুঈন ইউনুসের সব প্রচেষ্টা। চূপসে গেছে সামনের ডানদিকের রাবার সিলিঙার।

বাচ্চাদের ফুটো করা বেডশিট দিয়ে তৈরি ভুতুড়ে পোশাক যেন রানাদের ছাউনির প্যারাসুট, তার মাঝে গোল জানালা কেটে নিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে আছে রানা।

‘কোনও জাহাজ দেখলে, রানা?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা। গত কয়েক ঘণ্টায় বন্ধুত্ব হয়ে গেছে রানার সঙ্গে। ভেবে দেখেছে, সত্যিকারের পুরুষ হলে হওয়া উচিত ওই মাসুদ রানার মতই। এমন একজন, যার ওপর ভরসা করা যায় নির্দিধায়।

শুকিয়ে আছে গলা, কর্কশ শোনালা রানার কণ্ঠ: ‘না, তেমন

কিছুই দেখছি না।’

‘ইঞ্জিন চালু করে সামনে গিয়ে দেখবে?’ বলল জ্যাসিণ্টা।
‘আমরা বোধহয় শিপিং লেনে নেই।’

ঠিকই বলেছে, ভাবল রানা। খুব কম জাহাজই আসে ভারত মহাসাগরের মাঝে। সুয়েয দিয়ে চলতে পারে না যেসব মস্ত বড় জাহাজ, তারা হর্ন অভ আফ্রিকা ঘুরে যায়। ওর ধারণা: ওরা আছে আফ্রিকার খুব কাছেই। সেক্ষেত্রে কাছাকাছি থাকবে উত্তর-দক্ষিণের রেড সি বা গালফের ট্যাঙ্কার রুট।

কিন্তু তা-ও হয়তো এক শ’ নটিকাল মাইল দূরে। ওদিকে যাওয়ার জন্য অবশিষ্ট ফিউয়েল ব্যবহার করা অনুচিত হবে।

‘সত্যিই শিপিং লেনে নেই আমরা,’ স্বীকার করল রানা।

‘কিন্তু এভাবে বসে থাকাও তো যায় না।’

‘ফিউয়েল বলতে মাত্র এক গ্যালন তেল,’ বলল রানা। ‘এখন যদি খরচ করি, পরে বারবার মনে হবে, তেলটুকু থাকলে কোনও উপায় হতো।’

রানার চোখে চেয়ে রইল জ্যাসিণ্টা। বিশাল, অকূল সাগরে ভীষণ আতঙ্ক চেপে বসতে চাইছে ওর বুকে। তির-তির করে কাঁপছে কমলা কোয়ার মত লোভনীয় ঠোঁট। প্রায় ফিসফিস করে বলল, ‘রানা, আমি মরতে চাই না...’

‘আমিও না,’ বলল রানা। ‘আর মরবও না। ভয় পেয়ো না।’ বেদুঈনের দিকে চাইল। ‘ইউনুস, তুমি কী বলো? আমরা বেরিয়ে যাব না এই গাড্ডা থেকে?’

‘নিশ্চয়ই!’ উৎসাহের সঙ্গে বলল বেদুঈন যুবক। ‘আমাদের মরতে হবে কেন! আল্লা আছেন!’ টের পেয়ে গেছে, অদ্ভুত কিছু আছে এই বাঙালি মানুষটার অন্তরে। চোখে মায়া, কথাও খুব নরম। একবারও ধমক মারেনি। ভর দুপুরে ছাউনির ভিতর নিজেদের পাশে শুতে দিয়েছে, পানি দিয়েছে সমান তিন ভাগের

এক ভাগ। ইউনুস বুঝে গেছে, অবস্থা যতই খারাপ হোক, সাগরে তাকে ফেলে দেবে না এই মানুষটা। গত কয়েক ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে ভেবেছে ও। তুলনা করেছে জায়েদ বিন মনযুর আর মাসুদ রানার ভিতর। তার মন বলেছে: বাঙালি যুবক যদি দেবদূত হয়, বেদুঈন-নেতা সাক্ষাৎ ইবলিশ। জায়েদ হলে এক লাথি মেরে ওকে ফেলে দিত সাগরে। ও ডুবে মরলে তার কী? কারণে অকারণে কম মানুষ তো খুন করেনি লোকটা!

‘ইউনুসের কথা তো শুনলে, জ্যাসিন্টা, আমরা মরব না,’ বলল রানা। ‘শান্ত থাকার চেষ্টা করো।’

আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাসিন্টা। আছে বোটের পিছনে। বাতাস বেরিয়ে যাওয়া ঠেকাতে চাইছে।

‘সামনে চলে এসো,’ বলল রানা। ‘পোর্ট সাইডের সিলিঙার বাতাসে ভরা। চাইলেও ডুবতে পারবে না।’

পিছনের রাবারের টিউব ছেড়ে বোটের সামনে চলে এল জ্যাসিন্টা। ওর ওজন সরে যেতেই বোটের পিছনের অংশ সামান্য উপরে উঠল।

ওদের তৈরি তাঁবুর তলা থেকে আবারও চারপাশে চোখ চালাল রানা। সূর্যের অবস্থান থেকে মনে হলো, সময় এখন দুপুর তিনটে। রাতের জন্য অপেক্ষা করছে ও। আকাশে নক্ষত্র জ্বলে উঠলে তখন দিক ঠিক করে নিয়ে রওনা হবে।

দূর দিগন্তে চোখ গেল ওর। কী যেন হয়েছে ওদিকে। পাল্টে যাচ্ছে সাগর। যেন হয়ে উঠছে আয়নার মত। মরুভূমি বা দুপুরের রাস্তায় অমন মরীচিকা দেখা যায়। কয়েকবার চোখ পিটপিট করে আবারও চাইল রানা।

ওদিক থেকে আরও বাড়ছে আলো!

ধাঁধিয়ে দিতে চাইল চোখ।

আলোর এক ঝকমকে চাদর বিছিয়ে পড়ছে সাগরে।

আলোটা সরাসরি সূর্যের নয়, অন্য কিছু মাধ্যমে প্রতিফলন।
কোনও ম্যারিনার বা তৈলচিত্র শিল্পী কখনও দেখেনি ওই তীব্র
সাদা আভা।

পশ্চিমে ওই আলো আরও অনেক বেশি উজ্জ্বল।
তরুণ বিকেলে প্রৌঢ় সূর্যের অনেক নীচে সাগরে জ্বলছে
প্রভা।

একে একে পূব, উত্তর আর দক্ষিণে চোখ বোলল রানা।
'রানা!' ভীত কণ্ঠে ডাকল জ্যাসিন্টা।
চোখ ফিরিয়ে ছাউনির ভিতর চাইল রানা।
'তুমি ঝিকমিক করছ!'
নিজের দিকে চাইল রানা। তারপর জ্যাসিন্টাকে দেখল।
একই অবস্থা ওদের তিনজনের।

ঝলমল করছে দেহ, যেন শরীরে জ্বলছে নক্ষত্রের কণা।
ইউনুসের চেয়ে বেশি মেখে আছে জ্যাসিন্টা। 'জিনিসটা কী?'
অবাক স্বরে বলল ও।

নিজের হাতের তালুর দিকে চাইল রানা। তর্জনী আর বুড়ো
আঙুল এক করে ঘষল। উঠে আসছে পাউডারের মত চকচকে
কণা। যেন আলোর বিকিরণ করছে আয়না। এতই ছোট, চোখে
দেখা যাচ্ছে না কণা। ডলেও অনুভব করা গেল না কিছু।

'জায়েদ বিন মনযুরের ন্যানোবট,' বলল রানা। জ্যাসিন্টা
আর ইউনুসকে ব্যাখ্যা করে জানাল, 'কী ঘটছে। আলো আর
তাপ বেরোচ্ছে ওসব থেকে। ক্যাটাম্যারানে কী হয়েছে, তা-ও
বলল।

'ক্ষতিকর নয়?' জানতে চাইল জ্যাসিন্টা।

'মনে হয় না,' নির্দিধায় মিথ্যা বলল রানা। চেপে গেল, এসব
কণা অনায়াসেই খেয়ে নিতে পারে যে-কাউকে। ওদের কপাল
ভাল, খাওয়ার মোড়ে রাখা হয়নি ন্যানোবট। 'তবে একবার

গোসল করার সুযোগ পেলে তার বিনিময়ে এই বোট দিয়ে দিতে আপত্তি করতাম না।’

হাসতে চাইল জ্যাসিন্টা, কিন্তু ভয়ে কাঁপছে বুক।

ওরা তিনজন জানে না, সাগরে ন্যানোবটের পালের শেষ কিনারায় আছে। যে উজ্জ্বল আলো দেখছে, তা অপেক্ষাকৃত মৃদু। দি আইল্যাণ্ডের কন্ট্রোল রুমের কাছে ব্যালকনিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে আসিফ, তানিয়া আর ম্যানিনির।

চুপ করে সাগরের দিকে চেয়ে আছে রানা। টের পেল, হালকা হাওয়া টান দিচ্ছে পোশাকের আস্তিনে। নড়ছে প্যারাসুটের ছাউনি। বো-র দিকে চেয়ে দেখল, ভেসে উঠে আবারও নেমে আসছে প্যারাসুট কাপড়।

বাড়ছে হাওয়ার বেগ। ফুলে উঠতে চাইছে প্যারাসুট। শক্ত করে দড়িদড়া বেঁধে রাখল রানা। ঘুরে চাইল জ্যাসিন্টার দিকে। ‘এসো, বোটের দু’পাশের হ্যাণ্ডলে প্যারাসুট বাঁধি।’

প্রশ্ন ছাড়াই রানার পাশে কাজে নেমে পড়ল জ্যাসিন্টা আর ইউনুস। পিছন থেকে আসছে পূব-উত্তরের হাওয়া, চালু করা হেয়ার ড্রায়ারের মতই তপ্ত।

ওদের বোটে নানান দিকে আছে ছয়টি হ্যাণ্ডেল। এ ছাড়া সামনে রয়েছে দুটো ক্লিট হ্যাণ্ডেল। মাত্র কয়েক মিনিটে ওরা আট হ্যাণ্ডেল ব্যবহার করে বেঁধে ফেলল দুটো প্যারাসুট। ফুলে উঠেছে বাতাসের তোড়ে। কাজ করছে পালের, টেনে নিয়ে যেতে শুরু করেছে বোট পশ্চিমে। হাওয়া যত বাড়ছে, গতিও তুলছে বোট। আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালু থাকলেও এর বেশি বেগ পেত না।

রানার জানা নেই, কোথা থেকে আসছে এই হাওয়া। আর জানবার বিশেষ গরজও নেই। ওরা যে বসে নেই সাগরে, এ-ই যথেষ্ট। কখনও কখনও দমকা হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে চলল ওদের বোট।

কিছুক্ষণ পর হাওয়ার বেগ বেড়ে যেতে বলল রানা, ‘সাবধানে বসো তোমরা। সন্দের আগেই বোধহয় ঝড় উঠবে।’

চোদ্দ

ভাসমান ধাতব দ্বীপ দি আইল্যান্ডের নীচের অংশে বিলাসবহুল জেলখানার মস্ত এক সেলে আবারও বন্দি হয়েছে নুমার সায়েন্টিস্ট আসিফ রেজা, তার স্ত্রী তানিয়া রেজা আর ইটালিয়ান বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনি। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটু নীচে হামলে পড়ছে সাগরের খেপা ঢেউ। পুরো বায়ান্ন মিনিট তীব্র আলো ও আগুনের মত তাপের ভিতর ওদের তিনজনকে রেখেছে জায়েদ বিন মনযুর। www.boighar.com

আসিফের মনে হয়েছে, তেলহীন কড়াইয়ে মাছের মত করে ভাজা হয়েছে ওদের। প্রখর সাদা আলোয় ঝলসে গেছে চোখ। বাধ্য হয়ে দেখেছে, সাগরের উপর ভাসছিল আয়নার মত খুদে কোটি কোটি ন্যানোবট। অনেকটা ঘন কুয়াশার মত, বা বাষ্পের মত, কিন্তু আলাদাভাবে ভেসে উঠেছে প্রতিটা কণা।

আগে এক ফোঁটা বাতাস ছিল না, তারপর শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে হাওয়া। তখন সাগরে তৈরি হয়েছিল স্রোত। মনে হয়েছে, জীবন ফিরে পেল সাগর। অপেক্ষা করছে যেন ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য। সাগরের স্রোত আর ওই আগুনের মত জ্বলজ্বলে শিখা একটু দেখবার পর, বাধ্য হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়েছে আসিফ। বুঝে গেছে, বেশিক্ষণ ওদিকে তাকালে হারাতে হবে

দৃষ্টিশক্তি। চোখ বুজে থেকেছে তখন থেকে। ওর কথা শুনে একই কাজ করেছে তানিয়া আর ম্যানিনি। দেখবার দরকার নেই কোটি কোটি জ্বলজ্বলে হীরার কণা।

মনে হয়েছে, চিরকাল ধরে চিতার আগুনে ঝলসানো হয়েছে ওদের। তারপর নির্দেশ দেয়ায় সরিয়ে নেয়া হলো ওদেরকে। চোখের সামনে দেখল, সাগরের নীচে হারিয়ে গেল ন্যানোবটের বিশাল বাহিনী। তখন মনে হয়েছে, একেবারেই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সাগর।

‘আমার মনে হয়েছিল সাহারার মাঝে শুইয়ে রেখেছে,’ বলল আসিফ। বাহুর দিকে চাইল। তামাটে হয়ে গেছে ত্বক।

মস্ত জানালার সামনে পায়চারি করছেন ম্যানিনি।

আসিফের পাশে বসে ওর ফাটা ঠোঁটে ফাস্ট-এইড বাম লাগাতে শুরু করেছে তানিয়া।

‘অন্তত জানা গেল, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তাপমাত্রা,’ বললেন ম্যানিনি।

‘প্রিয়, কথা বোলো না, মুখে ঢুকে যাবে বাম,’ তৃতীয়বারের মত বলল তানিয়া। অ্যান্টিবায়াকটেরিয়াল অয়েন্টমেন্ট স্বামীর ঠোঁটে লাগাতে চাইলেই বারবার কথা বলে উঠছে সে।

‘আপনার এই জ্ঞান কারও কাজে আসবে না,’ ইটালিয়ান বিজ্ঞানীকে বলল আসিফ।

‘আসিফ!’

‘মুখ তো জিরাফের মত বাড়িয়ে দিচ্ছি, আর কত!’

‘কিন্তু ঠোঁট নড়লে চলবে কেন!’

বিরক্ত আসিফ ডেন্টিস্টের খপ্পরে পড়া রোগীর মত হাঁ করল, রোদে শুয়ে অমন করে মস্ত মুখ মেলে কুমির।

‘জলহস্তির মত এত বড় হাঁ করছ কেন?’ বাম মাখিয়ে দিতে শুরু করেছে তানিয়া। ‘ঠোঁট স্থির রাখো!’

‘দুই কান পর্যন্ত নিয়ে গেছি দুই ঠোঁট, আমি আর পারব না,’
অভিমান নিয়ে বলল আসিফ।

পায়চারি থামিয়ে ওর কাছে এসে থমকে গেলেন ম্যানিনি।
‘অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে না আরব লোকটা?’

ধৈর্য হারিয়ে বলল আসিফ, ‘জানেন, এবার কী হবে?’

অয়েন্টমেন্ট হাতে বিরক্ত হয়ে পিছিয়ে বসল তানিয়া। ‘ধুৎ!’

‘ব্যাটা নর্থ আটলান্টিকের শীতল পানির মত করে তাপ
কমিয়ে দিচ্ছে ট্রপিকাল ভারত মহাসাগরের। তাপমাত্রার
গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করে তৈরি করবে ভয়ঙ্কর সব ঘূর্ণিঝড়।
পরিবর্তন আনছে বাতাস আর সাগরের নীচে।’

মাথা দোলালেন রবার্তো ম্যানিনি। ‘আর একবার এভাবে
উল্টো বাতাসে তাপ ঢালতে শুরু করলে, ওই তাপ শুধে নেবে
সাগর। শুরু হবে রিভার্সিং ইকুয়েশন।’

‘জায়েদ বিন মনযুর এভাবে চালাতে থাকলে ধপাধপ নামবে
আকাশ-বাতাসের তাপমাত্রা,’ সায় দিল আসিফ। ‘এটা হবে ওর
পছন্দ মত এলাকায়। তখনও সাগরের অন্য অংশ উত্তপ্ত। উষ্ণ
জলবায়ুর সঙ্গে শীতল জলবায়ুর সংঘর্ষ হলে কী হয়, প্রফেসর,
কখনও দেখেছেন?’

‘শুরু হয় মারাত্মক ঝড়,’ মাথা দোলালেন ম্যানিনি।

‘কয়েক বছর আগে ছিলাম ওকলাহোমায়, পর পর তিন দিন
গরম পরিবেশের পর সাগর থেকে এল শীতল হাওয়া,’ বলল
আসিফ। ‘আর পরের তিন দিনে আঘাত হানল অন্তত এক শ’টা
টর্নেডো। এবার বোধহয় আমাদের চারপাশে তৈরি হবে মস্ত
ঘূর্ণিঝড়। আর তাতে মরবে লাখে লাখে মানুষ।’

আসিফের ফাটা ঠোঁটের বিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে তানিয়া।
শুকনো কণ্ঠে বলল, ‘এটা কিন্তু মহাসাগরের ডেড যোন। এখানে
তৈরি হয় না ঝড়, সেসব হয় উত্তর বা পূবে। সব যায় ভারতের

দিকে। আর এ কারণেই শুরু হয় মৌসুমী বৃষ্টিপাত।’

কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলল আসিফ, ‘আমরা আছি ইকুয়েটর ঘেঁষে। এখানে ঝড় তৈরি হলে ওটা যাবে পশ্চিমে। বৃষ্টি হবে আরবের দেশ, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া বা মিশরে।’

‘তাই শুরু হয়েছে,’ বললেন ম্যানিনি। ‘কোথায় যেন পড়লাম, সুদানের উঁচু এলাকা আর দক্ষিণ মিশরে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। ওই আর্টিকেলে বলা হয়েছে, ভরে উঠেছে নাসের লেক। গত তিরিশ বছরে এমন হয়নি।’

একই রিপোর্ট দেখেছে আসিফও। ‘আর এটা তো মাত্র শুরু।’

আবারও পায়চারি শুরু করেছেন রবার্তো ম্যানিনি। কাঁপা ডান হাতে ডলছেন চিবুক। ‘বাতাস একবার ঝড় হয়ে উঠলে?’

জানালায় দিকে চাইল আসিফ। চেয়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। মনে পড়ছে, ঝড়ের বিষয়ে ক্লাসে শোনা লেকচার। ‘গালফ-এ উষ্ণ এলাকায় শুরু হবে একের পর এক হারিকেন। জায়েদের ঝড় চুরি করবে তাপ আর জলীয় বাষ্প, অথচ সেসব যাওয়ার কথা ভারত, বাংলাদেশ আর আশপাশের দেশে।’

‘ভরা বর্ষা মরসুমে এসব দেশ খটখটে শুকনো থাকবে,’ বলল তানিয়া। ‘হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ যা চেয়েছে, ঠিক তাই হাতে পেয়েছে বন্ধ-উন্মাদ জায়েদ বিন মনযুর! হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে পরিবেশকে। পাল্টে দিচ্ছে আবহাওয়ার স্বাভাবিক প্যাটার্ন।’

বেকায়দাভাবে চেয়ারে বসে পড়লেন ম্যানিনি। মনে হলো পড়ে যাবেন মাথা ঘুরে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। বিড়বিড় করে বললেন, ‘পাগলটা আমার ডিযাইন ব্যবহার করেছে...

বোকার মত তানিয়া-আসিফের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। মুখ থেকে হারিয়ে গেছে মস্ত বিলিওনেয়ারের নিশ্চিন্ত ভাব। এখন গর্বিত ডিযাইনার নন, প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ারও নন, হয়ে উঠেছেন

তাড়া খাওয়া আতঙ্কিত এক লোক। এমন একজন, যিনি ভেঙে পড়েছেন। ‘শত কোটি মানুষ...’ বিড়বিড় করলেন, ‘ঠিক সময়ে বৃষ্টি পাবে না... বুনতে পারবে না ফসল! ...মানেই দুর্ভিক্ষ! ...ঘৃণিত হিটলার না, এর ফলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় খুনি বলা হবে আমাদের!’

ভীষণ কড়া কথা বলবে ভেবেও চুপ হয়ে গেল তানিয়া। বুঝে গেছে, এবার এশিয়ার কোম্পি কোটি মানুষের ভাগ্যে যা ঘটবে, তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা ওর নেই।

‘এখনই হাল ছাড়বেন না,’ ম্যানিনিিকে সাহস দিতে চাইল আসিফ। ‘আলফ্রেড নোবেল আবিষ্কার করেছেন ডিনামাইট, খুলেছিলেন ওয়েপস আর আর্মামেন্টের কোম্পানি, কিন্তু সেজন্য তাঁকে অসম্মান করে না কেউ, অন্য কারণে প্রশংসা করে। এখনও সময় আছে, আপনি হয়তো আবারও সামলে দিতে পারবেন সব।’

‘কিন্তু আমি যে বড় একা,’ প্রায় কেঁদে ফেললেন রবার্তো। ‘আপনাদের বন্ধুরাও তো চলে গেছে। আমাদের জানা নেই তাদের কী হয়েছে। কেউ জানে না এখানে কী ভয়ঙ্কর দুর্যোগ তৈরি করেছে বন্ধ-পাগল আরবটা!’

তানিয়ার দিকে চাইল আসিফ। পরস্পরের চোখে চেয়ে ভরসা পেতে চাইল। ‘সব ঠিক হয়ে যাবে,’ তানিয়ার বাহু স্পর্শ করল আসিফ। ম্যানিনিিকে বলল, ‘কোনও না কোনও পথ পেয়ে যাব আমরা। আগে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।’

স্বামীর চোখে আশার দীপ দেখে মৃদু হাসল তানিয়া। ভাবল: না, সব শেষ হয়ে যায়নি এখনও। যতক্ষণ বাঁচব, পাশেই থাকব আমরা।

‘কিন্তু কীভাবে বেরোব, এ নিয়ে কিছু ভেবেছেন?’ জানতে চাইলেন রবার্তো ম্যানিনি।

‘একটা কথা ভারছি,’ বলল আসিফ। ‘আমার প্ল্যান আপনার

পছন্দ হবে কি না জানি না ।’

‘পছন্দ-অপছন্দের উপায় নেই, বলে ফেলুন,’ চেয়ারে ঝুঁকে বসলেন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ।

পনেরো

রানাদের বিস্মিত করে আচমকা শুরু হয়েছে তুমুল হাওয়া, ওটা চলল দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে । কখনও মনে হলো, সাগর থেকে বোট তুলে নিয়ে বহু দূরে কোথাও উড়িয়ে ফেলবে ওদের উন্মত্ত হাওয়া । একঘণ্টা পেরোবার আগেই ওদের গা থেকে খসে পড়েছে সব ন্যানোবটের কণা । সাগরে তলিয়ে গেছে তাদের উজ্জ্বল প্রভা ।

‘ওগুলো কী চলে গেছে মনে হয়?’ রানার কাছে জানতে চাইল জ্যাসিন্টা ।

‘মনে হয় না,’ মিথ্যা বলল না রানা । ‘আছে সাগরেই ।’

পরের একঘণ্টায় হ্রাস পেল হাওয়ার তোড়, একেবারেই থেমে গেল সন্ধ্যার একঘণ্টা আগে । আরও নেতিয়ে গেল বোটের স্টারবোর্ড । বাধ্য হয়ে পোর্টের বোলস্টার ধরে টিকে থাকতে হলো ওদেরকে, নইলে উল্টে যাবে বোট । ছোট সব ঢেউ এসে ভাসিয়ে দিল ডেক ।

কাজে আসবে ভেবে প্যারাসুট গুছিয়ে নিল রানা । কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় ইউনুসের গলা ফাটা চিৎকার শুনে অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে ।

‘মাটি! মাটি!’ পাগলের মত চিৎকার জুড়েছে বেদুঈন। ‘মাটি! মাটি দেখা যায়!’

মুখ তুলে দিগন্তে চাইল রানা। সত্যি, দূরে সবুজের আভাস। সন্ধ্যার আলোয় ওদিকে পড়েছে যেন মেঘের অদ্ভুত প্রতিবিম্ব।

বিনকিউলার বের করে কাঁচ পরিষ্কার করল রানা, চোখে তুলল।

‘প্লিয, ঈশ্বর, সত্যিই যেন ওটা দ্বীপ হয়!’ বিড়বিড় করল জ্যাসিন্টা। ‘প্লিয!’

গাছের সবুজ আচ্ছাদন পরিষ্কার দেখল রানা। ‘জমি, কোনও সন্দেহ নেই!’ বিনকিউলার রেখে বোটের পিছনে চলে গেল ও, ফিউয়েল লাইনের সুইচ টিপে রিয়ার্ভে আনল, তারপর চালু করল আউটবোর্ড মোটর। ফট-ফট আওয়াজ ছাড়ল ইঞ্জিন, থ্রটল ঘুরিয়ে নিয়ে সবুজের দিকে তাক করল বোটের নাক।

প্রপেলার চালু হতেই কাঁকড়ার মত বেকায়দা ভঙ্গিতে ছুট লাগাল অর্ধ-নিমজ্জিত বোট। সাগরের জল অস্বাভাবিক শীতল, মাত্র কয়েক সেকেন্ডে হাড় জমে যাওয়ার জোগাড় হলো ওদের।

বিশ মিনিট পর পরিষ্কার দেখা গেল পাহাড়ের চূড়া। উচ্চতা হবে পঞ্চাশ ফুট। ওখানে জন্মেছে সবুজ ঘাস আর ছোট ঝোপঝাড়। পাহাড়ের দু’পাশে সমতল জমি। সাগরের দিকে রিফ। জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে প্রবাল প্রাচীর।

রানা আন্দাজ করল, সামনে ওটা দ্বীপ। চারপাশে রিফ। ‘ভলক্যানিক অ্যাটল। রিফের মাঝ দিয়ে ঢুকতে হবে। দরকার হলে সাঁতার কাটব।’

ইউনুসকে একবার দেখে নিল রানা, তারপর চাইল জ্যাসিন্টার দিকে। ‘তোমার কাছে পিস্তলটা রয়ে গেছে?’

মাথা দোলাল জ্যাসিন্টা। ‘হ্যাঁ... কিন্তু...’

‘ওটা দাঁও।’

রানার হাতে পিস্তল দিয়ে দিল জ্যাসিণ্টা। ওরা দু'জন ভাল করেই জানে, ভিতরে কোনও গুলি নেই।

‘ইউনুস, তোমার দড়ি খুলে দেবে জ্যাসিণ্টা,’ বলল রানা, ‘সাবধান! ঝামেলা করলে ঝাঁক ঝাঁক গুলি খেয়ে...’

‘তওবা-তওবা,’ মাথা নাড়ল বেদুঈন। ‘বেঈমানী করব না, আপনি আমাকে আপনার দলের লোক বলেই ভাবতে পারেন।’

‘জায়েদ বিন মনযুর জানলে কিন্তু বারোটা বাজিয়ে দেবে তোমার,’ সতর্ক করবার সুরে বলল রানা।

‘জানবে না, আর জানলে হরিণের মত ছিটকে পালিয়ে যাব,’ বলল গম্ভীর বেদুঈন। ‘ওই লোক মরুভূমির কুয়ায় ফেলে খুন করেছে আমার বড় ভাইকে। ভয়ে পালাতে পারিনি আগে। আল্লা মাফ করুন, আমি ওই জানোয়ার জায়েদের সঙ্গে নেই।’

জ্যাসিণ্টার উদ্দেশে আস্তে করে মাথা দোলল রানা।

ইউনুসের ক্যারাবিনার থেকে ভারী নোঙর খুলল জ্যাসিণ্টা, বোটের পাশ থেকে ফেলে দিল ওটা সাগরে। খুলে দিল যুবকের গোড়ালির দড়ি।

বেদুঈন অকস্মাৎ হামলা করতে পারে, সেজন্য অপেক্ষা করছে রানা, সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কিন্তু পা টিপতে শুরু করেছে সে, ঠোঁটে স্বস্তির হাসি।

কাছে চলে এসেছে দ্বীপের এদিকের রিফ। একের পর এক ঢেউ হামলে পড়ছে ধারালো প্রাচীরে। রানার মনে হলো, মস্ত কোনও বিপদ হবে না। যদিও খুব বিক্ষুব্ধ ওখানে সাগর। দেয়ালের মাঝের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঢুকতে হবে বোট নিয়ে।

‘শান্ত জায়গা খুঁজলে ভাল হতো না?’ বলল জ্যাসিণ্টা।

‘ট্যাঙ্ক প্রায় খালি,’ জবাবে বলল রানা।

রিফের মাঝের প্রথম ফাঁকটা বেছে নিল রানা। বার্জের মত

সামনে নিচু ঢেউ তৈরি করে চলেছে ক্ষতিগ্রস্ত, প্রায়-নিমজ্জিত বোট। চারপাশের কালচে নীল সাগরের পানি হয়ে উঠেছে হালকা নীল। রিফে প্রবল বাধা পেয়ে খেপে উঠছে সাগর। বারবার ফিরে যেতে হচ্ছে ঢেউগুলোকে।

দুই ফুটি এক ঢেউ তুলে নিল রানাদের, পরক্ষণে পাশ থেকে এল অন্য ঢেউ। পরের সেকেন্ডে পড়ল ওরা ঢেউয়ের খোঁড়লে। নিজের বুকে বোট টেনে নিতে চাইছে সাগর। নীচে কীসের সঙ্গে যেন শিরদাঁড়া লাগল বোটের। মড়াৎ করে ভেঙে গেল প্রপেলার।

পিছনের দুই ঢেউ মিশে যেতেই রানাদের ছিটকে নিয়ে গেল বামদিকে। প্রবালে ঘষা খেল বোট। তখনই ওদের উপর নামল তৃতীয় ঢেউ। মোটরটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে একই সঙ্গে হাল ও ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে রানা। প্রাচীরের ওদিক থেকে ফিরে আসা ঢেউ উল্টো ঠেলছে সাগরের দিকে। পরক্ষণে নতুন ঢেউ জোরে ঠেলছে দ্বীপের উদ্দেশে। বোটের বামপাশ আছড়ে পড়ল প্রবালের প্রাচীরে, বিচ্ছিরি ফড়াৎ আওয়াজে ছিঁড়ে গেল বাতাস ভরা দুই চেম্বার।

‘পাথরে ঘষা খেয়েছে বোট!’ চিৎকার করে বলল জ্যাসিণ্টা।

‘টিকে থাকো!’ পাল্টা চেষ্টা চালানো, নতুন করে খুলে দিল থ্রটল। দশ সেকেন্ডে চলেই খাবি খেল মোটর। সামান্য পিছিয়ে এল রানা, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। তেলের অভাবে হেঁচকি তুলল মোটর। আর তখনই পাশ থেকে এল আরেকটা ঢেউ।

‘ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ো!’ নির্দেশ দিল রানা।

ধড়মড় করে বোটের পাশ থেকে নেমে গেল ইউনুস। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সাগরে ঝাঁপিয়ে নামল জ্যাসিণ্টা।

ডুবন্ত বোটে চেপে বসল বড় ঢেউ। ওটার সঙ্গে সামনে ঝাঁপ দিল রানা। অলিম্পিকের সেরা সাঁতারুদের মত হাত-পা ছুঁড়ছে।

কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টা দানাপানি নেই পেটে, তার আগের দিনও বিশ্রাম হয়নি— সাগরের বিরুদ্ধে লড়াইতে গিয়ে হারতে লাগল রানা। ক্লান্তিতে মনে হলো ঘুমিয়ে পড়বে।

হড়-হড় করে সাগরে ফিরছে তল-স্রোত, টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ওকেও। পরের ঢেউ এসে ঠেলল দ্বীপের দিকে। প্রবালের উপর দিয়ে এগোতে চাইল রানা। পায়ের নীচে শক্ত চুনা পাথরের প্রাচীর পেয়ে সামনে বাড়ল আছড়ে-পাছড়ে। ভারী বুটের কারণে সাঁতার কাটা কঠিন, কিন্তু ওগুলোর জন্য এগোতে পারছে রিফে লাথি মেরে।

আবারও তল-স্রোত আসতেই প্রবালের প্রাচীরে বুট ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চারপাশে প্রচুর ফেনা অন্ধ করে দিল ওকে। মাথার উপর দিয়ে গেল ঢেউ। সামনে থেকে নরম কী যেন এসে পড়ল ওর বুকে।

খপ্প করে ধরল রানা।

জ্যাসিণ্টা।

মেয়েটাকে শক্ত হাতে ধরে অপেক্ষা করল রানা, পরের ঢেউ এলেই রওনা হয়ে গেল ওকে নিয়ে দ্বীপ লক্ষ্য করে। কয়েক সেকেন্ড পর পৌঁছে গেল রিফের ভিতর শান্ত সাগরে।

নিজেকে ছুটিয়ে নিল জ্যাসিণ্টা, রানার পাশে সাঁতার কেটে চলল।

পায়ের নীচে বালি ঠেকতেই হেঁটে উঠে এল রানা দ্বীপে। এক হাতে এখনও ধরে রেখেছে জ্যাসিণ্টার লাইফ জ্যাকেটের ঘাড়। সাদা বালির সৈকতে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল রানা-জ্যাসিণ্টা, পায়ের কাছে এসে মাথা কুটে ফিরছে ঢেউ।

হাঁপিয়ে চলেছে রানা, কয়েক সেকেন্ড পর জানতে চাইল, 'তোমার কী অবস্থা?'

আস্তে করে মাথা দোলাল মেয়েটা। 'ভাল।'

উঠে বসে চারপাশ দেখল রানা। 'ইউনুস কোথায় দেখেছ?'
আশপাশে কেউ নেই। কারও সাড়াও নেই।

'ইউনুস!' গলা ছাড়ল রানা।

'ওই যে!' আঙুল তাক করল জ্যাসিন্টা।

উপুড় হয়ে সৈকতের কাছে পড়ে আছে বেদুঈন যুবক। ছোট
সব চেউ ঠেলছে ওকে সৈকতে তুলতে, আবার ফিরবার সময়
সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছে সাগরে।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে যুবকের পাশে চলে গেল রানা,
টেনে তুলল সৈকতে।

বেদম কাশতে শুরু করেছে ইউনুস। মুখ থেকে গলগল করে
বেরোল লবণ পানি।

বাঁচবে, বুঝে গেল রানা। কিছু বলবার আগেই পিছন থেকে
গায়ে পড়ল কালো দীর্ঘ ছায়া। ওটা সৈকতে দাঁড়ানো রাইফেল
হাতে প্রকাণ্ডেহী কোনও লোকের!

ঘুরে চাইল রানা। সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ
কয়েকজন। পরনে পুরনো ইউনিফর্ম, মাথায় হেলমেট, হাতে
বোল্ট অ্যাকশন ভারী রাইফেল।

তারা এগিয়ে আসতেই ভালভাবে দেখতে পেল রানা। তাদের
ত্বক কালচে, অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবোরিজিনদের মত। চেহারা অবশ্য
পলিনেশিয়ান। রাইফেল পুরনো এম১ কারবাইন। ম্যাগাযিন পাঁচ
বুলেটের। ইউনিফর্ম উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের ইউ.এস.
মেরিনদের। সৈকতের প্রান্তে গাছের সারির কাছে দাঁড়িয়ে আছে
তাদের আরও অনেকে।

রানা এত ক্লান্ত ও বিস্মিত, চুপ করে চেয়ে রইল।

লোকগুলোর মাঝ থেকে একজন এগিয়ে এল। অলস ভঙ্গিতে
ধরে রেখেছে রাইফেল। চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর।

'স্বাগতম উইলি দ্বীপে,' বিদঘুটে উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল,

‘আমার নাম প্রেসিডেন্ট ডুডু ক্যুভেল্ট । তোমাদেরকে গ্রেপ্তার করছি আমি ।’

ষোলো

বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের মনে হলো, এসে পৌঁছেছে এই বন্দরের অত্যন্ত ব্যস্ত কোনও ডকে, অথবা দুনিয়া-সেরা অদক্ষ লোক এ জাহাজের ক্যাপ্টেন । পুরো একঘণ্টা পর সত্যি খুলে গেল বে ডোর । বার দশেক সামনে পিছনে গেল জাহাজ, তারপর ধুপ্ করে ঠেকল পিয়ারে ।

ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সোহেল । জাহাজ ভিড়ে যাওয়ার একটু পর য়ার য়ার ট্রাকে এসে উঠল ড্রাইভার ও তার হেল্লার । চালু হলো ভারী ট্রাকের ইঞ্জিন । পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট, যদিও খুলে দেয়া হয়েছে জাহাজের কার্গো ডোর । সোহেলের মনে হলো, যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে ডিজেলের ফিউমে । করোটির ভিতর শুরু হয়েছে হাতুড়ির বাড়ির মত ব্যথা । শালারা বাঁচতে দেবে না, বিড়বিড় করল । www.boighar.co

আরও কিছুক্ষণ পর নড়ল ট্রাক । এক এক করে বেরোল কার্গো হোল্ড থেকে পিয়ারে । তারপুলিন তুলে উঁকি দিল না সোহেল । বন্দর পেরিয়ে গেলে দেখবে চারপাশ । অবাক হয়ে ভাবল, ফেরি ত্যাগ করে হঠাৎই তাড়াহুড়ো করে রওনা হয়েছে ট্রাক বহর ।

হলদে ড্রাম এড়িয়ে ট্রাকের পিছনে চলে এল সোহেল । হোল্ডে

প্রথম ট্রাক ছিল ওরটা। বেরিয়ে এসেছে সবার শেষে। এখন চলেছে কনভয়ের পিছনে। কাজেই বিপদ ছাড়াই তারপুলিন তুলে দেখতে পারবে।

তারপুলিন দুই ইঞ্চি উপরে তুলে উঁকি দিল সোহেল। দেখতে পেল অত্যাচারিত, ধূসর খোয়ার রাস্তা। ইয়েমেনে এত গতি ছিল না ট্রাকের কনভয়ের, এখন ছুটছে ঝড়ের বেগে।

জাহাজে বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছে সোহেল। নতুন করে নামতে শুরু করেছে রাত। চারপাশে যত দূর দেখা গেল, শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি। ওর মনে হলো, আবারও ফিরছে ইয়েমেনে।

‘গতকাল না মরুভূমি ফেলে এলাম!’ বিড়বিড় করল সোহেল।

না, তফাৎ হচ্ছে মরুভূমির এই খোয়া বিছানো পথ। তা ছাড়া, কখনও দেখা যাচ্ছে ধুলোমাখা গাছ। দেখা গেল, পথ নির্দেশক সাইনবোর্ডও। ইয়েমেনের মরুভূমিতে এই জিনিস ছিল না। ওর দিকের সাইনবোর্ড পড়তে চাইল সোহেল, কিন্তু লেখা সবই বিপরীত দিকে। ওর গাড়ির ড্রাইভার হেডলাইটের আলোয় পড়তে পারবে। কিন্তু ট্রাকের অস্পষ্ট লাল টেইল-লাইটে, নিজে ও কিছুই পড়তে পারল না।

দু’একটা আরবি আর ইংরেজি অক্ষর বুঝল সোহেল। টের পেয়ে গেল, গ্রাম বা শহর থেকে খুব বেশি দূরে নেই ওরা। এটাও কম কথা নয়, দু’দিনের বেশি ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন।

আরও সাইনবোর্ডের জন্য অপেক্ষা করল। রাত বাড়তে, চারপাশ যেন ঘিরে ফেলল ঘোর কালো চাদর। নতুন করে কিছুই দেখা গেল না। পাল্টে গেল পরিবেশের গন্ধ। একই সঙ্গে মিশে আছে ধুলো আর পানি। বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়েছে মরুভূমি। একবার মুখ তুলে দেখল, কালো আকাশে একটা নক্ষত্রও নেই।

কয়েক সেকেণ্ড পর নামল তুমুল বৃষ্টি। দূর থেকে এল বজ্রপাতের আওয়াজ। কেউ খুলে দিয়েছে আকাশের ঝর্না-কল,

ভিজতে ভিজতে আঁধারে ছুটে চলেছে ট্রাক বহর। বৃষ্টির তোড় আরও বাড়ল। ভেজা ও শীতল হয়ে উঠল বাতাস। সোহেল বুঝে গেল, এক পশলা বাদল নয়, মাইলের পর মাইল জুড়ে ঝরছে ঝমঝম বৃষ্টি। কিছুক্ষণের ভিতর তারপুলিন থেকে নেমে ট্রাকের মেঝেতে গড়াতে লাগল পানির স্রোত।

‘মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত,’ আনমনে বলল সোহেল, ‘এটা ভাল খবর, না খারাপ?’

বাদলা রাতে আরও বেশ কিছু সাইনবোর্ড পেরিয়ে গেল। কপাল ভাল, এমন সময় উল্টো দিক থেকে এল গাড়ি। বৃষ্টি ভেদ করে ওটার হাই-বিম পড়ল দূরের সাইনবোর্ডে। ধুলোর অত্যাচারে বিবর্ণ নীল প্ল্যাকার্ডের অক্ষরগুলো এবার পড়তে পারল সোহেল।

‘মার্সা আলম,’ বিড়বিড় করল, ‘পঞ্চাশ কিলোমিটার।’

নামটা পরিচিত মনে হলো। মিশরের রেড সি বন্দরের নাম মার্সা আলম। ওটা আছে পিছনে। পুরনো মালবাহী জাহাজ ওই বন্দরেই নামিয়ে দিয়েছে ট্রাক বহর। তার মানে, কায়রো থেকে সুদানের সীমান্তের চার ভাগের তিন ভাগ চলে এসেছে। ঘণ্টা দুয়েক পর পৌঁছবে লুস্কর-এ।

‘জায়েদের ন্যানোবট মিশরে,’ বিড়বিড় করল সোহেল, বুঝে গেছে জরুরি একটা বিষয়। ‘এরা চলেছে আসওয়ান ড্যাম ধসিয়ে দিতে!’

বহুক্ষণ হলো কুচকুচে কালো আকাশ থেকে ঝমঝম করে পড়ছে বৃষ্টি, তার ভিতর গর্জন ছাড়তে ছাড়তে মার্সা আলম পিছনে ফেলে পশ্চিমের হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে জায়েদ বিন মনযুরের পাঠানো ট্রাকের কনভয়। জলীয় বাতাসে শীতল হয়ে উঠেছে মরুভূমি, মাঝে মাঝে বইছে দমকা হাওয়া; তুমুল-গতি ট্রাকের পিছনে বসে ঠক-ঠক করে কাঁপছে বেচারী সোহেল।

ছ্যা-ছ্যা করেছিল ইয়েমেনের পরিবেশকে, তারপর জাহাজের কার্গো হোল্ড ছেড়ে মিশরে এসে হয়ে উঠেছিল খুশি। কিন্তু এখন রাত গভীর হতেই বৃষ্টির ভিতর কাঁপতে কাঁপতে মনে হচ্ছে, এবার যে-কোনও সময়ে ধরবে হাইপোথারমিয়া। ভালভাবে আটকে দিয়েছে তারপুলিনের ফ্ল্যাপ। মনে মনে বলেছে, নিকুচি করি বৃষ্টির ছাঁট আর ঠাণ্ডা বাতাসের।

মার্সা আলম থেকে আসওয়ান পুরো চার ঘণ্টার পথ। কিন্তু তৃতীয় ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর গতি কমাল ট্রাক কনভয়। পিছনে ফেলে এসেছে মরুভূমি, সামনে নীল নদের পাশে ব্যস্ত শহর।

নীল নদের ওপরে আধুনিক এক সেতু পেরিয়ে এডফু শহরে ঢুকল কনভয়। চারপাশে উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, দোকান, আর সরকারী দালান। পূর্ব বার্লিনের মতই এই শহর, যদিও বসে আছে মরুভূমির কোলে।

কিছু দূর যাওয়ার পর আরও কমল ট্রাকের গতি। সোহেল ঠিক করল, ট্রাফিকের লাল বাতি জ্বলেই নেমে পড়বে। কিন্তু আধপাক খেয়ে আবারও রওনা হলো কনভয়। চলেছে উত্তর দিকে।

‘শালারা আরেক দিকে যাচ্ছে,’ বিড়বিড় করল সোহেল। একটু পর অন্য হাইওয়েতে উঠবে। তারপর নাক গুঁজবে গিয়ে আসওয়ান ড্যামে। নিচু গিয়ার পালেট উঁচু গিয়ার ফেলেছে ট্রাকের ড্রাইভার। বাড়ছে ইঞ্জিনের খ্যার-খ্যার আওয়াজ। না, আর থাকা ঠিক হবে না!

তারপুলিন তুলে রিয়ার বাম্পারে নামল সোহেল। আশপাশে টেলিফোনের থাম, কোনও বাতি বা সাইনবোর্ড নেই। কেউ নেই। নেই বৃষ্টির ভিতর একটা ভেজা কুকুরও। রাস্তা পরিষ্কার। লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল সোহেল।

ভেজা খোয়ার পথে গড়িয়ে দিল শরীর, পিছলে থামল চওড়া

এক কাদাপানির গর্তে। অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত। ওর পতন দেখেনি ট্রাকের ড্রাইভার বা হেল্লার কিংবা আর কেউ।

আঁধার রাস্তা ধরে জোর আওয়াজ তুলে উত্তরে চলেছে ট্রাক বহর। একবারের জন্য কমল না গতি। জ্বলল না ব্রেক লাইট।

কাদা থেকে উঠল নোংরা, চুপচুপে ভেজা সোহেল। চট করে দেখে নিল চারপাশ। বৃষ্টির ভিতর দেখা গেল একটু দূরে প্রকাণ্ড এক দালান। ওটার দিকে তাক করা হয়েছে অন্তত বিশটা স্পট লাইট। ফকফকে দিন হয়ে গেছে জায়গাটা।

পতনের সময় ব্যথা পেয়েছে কাঁধ-কোমরে, এসব পান্ডা না দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ল্যাংচাতে লাগল সোহেল। ইয়েমেনে কুয়ায় পড়বার সময় মচকে গেছিল গোড়ালি। ভুরু কুঁচকে রওনা হয়ে গেল বাতিভরা দালানের দিকে। দূর থেকে মনে হলো, ওখানে চলছে কনস্ট্রাকশন কাজ। আবার তা না-ও হতে পারে, হয়তো ওখানে আছে প্রাচীন কোনও মন্দির। কাছাকাছি গিয়ে সোহেল বুঝল, এটাই মিশরের সবচেয়ে সুরক্ষিত প্রাচীন সাইট— দি টেম্পল অভ হোরাস।

সামনের দেয়ালে প্রকাণ্ড দুই ডানা, রাতের কালো আঁধার চিরে উঠেছে কমপক্ষে এক শ' ফুট উপরে। দেয়ালে খোদাই করা মানুষের আকৃতি কমপক্ষে ষাট ফুট উঁচু। জোরালো বাতি উজ্জ্বল আলো ফেলেছে দালানে।

এই সাইট দেখতে আসে হাজারো টুরিস্ট। কিন্তু আজ বৃষ্টি ভরা রাতে কেউ নেই। অবশ্য, একেবারেই যে কেউ নেই, তা-ও নয়। বাতি জ্বলা বুথে বসে আছে দুই সিকিউরিটি গার্ড।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বুথের জানালায় উদয় হলো সোহেল, জোর টোকা দিল কাঁচে। এত রাতে প্রাচীন সাইটে কদমাত্র সোহেলকে দেখে হার্ট ফেইল করে মরতে মরতেও সামলে নিল দুই গার্ড। দু'জনই লাফ দিয়ে ছেড়েছে চেয়ার।

নতুন উদ্যমে কাঁচে থাবা বসাচ্ছে সোহেল।

ভীষণ দ্বিধা নিয়ে কাদাময় প্রেতাত্মকে দেখল দুই গার্ড। এত রাতে ভূত ছাড়া কে-ই বা আসবে এখানে?

পরস্পরকে দেখল তারা, চোখে অনিশ্চয়তা ও ভয়।

কেউ খুলবে না দরজা বা জানালা।

‘খোলো!’ বাইরে গলা ফাটল সোহেল। ‘খোলো!’

কয়েক সেকেন্ড পর নড়ে উঠল ডানদিকের গার্ড, পিস্তল বের করে বাম হাতে খুলল জানালা।

‘সাহায্য চাই,’ গলা নামাল সোহেল।

ভয় সামলে নিয়ে ইংরেজিতে বলল গার্ড, ‘সাহায্য, কী ধরনের?’ দরজা খুলল সে। ‘আসুন। ভেতরে আসুন।’

জানালা থেকে সরে বুথে ঢুকল সোহেল। সারা গায়ের কাদা-পানি গড়াতে শুরু করেছে মেঝেতে। অন্য গার্ড তোয়ালে বাড়িয়ে দিতেই ওটা নিয়ে ভেজা মুখ-মাথা মুছল সোহেল। ‘ধন্যবাদ।’

‘বৃষ্টির ভেতর কী করছেন?’ জানতে চাইল পিস্তলধারী গার্ড।

‘লম্বা কাহিনি,’ জবাবে বলল সোহেল, ‘আমি বাংলাদেশি নাগরিক। বন্দি করা হয়েছিল। পালিয়ে এসেছি। ...আপনাদের এখানে ফোন আছে?’

‘বাংলাদেশি ট্যুরিস্ট?’ বলল অন্য গার্ড। ‘আপনি চান আমরা আপনার হোটেলে যোগাযোগ করি?’

‘না,’ বলল সোহেল। ‘ট্যুরিস্ট নই। কথা বলতে চাই পুলিশের বড় কর্মকর্তা বা সেনাবাহিনীর বড় অফিসারের সঙ্গে, নইলে মস্ত ভয়ঙ্কর বিপদ হবে।’

‘কেমন ধরনের বিপদ?’ গভীর সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল পিস্তলধারী গার্ড।

সরাসরি তার চোখে তাকাল সোহেল। ‘টেরোরিস্টরা উড়িয়ে দিতে চলেছে আপনাদের আসওয়ান ড্যাম।’

সতেরো

উত্তর দিকের হাইওয়েতে তুমুল গতি তুলে চলেছে জায়েদ বিন মনযুরের ট্রাক কনভয়, এক জায়গায় এসে মেইন রোড থেকে নেমে গেল ধূলিময় সরু পথে। পাশ কাটিয়ে গেল আসওয়ান ড্যাম, পেরিমিটার রোড ধরে একেবেঁকে চলেছে লেক নাসেরের পাথুরে তীরের দিকে।

ড্যামের আধ মাইল উপরে উঠবার পর সামনে পড়ল খোলা, চওড়া ফটক। সামনের ট্রাকের ক্যাবে বসে নির্দেশ দিল দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, খালিফ বিন আদনান।

হেডলাইট নিভিয়ে দিল পাঁচ ড্রাইভার, চোখে পরে নিল নাইট ভিশন গগলস। আঁধারে কনভয় পৌঁছে গেল লেকের পারে বোট র্যাম্প।

‘ট্রাক ঘুরিয়ে নাও,’ নির্দেশ দিল খালিফ, ‘এরপর পিছাতে শুরু করবে।’

সামনের ট্রাক থেকে নেমে পড়ল সৈঁ, হাতের ইশারায় দেখাল কী করতে হবে। চওড়া র্যাম্প পাশাপাশি দাঁড়াল দুটো করে চারটে ট্রাক, সামনে একটা। পুরো কনভয় যেন পানি থেকে উঠে আসা মস্ত একটা ক্ষুধার্ত কুমির।

বৃষ্টিপাতে এতই ভরে উঠেছে হ্রদ, তলিয়ে গেছে র্যাম্পের শেষ মাথা। খালিফ আন্দাজ করল, পানির তলে কমপক্ষে এক শ’

ফুট নেমে হুদে মিশেছে এই র‍্যাম্প।

খালিফের নির্দেশে র‍্যাম্প বেয়ে নামতে লাগল ট্রাক বহর, ড্রাইভাররা খুব সতর্ক। বারবার জানালা দিয়ে বা রিয়ার ভিউ মিররে চেক করছে পিছনের ট্রাকের পিছিয়ে যাওয়া।

পানির দিকে নামছে ট্রাকের কনভয়। পকেট থেকে রেডিয়ো কন্ট্রোলার বের করল খালিফ, অ্যান্টেনা লম্বা করে নিয়ে পাওয়ার সুইচ অন করে টিপল চারটে লাল বাটনের প্রথমটা।

পাঁচ ট্রাকের বেড়ে খুলে গেল হলদে সব ড্রামের ম্যাগনেটিক সিল, ডুপ্ আওয়াজ তুলে একপাশে সরে গেল ঢাকনি।

খালিফের হাতের রিমোট কন্ট্রোলারের কটকটে সবুজ বাতি জানান দিল, সফল হয়েছে তার অ্যাকটিভেশন।

আর কেউ জানে না, জীবন্ত হয়ে উঠেছে রূপালি বালিকণার মত কোটি কোটি ন্যানোবট। কিলবিল করে নড়ছে মশার খুদে লারভার মত, উঠে আসতে চাইছে ড্রামের মুখে।

পিছনের ফ্ল্যাটবেডে কী ঘটছে, জানে না পাঁচ ড্রাইভার। মাধ্যাকর্ষণের টানে র‍্যাম্প বেয়ে নেমে চলেছে। ওদের মনে হচ্ছে, কী যেন টানছে পিছন থেকে।

ড্রাইভারদের সতর্ক কাজে খুশি হলো খালিফ। কোনওদিকে খেয়াল নেই তাদের। এবার কোনও ঝামেলা ছাড়াই নিজের কাজ শেষ করতে পারবে সে।

এইবার দ্বিতীয় লাল বাটন টিপল খালিফ।

‘ক্লিক!’ আওয়াজ তুলে আটকে গেল সবক’টা ক্যাবের দরজার তালা। নব্বুই ভাগ উঠে আটকে গেল জানালা। চমকে গেছে ড্রাইভাররা।

এক মুহূর্ত পর ক্যাবে রাখা ছোট ক্যানিস্টারের মুখ খুলে যেতেই ভিতরে ছড়িয়ে গেল কড়া ক্লোরোফর্ম। বড়জোর দুই সেকেন্ড সময় পেল ড্রাইভাররা। জানালা বা দরজা খুলতে পারল

না, তার আগেই জ্ঞান হারাল। মাত্র একজন ডান পাশের জানালা অর্ধেক নামিয়ে দিতে পেরেছিল, তারপর হারিয়েছে চেতনা।

অপেক্ষা না করে তৃতীয় বাটন টিপল খালিফ। গর্জে উঠল ট্রাকের ইঞ্জিন। গতি তুলে পিছিয়ে চলেছে যন্ত্রদানব। বিশালদেহী জলহস্তির মত জোরালো ঝপাস্ ঝপাস্ আওয়াজ তুলে হৃদের পানিতে নামল একের পর এক ট্রাক।

সেকেণ্ডারি এয়ার ইনটেক রাখতে মডিফাই করা হয়েছে ইঞ্জিন, এসব ইনটেক ট্রাকের ছাতের পাশে উঁচু এগযস্ট চিমনির মত দেখতে। খালিফ ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের আগে বন্ধ হয়ে গেছে মূল এগযস্ট পাইপ, চালু হয়েছে দ্বিতীয় এগযস্ট। ওটার কাজ অনেকটা সুরকেলের মত। এজন্য বাতাস পাচ্ছে ইঞ্জিন, পিছাতে শুরু করে পানির নীচে তলিয়ে যাবার পরও পূর্ণোদ্যমে চালু থাকল ইঞ্জিনগুলো।

পাঁচ ইঞ্জিন এখনও চালু, চাকা পিছিয়ে নিচ্ছে ট্রাক। র‍্যাম্প পেরিয়ে নুড়িপাথর আর জলমগ্ন মস্ত সর পাথরখণ্ডের ভিতর দিয়ে চলল পাঁচ যন্ত্রদানব। তারপর এক সময় পানি ঢোকার কারণে থেমে গেল ইঞ্জিনগুলো। এসব ট্রাক এখন আছে পানি সমতল থেকে তিরিশ ফুট নীচে, তীর থেকে দেড় শ' ফুট দূরে।

নির্ধাত ডুবে মরবে অচেতন ড্রাইভাররা। কখনও তাদের লাশ পাওয়া গেলে, খোঁজ-খবর করলে জানা যাবে, প্রত্যেকে ছিল মিশরীয় চরমপন্থী। জেনারেল নাবিস আবিল-বিল ছাড়া কেউ জানবে না, আসওয়ান ড্যাম বিধ্বস্ত হওয়ার পিছনে রয়েছে জায়েদ বিন মনযুর আর খালিফ বিন আদনান। কাউকে কিছুই বলতে পারবে না ওই চরম দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক কর্মকর্তা। বাধ্য হয়ে পানি পাওয়ার জন্য আবারও জায়েদের সঙ্গে বসতে চাইবে আলোচনার টেবিলে। কিন্তু তখন তার কাছ থেকে অনেক বেশি টাকা দাবি করা হবে।

হ্রদের পানি স্থির হতেই কট্রোলারের শেষ বাটন টিপল খালিফ। আধ মাইল দূরে ড্যামের দেয়ালে দুটো জায়গায় রাখা আলাদা দুটো ডিভাইস থেকে বেরোতে লাগল হোমিং সিগনাল।

মাঝারি দুই সুটকেসের সমান যান্ত্রিক কাঁকড়ার মত দুই ডিভাইস ওখানে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে রেখে গেছে দুই স্কুবা ডাইভার। একটা রাখা হয়েছে ওয়াটার লাইনের সামান্য নীচে, অন্যটা সত্তর ফুট নীচে ড্যামের ঢালু দেয়ালে।

ডুবুরি দু'জন ঠিকঠাক কাজ করে থাকলে, আগেই বাঁধের বাইরের দিকের দেয়ালে করা হয়েছে দশ ফুট গভীর দুই গর্ত। জোড়া যান্ত্রিক কাঁকড়া থেকে নির্দেশ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে ন্যানোবটের দুটো দল, এরই ভিতর ওই দুই গর্ত বড় করে তুলছে তারা।

ট্রাকের ড্রাম থেকে বেরোচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক ন্যানোবট, সিগনাল পেয়ে দেরি করবে না। ঠিক ছয় ঘণ্টা পর বাঁধের ওপাশে উঁচু দেয়ালে দেখা দেবে সুরু একটা নালা। ওটাই তৈরি করবে চওড়া খাল। ছড়মুড় করে পানি গিয়ে পড়বে নীল নদ অববাহিকায়।

শুরুতে মনে হবে, বাঁধ টপকে উপচে পড়ছে নাসের হ্রদের পানি। কিন্তু ওই নালা দ্রুতই হয়ে উঠবে মস্ত নদী। কারও সাধ্য নেই ওটাকে ঠেকাবে। ভরে উঠবে নীল নদ। কিন্তু সেখানেই থামবে না বিপর্যয়।

বাঁধের অনেক নীচে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ। ওটাই কাঁপিয়ে দেবে বাঁধের ভিত্তি। শুরুতে আসওয়ান ড্যামের ভি আকৃতির বড় একটা অংশ ভেঙে পড়বে। তখনই শুরু হবে সত্যিকারের সুনামি।

আসলে, ওদেরকে সুবিধা করে দিয়েছে জেনারেল নাফিস আবিল-বিল। আসওয়ান ড্যাম উড়ে গেলে, তার উপর ভারত মহাসাগরে জায়েদের কীর্তির কারণে কোনও দেশের সরকার আর সাহস পাবে না হামলা করতে। হুমকির মুখে বাধ্য হয়ে টাকা

দেবে তারা ।

আমেরিকানরা চাইবে না মুড়মুড় করে ভেঙে পড়ুক হুভার ড্যাম । সেক্ষেত্রে মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে লাস ভেগাস । ওই ড্যাম উড়ে গেলে পানি থেকে বঞ্চিত হবে দক্ষিণ-পশ্চিমের সমস্ত রাজ্য, এক পলকে বন্ধ হবে লাখ লাখ কেভি বিদ্যুৎ ।

চিনও চাইবে না বিধ্বস্ত হোক তাদের থ্রি গর্জ ড্যাম ।

আসলে ব্যস্ত হয়ে টাকা দেবে সব দেশ ।

হাঁটতে শুরু করে হৃদের পানিতে রিমোট ফেলে দিল খালিফ বিন আদনান । আধ মাইল দূরে অপেক্ষা করছে উট । ওটার পিঠে চেপে মুখে কাফিয়ে পেঁচিয়ে হাজারো বছরের চেনা পথে অন্য সব বেদুঈনের মতই হারিয়ে যাবে সে উষ্ম মরুভূমিতে ।

আঠারো

উইলি দ্বীপের সৈকতে বন্দি হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ছোট একটা কুঁড়েঘরে ঘুম ভাঙল রানার । হয়ে পড়েছিল চরম ক্লান্ত, বুঝে গিয়েছিল, ওর চাই পূর্ণ বিশ্রাম, নইলে সুস্থিরভাবে চলবে না মগজ । প্রথম সুযোগে শুয়ে পড়েছে কাঁচা মাটির মেঝেতে । বাইরে থেকে খঠাস্ আওয়াজে আটকে দেয়া হয়েছে দরজা । পরের মিনিটে ঘুমিয়ে পড়েছে রানা । আর এখন জেগে উঠে ভাবল: নিশ্চয়ই বিদঘুটে এক স্বপ্নের অদ্ভুত কোনও অংশ ওই দ্বীপ বা ওসব লোক ।

কিন্তু আসলে তা নয়!

খপু করে ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল দু'জন কালো লোক। পরনে ইউনিফর্ম। কুঁড়েঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেল গাছের নীচে আরেক ঘরের সামনে। ঠেলে ভিতরে নেয়ার পর অবাক হলো রানা মিলিটারি সেটিং দেখে। এটা আদিম কোনও সামরিক আদালত। জ্যাসিন্টা আর ইউনুসের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে।

ঘরের আরেক দিকে ডেস্কের ওপাশে পলিনেশীয় চেহারার এক অ্যাবোরিজিন দ্বীপবাসী। তাকেই মনে হলো প্রধান জাজ। বসেছে বেঞ্চে। শুনানির জন্য টেবিলে কাঠের হাতুড়ি ঠুকল সে। অন্যদের চেয়ে দৈর্ঘ্য বেশি, সে-ই বন্দি করেছে রানাদের। রূপালি রঙের ছোপ পড়েছে তার কালো চুলে।

‘আমি উইলি দ্বীপের প্রেসিডেন্ট, উনিশতম রুয়ভেল্ট,’ গম্ভীর কণ্ঠে জানাল ডুডু।

‘উনিশতম রুয়ভেল্ট?’ প্রতিধ্বনি তুলল রানা।

‘হ্যাঁ,’ নিশ্চিত কণ্ঠে বলল জাজ। ‘আর তুমি? নাম কী তোমার? রেকর্ড করে রাখার জন্য বলে ফেলো নাম।’

‘আমি বাংলাদেশের প্রথম মাসুদ রানা,’ গম্ভীর মুখে বলল রানা। ‘আমার আগে কোনও মাসুদ রানা কোনওকালেও ছিল না।’

বড় করে দম ফেলল ক’জন জাজ আর অন্যরা।

পরিবেশটা বুঝবার চেষ্টা করছে রানা।

ব্যাটারা করে কী?

পাগল নাকি?

বলে কী এসব?

সৈকত থেকে ধরে আনবার সময় জঙ্গলে গোপন সব ঘর দেখেছে, প্রতিটি দুর্গের মত পোক্ত। এখানে ওখানে ট্রেঞ্চ আর ভারী মেশিনগানের রক্ষাব্যূহ। ভাঙা একটা দালানের পাশ দিয়ে পেরিয়ে এসেছে। এ ছাড়া, রয়েছে বেশ অনেকগুলো কুঁড়েঘর।

প্রতিটার ছাতে পাম পাতার আচ্ছাদন ।

ওদের ঘিরে রেখেছে সবুজ আর্মি ফেটিং পরনে একদল পুরুষ । কুঁড়েঘরের মতই পুরনো তাদের ইউনিফর্ম । অনেকের পোশাক বাজেভাবে সেলাই করা নকল জামা । অবশ্য এম১ রাইফেল সত্যিকারের বলেই মনে হচ্ছে । কোরিয়ান যুদ্ধের পর ওই জিনিস আর কখনও হাতে তোলেনি আমেরিকান মেরিনরা । এখানে এটাই প্রধান অস্ত্র ।

রানার পাশে দাঁড়িয়ে ইউনুসের পর নিজ নাম জানাল জ্যাসিটা । ওরা দু'জন রানার মত করে নিজেদের জাহির করেনি, বাদও পড়েছে নিজেদের দেশের নাম ।

উনিশতম রুশভেল্ট বলে উঠল, 'এই দেশে পা রেখেছ, তাই তোমাদের বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে কঠিন অভিযোগ উঠেছে । অস্ত্রও পাওয়া গেছে । তোমরা ভিনদেশের গুপ্তচর । শত্রু-সেনা হিসাবে বন্দি হয়েছে । এবার বলো, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করছ?'

'আত্মসমর্পণ?' অবাক হয়ে গেল জ্যাসিটা ।

'হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল জাজ । 'অস্বীকার করতে পারো তোমরা আসলে অক্ষশক্তির সৈনিক?'

রানার কাপড়ের আস্তিন টানল জ্যাসিটা । নিচু স্বরে বলল, 'আসলে এখানে কী হচ্ছে, রানা? পাগলগুলো বলে কী?'

যা বুঝবার বুঝেছে রানা । গুছিয়ে নিচ্ছে পরিকল্পনা । ফিসফিস করে বলল, 'এটা বোধহয় কার্গো কাল্ট ।'

'কার্গো কাল্ট?' ভুরু কোঁচকাল জ্যাসিটা । 'ওটা আবার কী?'

'প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হঠাৎ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধের মাঝে পড়ে গিয়েছিল সাধারণ, অশিক্ষিত সব দ্বীপবাসী । স্ট্র্যাটেজিকালি গুরুত্বপূর্ণ সব দ্বীপ দাবি করেছিল দুই পক্ষের সামরিক বাহিনী । নানান কাজে ব্যবহার করা হতো সেসব দ্বীপ । অসংখ্য জাহাজ থেকে নামিয়ে এসব দ্বীপে জমা করা হতো

জরুরি সাপ্লাই। স্টাফ আর সৈনিকরা ওগুলোকে বলত কার্গো।’

চোখের ইশারায় চারপাশের সৈনিক দেখাল রানা।

‘উপজাতীয় এসব মানুষের কাছে আকাশ থেকে মানুষ নেমে আসা বা মস্ত জাহাজে করে হাজির হওয়া, দুটোই ছিল বিস্ময়কর। সৈনিকরা আনত অটেল খাবার আর শত শত প্রয়োজনীয় জিনিস। উপজাতীয়রা ভাবত: এসব ভিনদেশিরা আসলে দেবতা।’

‘সত্যি-সত্যি?’ বিস্মিত জ্যাসিন্টা।

‘তা-ই। দ্বীপবাসীদেরকে দিত খাবার, পোশাক ছাড়াও আরও নানান কিছু। তাই এদের ধারণা হলো: এসবই আসছে স্বর্গ থেকে। কিন্তু যুদ্ধের পর একদিন চলে গেল সৈনিকরা। জিনিসপত্র পেতে অভ্যস্ত দ্বীপবাসী পড়ল অকূলে। জাহাজ বা বিমান থেকে আর নামল না কার্গো। আকাশ থেকে আর পড়ল না রূপালি পাখি।

‘বেশিরভাগ দ্বীপে স্বাভাবিক হয়ে গেল জীবন, কিন্তু কোনও কোনও দ্বীপের আদিবাসী অপেক্ষা করল: একদিন আবারও কার্গো নিয়ে ফিরবে সৈনিকদল। এদেরকেই বলে কার্গো কাল্ট।’

উনিশতম রুথভেল্টের চেয়ে কম ক্ষমতামূলী এক জাজ বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানার উপর। ধমকে উঠল, ‘অত ফুসফাস কীসের? স্বপক্ষে কিছু বলার থাকলে বলো, নইলে মেনে নাও ন্যায্য শাস্তি!’

‘আমরা আত্মসমর্থনের জন্যে সেরে নিচ্ছি আলাপ,’ নরম সুরে বলল রানা। গলা নিচু করে জ্যাসিন্টাকে বলল, ‘তারা আমেরিকান বেসে যা যা দেখেছে, তা-ই নকল করত। কোনও কোনও কাল্ট নিয়মিত ড্রিল করত সৈনিকদের বুট ক্যাম্পের মত। এদের মতই। কাঁধে-কাঠের নকল রাইফেল। সকালে কুচকাওয়াজ। নিজেদের ছিল র‍্যাঙ্ক আর পুরস্কারের মেডাল। কেউ মরলে কবর দিত মিলিটারি অনুষ্ঠান করে। তেমনই বিখ্যাত একটা কাল্ট জন ফ্রাম।

আন্দাজ করা হয়, ওটার নাম হয়েছিল এক লোকের কারণে। সে সম্ভবত দ্বীপে নেমেই বলেছিল: “হাই, আমার নাম জন ফার্মার।” কাজেই আদিবাসীরা কাল্টের নাম দিল: জন ফার্মার্স।’

‘আজিব,’ বিড়বিড় করল জ্যাসিন্টা। ‘কিন্তু আমরা তো প্রশান্ত মহাসাগরে নেই। আর এদেরগুলো কাঠের অস্ত্রও না, আসল জিনিস!’

‘এদের ব্যাপার একটু আলাদা,’ বলল রানা। খেয়াল করেছে, ডেস্কের উপর বড় চার্ট, একটা কমপাস, ব্যারোমিটার, পাশেই সেক্সটেন্ট। উনিশতম রুয়ভেল্টের পাশে প্রাচীন ধূসর একটা লাইফ ভেস্ট আর দুটো ডগ ট্যাগ। পাশেই সত্তর বছরেরও বেশি পুরনো, মলিন ইয়াক্সি বেসবল ক্যাপ।

‘আলাপের সুযোগ শেষ,’ বলল উনিশতম রুয়ভেল্ট। ‘এবার তোমরা কেন অপরাধী নও, তা ব্যাখ্যা করবে, নইলে দেয়া হবে কঠিন শাস্তি।’

‘আমরা নিরপরাধ,’ চট করে বলল রানা। ‘আপনাদের মতই খাঁটি আমেরিকান। অন্তত একজন।’

সন্দেহ নিয়ে ওকে দেখল জাজ। ‘তা প্রমাণ করবে কীভাবে?’

আরেক জাজ বলল, ‘ওই মেয়ে তো জাপানি গুপ্তচরও হতে পারে।’

কথাটা শুনে সত্যিই খেপে গেছে জ্যাসিন্টা। কড়া সুরে বলল, ‘এত সাহস তোমার, আমাকে বলছ জাপানি গুপ্তচর! সত্যিই যদি জাপানি হতাম, তাতেই বা কী করতে?’

‘তুমি কি জাপানি?’ জানতে চাইল উনিশতম রুয়ভেল্ট।

‘না। আমি আমেরিকান। হাওয়াই স্টেট থেকে এসেছি।’

‘আসলে বলতে চাইছে টেরিটোরি অভ হাওয়াই,’ শুধরে দিল রানা।

‘না, তা নয়!’ গরম চোখে রানাকে দেখল জ্যাসিন্টা।

‘হ্যাঁ, তা-ই, তুমি টেরিটোরি অভ হাওয়াই থেকে এসেছ,’ জোর দিয়ে বলল রানা। ‘উনষাট সালে স্টেট হয়েছে ওটা!’

আশা-নিরাশা-দ্বিধা ভরা বড় বড় বাদামি চোখে রানাকে দেখল জ্যাসিন্টা।

‘কথা আমাকে বলতে দাও,’ চাপা স্বরে বলল রানা। ঘুরে দাঁড়াল উনিশতম রুযভেল্টের দিকে। ‘ও আসলে বলতে চাইছে, ছোটবেলা কাটিয়েছে পার্ল হার্বারে। শতবার গেছে অ্যারিয়োনা মেমোরিয়ালে। সেই ডিসেম্বরের সাত তারিখে যারা খুন হয়েছিল, তাদের প্রতি ওর শ্রদ্ধা অসীম।’

আপত্তি ছাড়াই কথাটা মেনে নিল জাজরা।

উনিশতম রুযভেল্ট রানাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আর তোমার ব্যাপারটা কী?’

‘আমি কাজ করি ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড ম্যারিন এজেন্সিতে। ওটা ইউ.এস. গভার্নমেন্টের ওশন রিসার্চ এজেন্সি। ওই সংগঠনের প্রধান অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।’

‘হ্যামিলটন?’ বলল দ্বিতীয় জাজ।

‘কখনও তার নাম শুনিনি,’ সায় দিল তৃতীয় জাজ।

‘সত্যিকারের অ্যাডমিরাল তিনি,’ বলল রানা। ‘আমার বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বহুবার গেছি তাঁর বাড়িতে। ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট চেয়েছিলেন তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করতে।’

ভুরু কপালে উঠল বিচারপতিদের।

‘ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন?’ টিটকারির হাসি হাসল এক জাজ। ‘আর তুমি তাঁর বাড়িতে গেছ?’

হাসতে শুরু করেছে অন্যরাও।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল প্রধান বিচারপতি উনিশতম রুযভেল্ট। ‘এ হতে পারে না। তোমার মত নোংরা পোশাক পরা কোনও লোকের সঙ্গে কখনও বন্ধুত্ব করবে না নতুন হ্যারি

ট্রম্যান ।’

চট্ করে নিজের করুণ পোশাক দেখে নিল রানা । মার খাওয়া চেহারা ওর । চোরাই ইউনিফর্ম একটু বেশি ঢিলা । ছিঁড়ে গেছে এখানে ওখানে । গম্ভীর চেহারায় বলল রানা, ‘আপনারা আমাকে সেরা পোশাকে দেখেননি ।’

ওর কানের কাছে বলল জ্যাসিণ্টা, ‘নতুন হ্যারি ট্রম্যান?’

‘নাম আর টাইটেল মিলেমিশে গেছে,’ বলল রানা, ‘এই দ্বীপে যে এসেছিল, সে বলেছিল দেশের প্রেসিডেন্ট রুয়ভেল্ট, আর ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন ট্রম্যান ।’

‘ও, ‘এই জন্যেই এ লোক উইলি দ্বীপের উনিশতম রুয়ভেল্ট?’

‘তা-ই তো মনে হচ্ছে ।’

‘আমি আছি টোয়াইলাইট যোনে,’ বিড়বিড় করল জ্যাসিণ্টা ।

একই অনুভূতি রানার । কিন্তু বুঝে গেছে, এতে পাবে বাড়তি সুবিধা । ভীষণ গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, ‘যা বলছি, প্রতিটা কথা সত্য । উইলি দ্বীপে পা রেখে একটাও মিথ্যেকথা বলিনি । সাগরে ইউনাইটেড স্টেটসের ভয়ঙ্কর একদল শত্রুর হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করে পালিয়ে এসেছি ।’

কথাটা শুনে প্রশংসার ছাপ পড়ল বিচারপতিদের চেহারায় ।

ফিসফিস করে নিজেদের ভিতর চালু হলো আলাপ ।

‘আমরা জানব কী করে এই লোক আমেরিকান?’ বলল দ্বিতীয় জাজ ।

‘দেখতে অনেকটা ক্যাপ্টেন জন উইলির মতই, তবে রং ময়লা,’ বলল উনিশতম রুয়ভেল্ট ।

‘জার্মানও হতে পারে । কে জানে, হয়তো জার্মান নাম মাসুদ রানা ।’

রানার দিকে ঘুরে চাইল উনিশতম রুয়ভেল্ট, ‘আমাদেরকে প্রমাণ দিতে হবে তোমার ।’

‘কী ধরনের প্রমাণ চান?’

‘আমি কিছু প্রশ্ন করব,’ বলল প্রেসিডেন্ট রুযভেল্ট, ‘তুমি যদি সত্যিই আমেরিকান হও, সহজেই জবাব দিতে পারবে। আর তা হলেই মেনে নেব তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ভুল তথ্য দিলে, ধরে নেব তোমরা আসলে প্রত্যেকেই দোষী, অক্ষশক্তির গুপ্তচর।’

‘বেশ, জবাব দিতে আপত্তি নেই,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা।

‘নিউ ইয়র্ক স্টেটের রাজধানী কী?’ জানতে চাইল জাজ।

‘অলব্যানি,’ বলল রানা।

‘গুড। এবার সহজ একটা।’

‘আরও কঠিন প্রশ্নেও অসুবিধে নেই,’ সাহস দেখাল রানা।

বিছের মত মোটা দুই কালো ভুরু একসঙ্গে মিশিয়ে ভাবতে লাগল উনিশতম রুযভেল্ট। কুঁতকুঁতে চোখে দেখল রানাকে। তারপর ছুঁড়ল নতুন সওয়াল: ‘ইউ.এস.এ-র ষোলোতম রুযভেল্ট কে?’

ষোলোতম রুযভেল্ট বলতে এ বোধহয় বোঝাতে চাইছে প্রেসিডেন্ট, ভাবল রানা। মুখে বলল, ‘অব্রাহাম লিঙ্কন।’

‘কোথায় জন্মান তিনি?’

বেশিরভাগ মানুষ জানে লিঙ্কন ছিলেন ইলিনয়ের মানুষ, ওখানেই জন্মেছেন। ‘লিঙ্কন জন্ম নেন কেণ্টাকিতে,’ বলল রানা। ‘কাঠের গুঁড়ির একটা কেবিনে।’

পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল কয়েকজন বিচারপতি। মনে হলো সম্ভ্রষ্ট।

‘মনে হচ্ছে ধাঁধার অনুষ্ঠানে আছি,’ বিড়বিড় করল জ্যাসিণ্টা।

‘কিন্তু ভুল উত্তর দিলেই ঝুলিয়ে দেবে,’ বলল রানা।

‘আর মাত্র একটা প্রশ্ন,’ বলল উনিশতম রুযভেল্ট। ‘বলো দেখি, রুথের বাড়ি বলতে কী বোঝানো হয়?’

মৃদু হেসে ফেলল রানা। ওর চোখ গিয়ে পড়ল পুরনো ইয়াক্সি

ক্যাপের উপর। এদেরকে সভ্যজগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যে-লোক, সে অন্তর দিয়ে ভালবাসত বেসবল। এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে।

‘যেটাকে রুথের বাড়ি বলে, তা আসলে ইয়াক্সি স্টেডিয়াম। ওটা ব্রঙ্কস-এ।’ জাজদের বাড়তি তথ্য দিল রানা, ‘ওই নাম হয়েছিল দুনিয়া-সেরা বেসবল খেলোয়াড় বেইবে রুথের কারণে।’

‘এর সব কথা এক্কেবারে ঠিক,’ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল দ্বীপের প্রেসিডেন্ট উনিশতম রুয়ভেন্ট। ‘সত্যিকারের আমেরিকান না হলে কখনও জানত না এসব কথা।’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক!’ হই-হই করে উঠল অন্যান্যরা।

‘কিন্তু এবার ওই মেয়ের ব্যাপারে কী করা যায়?’ জানতে চাইল তাদের একজন।

‘ও আমার সঙ্গেই এসেছে,’ বলল রানা, ‘লড়াই করেছে আমেরিকার শত্রুদের বিরুদ্ধে।’

‘আর ওই লোকটা?’

‘ও-ও আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী,’ দ্বিধাহীনভাবে বলল রানা।

‘তা হলে তো বন্দি করতে হবে না কাউকে,’ বলল উনিশতম, ‘অবশ্য, আজ পর্যন্ত বন্দি হয়নি কেউই। এটা এই দ্বীপের জন্য লজ্জাজনক ঘটনা হতে পারত।’

কৃতজ্ঞ চোখে রানার দিকে চেয়ে আছে ইউনুস। নিচু স্বরে বলল, ‘ভাই, জানও যদি যায়, আপনার সঙ্গে বেঈমানী করব না আমি।’

সব মজা শেষ, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বেশিরভাগ লোক।

বেঞ্চার কাছে গিয়ে উনিশতম রুয়ভেন্টের সামনে দাঁড়াল রানা। উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা, মৃদু হেসে বাড়িয়ে দিল ডান হাত। ‘জেলখানায় আটকে রেখেছিলাম বলে আন্তরিক দুঃখিত। আসলে এক শ’ ভাগ নিশ্চিত হতে হবে। কোনও ঝুঁকি নেয়া চলে না।’

তার সঙ্গে করমর্দন করল রানা। ‘বুঝতে পেরেছি। ...এবার কী জানতে পারি আপনার আসল নাম?’

‘আমি ডুডু,’ বলল প্রেসিডেন্ট।

‘আর আপনি এই দ্বীপের উনিশতম রুযভেল্ট?’ বলল রানা।

‘হ্যাঁ,’ মাথা দোলাল ডুডু। ‘প্রতি চার বছর পর পর বেছে নেয়া হয় নতুন নেতা। আমি উনিশতম। তিনজন রুযভেল্ট আগেই মরে গেছে বলে আমি উনিশতম। তিন বছর ধরে দ্বীপ রক্ষার দায়িত্বে আছি।’

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পেরিয়ে গেছে বহু বছর, ভাবল রানা। এ-লোক দ্বীপের উনিশতম নেতা। আর আজ থেকে সত্তর বছর বা তারও আগে এদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে লড়াকু একটা সৈন্যদল তৈরি করেছিল এক আমেরিকান লোক। তারপর আর কেউ আসেনি এই দ্বীপে, কেউ বলেনি কবে শেষ হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

নটিকাল ইকুইপমেন্ট আর লাইফ ভেস্টের উপর চোখ পড়ল রানার। আবারও চাইল উনিশতম রুযভেল্টের চোখে। ‘লাইফ ভেস্টে ঝাপসা একটা নাম দেখছি। ওটা কি কোনও জাহাজের নাম?’

‘হ্যাঁ,’ মাথা দোলাল ডুডু, ‘আগুন-লোহার বিশাল জাহাজ। নাম: এস.এস. ভিক্টর কেইন।’

‘কী হয়েছিল ওটার?’ জানতে চাইল রানা।

‘আটকা পড়েছিল দ্বীপের পুর্বের সৈকতে। আমাদের পরদাদা আর দাদারা সব সরিয়ে এনে তৈরি করেন ক্যান্টনমেন্ট।’

‘প্রতিরক্ষা?’ জানতে চাইল জ্যাসিন্টা, ‘কাদের বিরুদ্ধে?’

‘ইমপেরিয়াল জাপানি নেভি আর বানযাই হামলাকারীদের ঠেকাতে,’ বলল ডুডু।

তার কণ্ঠ শুনে রানা বুঝল, এই লোক মন থেকে বিশ্বাস করে,

যে-কোনও দিন জাপানিদের হামলা আসতে পারে। জ্যাসিণ্টা বেয়াড়া কোনও প্রশ্ন তুলবার আগেই চোখের ইশারায় ওকে নিষেধ করল রানা। সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে এই দ্বীপের মানুষ, যুগের পর যুগ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করেছে তাদের বাপ-দাদারা; এখন যদি এরা শোনে সত্যি সত্যিই যুদ্ধ শেষ, তার ফল ভাল না-ও হতে পারে।

‘কে ট্রেনিং দিয়েছিল আপনাদেরকে?’ জানতে চাইল রানা।

‘ইউনাইটেড স্টেটসের মেরিন কর্পের ক্যাপ্টেন জন উইলি আর সার্জেন্ট ফার্স্ট ক্লাস ডন ওয়াকার। শিখিয়েছেন কীভাবে ড্রিল করতে হয়, কীভাবে লড়তে হয়, কীভাবে লুকাতে হয়, বা কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় শত্রুকে।’

‘বেসবল ভক্ত ছিলেন কোন্ জন?’ জানতে চাইল রানা।

‘ক্যাপ্টেন জন উইলি।’

‘আর তাঁরা চলে যাওয়ার পর?’

মনে হলো ডুডু বুঝতে পারেনি রানার কথাটা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ‘না, চলে যাননি। ত্রুদের পাশে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল কবরে।’

‘তাঁরা মারা গেছেন এই দ্বীপে?’

‘ভিক্টর কেইন বালিতে গাঁথে যাওয়ার নয় মাস পর জখমের কারণে মারা যান ক্যাপ্টেন। সার্জেন্টও ছিলেন মারাত্মক আহত, হাঁটতে পারতেন না। কিন্তু আরও তেরো মাস বেঁচে ছিলেন। তিনিই শেখান কীভাবে লড়তে হবে।’

অদ্ভুত এই কাহিনি শুনে বিস্মিত হয়েছে রানা। ওর জানা ছিল না, একটা কার্গো কাল্টে রয়ে গেছে দু’জন আমেরিকান। মনে মনে বলল, সম্ভব হলে যোগাযোগ করব বিউ মরটন বা আহমেদ শরীফের সঙ্গে। ওদের সংগ্রহে আছে নেভাল ওয়ারফেয়ারের ওপর লেখা বিস্তারিত ইতিহাস। কার্গো জাহাজ যখন, কোথাও না

কোথাও লেখা হয়েছে ওটার সম্পর্কে। ভয়ঙ্কর ওই মহাযুদ্ধের ফলে সাগরের ইতিহাসের বইয়ে জমা হয়েছে হাজারো ফুটনোট। হারিয়ে গেছে অসংখ্য জাহাজ, অথবা হয়েছে নিমজ্জিত।

‘একটা কথা বুঝলাম না,’ বলল জ্যাসিণ্টা। ‘আপনাদের লড়তে হবে কেন? যুদ্ধ বা জাপানিদের কথা বুঝলাম, কিন্তু এই দ্বীপ তো অনেক ছোট। তা ছাড়া, জাহাজের রুট থেকেও অনেক দূরে। জাপানিরা এই দ্বীপ কেন দখল করতে চাইবে?’

‘দ্বীপ রক্ষা করতে লড়তে হবে, তা কিন্তু নয়,’ বলল ডুডু, ‘আসলে রক্ষা করতে হবে মেশিন। বিশ্বাস করে আমাদের জিম্মায় ওসব রেখে গেছেন ক্যাপ্টেন।’

‘কীসের মেশিন?’ জানতে চাইল রানা।

‘দারুণ ক্ষমতাসালী মেশিন,’ বলল ডুডু, ‘ওটার নাম পেইন মেকার মেশিন।’



উনিশ

পেইন মেকার মেশিনের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে রানা, কিন্তু এখনই ওটা দেখতে যাওয়া সম্ভব হলো না। ওদেরকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে উইলি দ্বীপের সবাই। ওদের কুঁড়েঘরে আসছে নানান ফলমূল আর অন্যান্য খাবার। সেলেব্রিটি হয়ে উঠেছে রানা, জ্যাসিণ্টা আর ইউনুস। উইলি দ্বীপে সত্তর বছর পর ওরা তিন আমেরিকান নাগরিক! কাজেই দ্বীপের বর্তমান ট্রুম্যানের নেতৃত্বে মিলিটারি ফেটিং পরে সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে গেল

দ্বীপের সৈনিকরা। রানাদের মনে হলো, একেকজন ওরা হয়ে উঠেছে জেনারেল ম্যাকআর্থার, নতুন করে ফিরেছে ফিলিপাইন বিজয় করতে।

ওদের জন্য ব্যবস্থা হলো ঝর্নায় স্নানের। পরবার জন্য দেয়া হলো দ্বীপবাসীদের মিলিটারি ফেটিগ। ওরা কুঁড়েঘরে ফিরবার পর খাবার হিসাবে দেয়া হলো নানান জাতের ভাজা-মাছ, সুস্বাদু আম, ইয়াব্বড় কলা আর নারকেলের দুধ। ওরা বুঝে গেল, খাবারের অভাব নেই এ দ্বীপে।

ওদের খাওয়ার সময় হাজির থাকল ডুডু আর অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা। কম কথায় শোনাল নানান গল্প। সবই ক্যাপ্টেন জন উইলি আর সার্জেন্ট ডন ওয়াকারের। রানা বুঝল, অল্প কিছু দিন এ দ্বীপে বাস করলেও মানুষদুটো সত্যিই গড়ে গেছেন নতুন এক সভ্যতা।

খাওয়া শেষ হলো ওদের নিয়ে দ্বীপ ঘুরিয়ে দেখাল ডুডু। নানান জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে ফাঁদ ও রক্ষাবূহ, সেসব সেটআপ দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রানা। রয়েছে ট্রেঞ্চ আর সুড়ঙ্গ, রসদের গুহার সঙ্গে যুক্ত। যুদ্ধের সময় খাবার বা পানির অভাব হবে না। আছে চারপাশ দেখবার টাওয়ার। বৃষ্টির পানি ধরে রাখবার জন্য কুয়া। খুলে এনে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়েছে জাহাজের সবই। বাদ পড়েনি পুরনো বয়লার, পাইপিং বা স্টিলের বিম। দ্বীপের উঁচু এক জায়গায় ভিক্টর কেইনের ঘন্টি। দরকার পড়লে জরুরি ভিত্তিতে সতর্ক করা হবে দ্বীপবাসীকে: হামলা শুরু করেছে জাপানিরা!

পিছনে গার্ডদের রেখে পাম গাছের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রানাকে নিচু স্বরে বলল জ্যাসিন্টা, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, এরা জানেও না দুনিয়া কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে!'

'এরা জানে না, কারণ কেউ আসেনি আর,' বলল রানা।

‘আমরা কি বলব ওদেরকে?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা।

মাথা নাড়ল রানা। ‘আমার মনে হয় না, ওরা জানতে চায়।’

‘চায় না কেন?’

‘চাইবে কেন, ওরা তো লুকিয়ে আছে,’ বলল রানা। ‘আমার ধারণা: তাই চেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন উইলি। যাতে নিরাপদে থাকে তাঁর পেইন মেকার মেশিন।’

মনে হলো বুঝতে পেরেছে জ্যাসিণ্টা। ‘ওদেরকে লুকিয়ে থাকতে দিয়ে কীভাবে নিরাপদে বেরোব আমরা? এটা তো একটা দ্বীপ। এদের নৌকা থাকার কথা। চাইলে হয়তো একটা দেবে।’

নৌকা আছে, রানা জানে। ডুডু বলেছে, এখানে দুটো দ্বীপ নিয়ে ওদের ক্যাম্প। এই দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা যায় অন্য দ্বীপটা। বোধহয় একটা থেকে আরেকটা পনেরো-বিশ মাইল দূরে। অর্থাৎ ওদের নৌকা যথেষ্ট ভাল; ওই জিনিস নিয়ে শিপিং লেনে পৌঁছে যেতে পারবে ওরা।

‘নৌকা আছে,’ বলল রানা। ‘কিন্তু কোথাও যাচ্ছি না আমরা। যাব শুধু আমি।’

হতভম্ব হয়ে গেল জ্যাসিণ্টা, চোখ-মুখ দেখে মনে হলো পিঠে পিনের খোঁচা খেয়েছে। কপালে উঠল দুই ভুরু, আড়ষ্ট হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ‘কী বললে, রানা?’

‘তোমরা এখানে নিরাপদ,’ বলল রানা।

‘তার মানে এটা নয় যে আমি এখানে থাকতে চাই,’ রেগে গিয়ে বলল জ্যাসিণ্টা। ‘এটা তো গিলিগানের দ্বীপের মত! আর আমি জিজ্ঞার হতে রাজি নই!’

‘তুমি দস্যু রবিন হুডের প্রেমিকা মেরি অ্যানের মতই সুন্দরী,’ মৃদু হাসল রানা। ‘আর সেজন্যেই থাকবে এই নিরাপদ দ্বীপে। ওদিকে আমি যাব মানুষের তৈরি দি আইল্যান্ডে।’

রানার কথার অর্থ বুঝতে চাইছে জ্যাসিণ্টা। ‘আবারও তুমি

ফিরবে ওখানে? কেন? পালিয়ে আসতে গিয়ে সাগরে ডুবে মরতে বসেছিলাম আমরা!’

‘নইলে এখানে আসতে পারতাম না,’ বলল রানা। ‘এবার দেখবে খুলে গেছে কপাল।’

‘তোমার কি মনে হয় না, টেরোরিস্টদের ওই ভাসমান দ্বীপে উঠলে মারা পড়বে?’

‘না, মরব না।’

রানার চোখে চাইল জ্যাসিণ্টা। ‘তুমি প্রাণের ঝুঁকি নেবে, কারণ ওখানে তোমার বন্ধুরা বন্দি?’

মাথা দোলাল রানা। ‘শুধু তা-ই নয়। জায়েদ বিন মনযুর এখন ওই দ্বীপে। টেরোরিয়ম, অস্ত্র চালান বা মানি লগারিঙের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু করছে সে।’

‘তা কী?’

‘এসবের শুরু হয়েছিল সাগরের তাপমাত্রা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে। তোমার ভাই স্রোত আর তাপমাত্রার প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করছিল। পাল্টে যেতে শুরু করেছে উপমহাদেশের আবহাওয়া। কমে গেছে বৃষ্টিপাত। কোটি কোটি কৃষক অপেক্ষা করছে মৌসুমী বৃষ্টি আসবে, কিন্তু তা আসবে না। ফলাফল: ভয়ঙ্কর খরা। আর তার মানেই মারাত্মক দুর্ভিক্ষ। এসব ঠেকাতে চাইলে আগে ঠেকাতে হবে জায়েদ বিন মনযুরকে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাকে ঠেকানো আমার অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতি স্বাভাবিক না হলে আমরা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মরব।’

‘আমার ভাই সাগরে জায়েদের ওই ছোট মেশিন আবিষ্কার করেছিল,’ আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাসিণ্টা।

‘ঠিক,’ বলল রানা। ‘ওই মেশিন ব্যবহার করে সূর্যের তাপ বা আলো নিয়ন্ত্রণ করছে জায়েদ। জানি না কীভাবে, কিন্তু তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট পাল্টে দিচ্ছে সে। প্রজাপতির মত আকাশে ভাসছে

ছোট যন্ত্র । ঘটনা যা-ই হোক, পরিণতি আমাদের দেশের জন্যে মারাত্মক ।’

আলাপ করতে করতে ওরা পৌঁছে গেছে দ্বীপের পূর্বের নিচু বাঁধের মত এক জায়গায় । সামনে চওড়া, রূপালি সৈকত । দূরে সাদা প্রবাল প্রাচীর । ওরা উত্তর দিক থেকে দ্বীপে উঠেছে, তার চেয়ে অনেক সহজে আসা যায় এদিক দিয়ে ।

এবার বোধহয় ওই মেশিন দেখা যাবে, ভাবল রানা ।

সৈকতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে হাত নাড়ল ডুডু । ‘ক্যাপ্টেন জন উইলি বলতেন, জাপানিরা এলে উঠবে সৈকতের এদিকে ।’

ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছিলেন, ভাবল রানা । যে কেউ সহজেই উঠতে পারবে এই চমৎকার সৈকতে ।

‘তাই দ্বীপের আরেক পাশ থেকে এখানে আনতে হয়েছিল পেইন মেকার মেশিন ।’

একদল লোকের দিকে ইশারা করল ডুডু । তারা চলে গেল ঝোপ দিয়ে তৈরি এক বেড়ার ওপাশে । ওদিকে একটা গুহা । রানা পৌঁছে দেখল, গুহার ভিতর বিদ্যুটে একটা মেশিন । স্পিকার সিস্টেমের মত দেখতে । চওড়ায় চার ফুট, উঁচুতে বড়জোর এক ফুট । চারকোনা জিনিসটার ভিতর আটকোনা আকৃতির বেশ অনেকগুলো পড । গুনল রানা । চারটে সারি আছে, প্রতি সারিতে দশটা করে পড । মনে হলো সিরামিক দিয়ে তৈরি ।

‘পাওয়ার চালু করো,’ নির্দেশ দিল ডুডু ।

পাশ থেকে হুইলের হ্যাণ্ডেল ধরে ঘোরাতে লাগল পালোয়ানের মত দুই লোক । একটা ফ্লাইহুইলের সঙ্গে রয়েছে জেনারেটর কয়েল । কয়েক সেকেন্ড পর দ্রুত ঘুরতে লাগল হুইল আর ডায়নামো ।

স্পিকার বক্সের আটকোনা পড থেকে বেরোচ্ছে অস্বস্তিকর চাপা খ্যাস-খ্যাস আওয়াজ । হঠাৎ করেই লাফিয়ে উঠল এক শ’

ফুট দূরের সাগর। থরথর করে কাঁপতে লাগল পঞ্চাশ ফুট দৈর্ঘ্যের একটা ঢেউ। মনে হলো কীভাবে যেন ফুটতে শুরু করেছে পানি।

নিজের লোকদের হাতের ইশারা করল ডুডু। তারা বাঁধের উপর থেকে সাতটা ক্যামোফ্লেজ নেটিং সরিয়ে দিল। ওখানে বসে আছে একই ধরনের সাতটা মেশিন। ওগুলো চালু করতেই ছিটকে উঠতে লাগল সৈকতের বালি।

রানা দেখল, সাগরে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মাছ, একটা আরেকটাকে টপকে যাচ্ছে স্যামনের মত। সহজ শিকার দেখে বাঁপিয়ে নেমে এল রাতের এক জোড়া পাখি। কিন্তু মাঝ পথেই যেন বৈদ্যুতিক শক খেয়ে চিক-চিক আওয়াজ তুলে পালিয়ে গেল। কোনও ধরনের ফোর্স ফিল্ড বাধা দিয়েছে তাদেরকে।

স্পিকার বক্স থেকে কোনও ভাইব্রেশন বোধহয়। আওয়াজ বলতে শুধু চাপা খ্যাস-খ্যাসানি।

‘সাউণ্ড ওয়েভ?’ ডুডুর কাছে জানতে চাইল রানা।

‘হ্যাঁ,’ বলল উনিশতম প্রেসিডেন্ট। ‘জাপানিরা এলে সৈকত পর্যন্ত আসতে পারবে না।’

রানা খেয়াল করেছে, মাছ বা পাখি মারা পড়েনি। ‘সাউণ্ড ওয়েভ মারাত্মক ক্ষতিকর নয় বোধহয়?’

‘তা নয়। কিন্তু এমনই ব্যথা তৈরি করবে যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। এই জন্যে শত্রুকে বন্দি করা সহজ।’

‘আলট্রা-সোনিক অস্ত্র,’ বলল জ্যাসিগ্টা, ‘এ জিনিস আগেই আছে পৃথিবীতে। জ্যাকোর সঙ্গে সাগরে ডাইভ দিয়ে দেখেছি, ছোট মাছকে অবশ করে পরে খেয়ে নেয় ডলফিনরা।’

আস্তু করে মাথা দোলাল রানা। নিজেও ওই দৃশ্য দেখেছে। ‘কয়েক দশক ধরে নানান দেশের মিলিটারির জন্যে এই জিনিস আবিষ্কার করতে চেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পুলিশবাহিনীও রাবার বুলেট বা টিয়ার গ্যাসের বদলে এমন এক ননলিথাল অস্ত্র চাইছে।

যাতে ভিড়ের সবাইকে বাগে পাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই এসব নিয়ে ভাবছেন বিজ্ঞানীরা।’

‘এই অস্ত্র কাজ করে কীভাবে?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা।

‘শুধু আন্দাজ করতে পারি, নিশ্চিত নই,’ বলল রানা। ‘এসব শব্দ হারমোনিক ভাইব্রেশন। ভিন্ন গতির শব্দ, ছুঁড়ে দেয়া হয় আরেক অ্যাংগেল থেকে। সঠিক জায়গায় গিয়ে মিলেমিশে যায়। যেমন, টার্গেট করা জায়গায় বিস্ফোরণ হয়ে উঠেছিল সাগরের ঢেউ। শব্দের তরঙ্গ বলতে পারো।’

‘আমাদের কপাল ভাল এই অস্ত্র ব্যবহার করেননি,’ ডুডুকে বলল জ্যাসিণ্টা।

মাথা দোলাল উনিশতম রুয়ভেল্ট।

‘ভুল ন্যাভিগেশনের কারণে বেঁচে গেছি,’ বলল রানা। সাগরের দিকে চেয়ে দেখল টগবগ করে ফুটছে পানি। একটা পরিকল্পনা আসছে ওর মনে। কিন্তু আগে বুঝতে হবে পেইন মেকার মেশিন কতটা কাজের।

‘আমি এই অস্ত্র টেস্ট করতে চাই।’

‘কোনও জন্তুর ওপর দেখাতে পারি,’ বলল ডুডু।

‘না।’

কৌতূহল নিয়ে রানাকে দেখল ডুডু। ‘আপনি অবাক করা মানুষ, মিস্টার রানা। তা হলে জানবেন কী করে?’

‘তুমি কি নিজের ওপর...’ রানার বাহুতে হাত রাখল জ্যাসিণ্টা, চোখে আপত্তি।

মৃদু হাসল রানা। ‘হাড়ে হাড়ে টের পাব, তাই তো ভাবছ?’

‘আপনি কেন ব্যথা পাবেন,’ হঠাৎ করেই বলল ইউনুস। ‘আমার ওপর দিয়েই পরখ করুন। সামান্য মানুষ আমি, আমাকে নিয়ে ভাবারও কেউ নেই।’

অবাক হয়ে বেদুঈনকে দেখছে ওরা।

‘ভাই কি ভাইয়ের জন্যে ঝুঁকি নেয় না?’ খুব সহজ সুরে বলল ইউনুস। ‘আপনার খাঁটি অন্তরের ছোঁয়া পেয়ে বুঝতে পেরেছি, সত্যিকারের ভাল মানুষ কেমন হয়। আপনি নিজেও জানেন না, আমাকে দিয়েছেন নতুন জীবন। তাই আপনার জন্য ব্যথা পেতে আমার কোনও আপত্তি নেই।’

বিস্মিত হয়ে বেদুঈন যুবককে দেখল রানা। ‘তোমাকে বিপদে ফেললে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব।’

‘মিস্টার রানা, ওই ব্যথা কিন্তু ভয়ঙ্কর তীব্র,’ সাবধান করল ডুডু।

‘হোক,’ বলল একরোখা রানা। ‘আর, ইউনুস, কথাটা বলেছ বলে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।’

দুই মিনিট পর সৈকতের শেষ প্রান্তে সাগরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঢেউয়ের মাঝে দেখল, ভাসছে কিছু মাছ। সাউণ্ড ওয়েভের কারণে মারা পড়েছে ওগুলো। শুধু যে ব্যথা দেবে তা নয়, খুনও করতে পারে ওই শব্দ-তরঙ্গ।

একটা পেইন মেকার মেশিন তাক করা হয়েছে রানার দিকে। হ্যাণ্ডলে হাত রেখেছে এক লোক। কিন্তু সামান্য শব্দও শুনল না ও। বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দুই হাতে কান চেপে ধরেছে জ্যাসিস্টা। ইউনুসের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা।

গর্ব নিয়ে হাতের ইশারায় মেশিনের হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে বলল ডুডু।

গ্ল্যাডিয়েটরের মত দু’পা ফাঁক করে দাঁড়াল রানা। ‘চালু করো!’

মেশিনের সুইচ টিপে দিল ডুডু।

ওই একই সময়ে রানার মনে হলো, ছিঁড়ে পড়ছে ওর সারা শরীর। খিঁচ ধরে গেল হাত-পায়ের পেশিতে। তীব্র ব্যথা মাথা-চোখ-কানে-নাকে। শুনল অপ্রাকৃতিক কোনও গুঞ্জন। যন্ত্রণায়

ফুলে গেল দুই চোয়াল । এবার ছিঁড়ে যাবে কানের পর্দা ।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল রানা । কিন্তু পারল না । হঠাৎ মুখ খুবড়ে পড়ে গেল সৈকতের বালিতে । ভয়ঙ্কর কষ্টে আটকে আসতে চাইল দম । নড়তে চাইল, কিন্তু পড়ে থাকতে হলো পাথরের মত । দুই হাতে চাপা দিল দুই কান ।

‘বন্ধ করো! বন্ধ করো!’ জ্যাসিণ্টার গলা শুনল রানা । ‘তোমরা ওকে মেরে ফেলছ!’

এক সেকেণ্ড পর অফ করে দেয়া হলো স্পিকারের সুইচ ।

রানা হতবাক হয়ে ভাবল, এইমাত্র মৃত্যু ছিল খুব কাছে, পরের সেকেণ্ডে উধাও হয়েছে সব ব্যথা-যন্ত্রণা-কষ্ট । এখন আছে শুধু অসীম ক্লান্তি । সৈকতে চুপ করে পড়ে রইল রানা, শ্বাস নিতেও যেন খাটুনি লাগছে ।

দৌড়ে এসে হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ল জ্যাসিণ্টা । দুই হাতে তুলতে চাইল রানাকে । না পেরে কাত করল ওকে । ‘তুমি ঠিক আছ তো, রানা? আর কোনও ব্যথা নেই তো?’

জবাবে শুধু সামান্য মাথা নাড়ল রানা ।

‘চুপ করে শুয়ে থাকো । খুব করুণ অবস্থা তোমার চোখ-মুখের ।’

‘তেমনই লাগছে দেখে?’ রানার কণ্ঠ থেকে বেরোল ব্যাণ্ডের ডাকের মত আওয়াজ ।

‘হুঁ ।’

‘ঠিকই ধরেছ,’ ভাবল রানা । মুখে বলল, ‘আমি ঠিক আছি ।’

‘তোমার মত জেদী লোক আমি আর দেখিনি,’ উঠে বসতে রানাকে সাহায্য করল জ্যাসিণ্টা । ‘বুঝে গেছি, সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও পান্ডা দিতে চাও না তুমি ।’ www.boighar.com

‘কতক্ষণ চালু ছিল ওই মেশিন?’ সাবধানে উঠে দাঁড়াল রানা ।

‘তিন সেকেণ্ড ।’

কয় কী বোকা ছেমড়ি! —ভাবল রানা । ওর ধারণা: অনন্তকাল ধরে ওকে নরকে আটকে দুরমুশ করা হয়েছে ।

পেইন মেকার মেশিন বন্ধ করে দেয়ার পর অলস পায়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল ডুডু, মুখ হাসি-হাসি । ‘আগেও বলেছি, আপনি সত্যিই অদ্ভুত মানুষ, মিস্টার রানা ।’

‘আর অদ্ভুত মানুষ বলেই এবার আরেকটা অনুরোধ করব,’ বলল রানা । ‘আশা করি অবাক হবেন না ।’

‘জানতে পারি সেই অনুরোধটা কী?’ বলল ডুডু ।

‘আমার একটা নৌকা দরকার,’ বলল রানা । ‘সঙ্গে বারোটা রাইফেল, আর একটা পেইন মেকার মেশিন ।’

‘আপনি আপনার বন্ধুদের মুক্ত করে আনতে চান,’ আন্দাজ করল ডুডু ।

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা ।

চওড়া হাসি দিল উনিশতম ক্যুভেল্ট । ‘কী করে ভাবলেন এত বড় বিপদে আপনাকে একা যেতে দেব আমরা?’

বিশ

মিশরে দি টেম্পল অভ হোরাসের গার্ডদের অফিস খুঁজে পাওয়ার পর থেকে কপাল মন্দ হতে শুরু করেছে সোহেলের । প্রথমে বৃষ্টির ভিতর গার্ডদের কুটিরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলো না মিশরীয় আর্মির কোনও অফিসার । আর তারপর যখন এল এক অফিসার, সে কথা বলতে চাইল আরবি ভাষায় । বাধ্য হয়ে মন্দিরের গার্ডের মাধ্যমে কথা বলতে হয়েছে সোহেলকে । খুব

কঠিন হয়ে উঠল পরিস্থিতি বোঝানো। দোভাষীর অদক্ষতার কারণে হারিয়ে গেল ওর দেয়া জরুরি সব তথ্য।

কিছুক্ষণের ভিতর সোহেলের কথা শুনতে শুনতে কপালে চোখ তুলল আর্মির লোকটা। ভীষণ বিরক্ত আর হতবাক হয়ে পড়ল সে।

আর সোহেল যখন বারবার করে বলল, আর্মি যত দেরি করবে, তত বাড়বে বিপদ— চিৎকার জুড়ে দিল লোকটা। তর্জনী তুলে কঠিন অভিযোগ হানল। তার ধারণা, সোহেলের মত অস্ত্র চোরাকারবারীর জন্যই মস্ত বিপদে পড়ছে মিশর।

বার্তাবাহক এভাবেই খুন হয়, তিক্ত মনে ভাবল সোহেল।

এরপর অস্ত্রের মুখে গার্ডের কুটির থেকে বের করে তুলে দেয়া হলো ওকে একটা ভ্যানের পিছনে। ওই ভ্যান গিয়ে থামল আর্মির এক জেলখানায়। ওখানেই জীবনে প্রথমবারের মত প্রায় তেলাপোকার সমান আকারের ছারপোকা দেখল সোহেল কটের কম্বলে। বিরক্ত হয়ে ভাবল, শালারা জানেও না, বাঁধের ওদিক থেকে হুড়মুড় করে নেমে আসবে দশ ট্রিলিয়ন গ্যালন পানি। শালারাও মরবে, আমাদেরও মরবে। পানির ধাক্কা খেয়ে উপড়ে ভেসে যাবে আর্মির এই জেলখানা।

সোহেলের কপাল খুলল রাত চারটের শিফটে বদলি লোক আসবার পর। তাদের সঙ্গে এল এক অফিসার। বেশ ভাল ইংরেজি জানে।

মেজর লুৎফর হোসেইনির পরনে হলদে মিলিটারি ফেটিগ, ভাল কোনও পদক নেই বুকে। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। চুল ত্রু কাট। নাক বাজপাখির চঞ্চুর মত বাঁকা। ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ। তার চেহারা দেখে আরেকটু হলে সোহেল ভাবত, শেষে এই দেশে এসেই চাকরি নিয়েছে নায়ক রাজ ক্লার্ক গেইবল!

আরামদায়ক চেয়ারে বসে দুই পা মস্ত টেবিলে তুলে একটা

সিগারেট ধরাল লুৎফর হোসেইনি। দুই আঙুলের মাঝে সিগারেট রেখে প্রথমবারের মত মুখ খুলল সে। সোহেল দেখল, একবারও ধোঁয়া গিলছে না সে। ওর লোভ হলো কিন্তু চাইল না একটা শলাও।

‘আলাপের শুরুতেই বলে রাখি,’ বলল মেজর, ‘আমাকে জানানো হয়েছে, তোমার নাম সোহেল আহমেদ। একজন বিদেশি। তোমার মত অনেকেই এই দেশে চাকরি খুঁজতে আসে। কিন্তু তারা তোমার মত এতটা নির্জলা মিথ্যা বলে না। তোমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই, একটাও না। বারবার বলেছ, তুমি বেআইনীভাবে এ দেশে ঢুকেছ। তোমার কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা নেই। কোনও ডকুমেন্ট? তা-ও নেই। এমন কী ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ক্রেডিট কার্ড, কিচ্ছু না। তুমি আসলে কোনও মানুষের পর্যায়েই পড়ো না। তোমার চেয়ে মধ্যবিত্ত বাড়ির একটা কুত্তারও দাম বেশি।’

ব্যাটা আমাকে বুটের নীচে মেঝের সঙ্গে পিষে ফেলছে, ভাবল সোহেল। রাগ দমিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ‘আমি কিন্তু নিজের ইচ্ছায় এই দেশে আসিনি। বন্দি ছিলাম। আর ওই টেরোরিস্টরা উড়িয়ে দেবে আপনাদের আসওয়ান ড্যাম। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে এসেছি এসব আপনাদের জানাতে। আর আপনারা এমন ভাব করছেন, যেন আমি কোনও মানুষই নই।’

‘আসলে কী বলতে চাও?’ কড়া চোখে সোহেলকে দেখল মেজর।

‘আপনারা গাধার চেয়েও গাধা, নইলে এতক্ষণে ড্যাম রক্ষা করার কাজে নেমে পড়তেন।’

বুটের ধুপ্ আওয়াজ তুলে দুই পা মেঝেতে নামাল মেজর। সোহেলের মনে হলো, এবার ব্যাটা একটা টান দেবে সিগারেটে। কিন্তু তা না করে চেয়ার ছেড়ে শিকের সামনে চলে এল সে।

‘তুমি এসেছ আমাদের রক্ষা করতে? অ্যা?’

‘ইয়েমেনের টেরোরিস্টরা ওই ড্যাম ভেঙে দেবে।’

‘ড্যাম?’ হাসল লুৎফর হোসেইনি। ‘আসওয়ান হাই ড্যাম?’

‘হ্যাঁ।’

‘তুমি ওই ড্যাম দেখেছ?’

‘ছবি দেখেছি।’

‘ওই ড্যাম কী দিয়ে তৈরি, তা জানো?’

‘জানি।’

‘পাথর আর কংক্রিটের,’ গর্ব মেজরের কণ্ঠে, ‘ওটার ওজন মিলিয়ন মিলিয়ন টন। ভিত্তি দু’হাজার ফুট চওড়া। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ডিনামাইট ফাটলেও কিছুই হবে না ওটার।’

‘একটা সিগারেট দিন,’ বলল গম্ভীর সোহেল।

‘বন্দিদের সিগারেট দেয়ার নিয়ম নেই।’ প্রথমবারের মত ধোঁয়া গিলল সে। ‘কারও সাধ্য নেই ওই ড্যাম ভাঙবে।’

‘উড়ে যাবে ভিত্তির কাছ থেকে,’ বলল সোহেল।

‘কী করে?’ ভুরু কুঁচকে বন্দিকে দেখল মেজর।

‘আগে একটা সিগারেট ছাড়ুন।’ মেজরকে মাথা নাড়তে দেখে হাসল, ‘বাংলাদেশের নাম শুনেছেন কোনওদিন?’

‘হ্যাঁ। শুনেছি। তাতে কী?’

‘আমার নাম শুধু সোহেল আহমেদ নয়। আমি বাংলাদেশ আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল,’ আস্তে করে বলল, ‘ছিলাম।’

‘কী? কী বললেন? ব্রিগেডিয়ার জেনারেল?’ সতর্ক হয়ে গেছে মেজর। বুক পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট সোহেলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

‘ধন্যবাদ,’ ওটা নিয়ে বলল গম্ভীর সোহেল, ‘একটু আগুনও লাগবে।’

‘যদি জানতে পারি আপনি মিথ্যা বলেছেন, পিটিয়ে কিন্তু শ্রেফ হাগিয়ে দেব,’ ম্যাচ দিল মেজর।

আয়াস করে সিগারেট ধরাল সোহেল, বুক ভরে দামি সিগারেটের ধোঁয়া টেনে নিয়ে বলল, ‘ভাল ব্র্যাণ্ড!’ নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, ‘বাংলাদেশ আর্মিতে যোগাযোগ করলেই জানবেন মিথ্যা বলছি কি না।’

‘আবার আসা যাক ড্যামের প্রসঙ্গে,’ বলল মেজর হোসেইনি।

‘প্রথমে ওটার পানির ওপরের দিকে একটা চ্যানেল তৈরি করবে,’ বলল সোহেল। ‘অনেক নীচেও কাটবে আরেকটা সুড়ঙ্গ।’

‘এসব করবে কী দিয়ে?’ বাঙালি লোকটা বোধহয় নিশ্চিত হয়েই কথা বলছে, অস্বস্তি লাগতে শুরু করেছে মেজরের।

ড্যাম সম্পর্কে যা জেনেছে, বলতে লাগল সোহেল।

পাঁচ মিনিট পর সামান্য হাঁ হয়ে গেল মেজরের মুখ। ‘আর তারপর? আরও বিস্তারিতভাবে বলুন!’

আবারও মুখ খুলবার আগে কী বলা উচিত তা ভাবল সোহেল। বুঝতে পারছে না কীভাবে জানাবে, চোখে দেখা যায় না এমন সব খুদে মেশিন ভাঙবে অত বড় বাঁধ। মেজর হয়তো হো-হো করে হেসে ফেলবে। আর লোকটা একবার ওর কথা উড়িয়ে দিলেই সর্বনাশ।

‘আগে একটা ফোন করতে পারি?’ সহজ সুরে জানতে চাইল সোহেল।

বাংলাদেশ এম্বেসি বা বিসিআই-এ যোগাযোগ করলে সব অনেক সহজ হবে ওর জন্য। বাংলাদেশ সরকার থেকে জানিয়ে দেয়া হবে, সত্যিই মস্ত বিপদে আছে কায়রোর লাখ লাখ মানুষ।

‘আপনাদের দেশের জেলখানায় বন্দিদের ফোন করার সুযোগ দেয়া হয় কি না, তা আমার জানা নেই,’ বলল মেজর। ‘কিন্তু এখানে নিয়ম নেই। আপনি উকিলও পাবেন না এখানে।’

‘বুঝলাম।’ অন্য কৌশল ধরল সোহেল, ‘ড্যামের কাছে পাঁচটা ট্রাক ছিল। পিছনের মাল তারপুলিন দিয়ে ঢাকা। উত্তর দিকে এসেছে এসব ট্রাক। প্রতিটার পেছনে অনেকগুলো হলুদ রঙের ড্রাম। ভিতরে বালির মত রূপালি এক জিনিস। যদি ওসব ড্রাম বাজেয়াপ্ত করেন, বা ধরতে পারেন ট্রাকের ড্রাইভারদেরকে—অনেক কিছুই জানতে পারবেন। তাদেরও ভিসা, পাসপোর্ট বা ক্রেডিট কার্ড কিছু নেই। এসেছে ইয়েমেন থেকে।’

‘তাই?’ উজ্জ্বল আলোর নীচে নোটপ্যাড ধরল মেজর। ‘ইয়েমেন থেকে এসেছে রহস্যময় পাঁচটা ট্রাক। আপনি প্রথমবার বলার পর থেকেই ওগুলো খুঁজেছি আমরা। আকাশ থেকে দেখা হয়েছে। সড়ক পথে ব্যারিকেড করা হয়েছে। কোথাও পাওয়া যায়নি ওসব ট্রাক। এদিকে এমন কোনও বড় ওয়্যারহাউসও নেই যে লুকিয়ে রাখবে। মার্সা আলমের দিকেও নেই। তা হলে কী এমন হতে পারে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ আসলে কেউই নয়, আর ওইসব ট্রাক আছে শুধু তার কল্পনায়?’

মনে মনে খুব হতাশ হয়েছে সোহেল। কোথায় গেল পাঁচটা মস্ত ট্রাক? কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে মেজরের লোকদের।

নোটপ্যাড সরিয়ে রাখল মেজর। ‘আসলে কী চান আপনি, বলুন তো? আমাদের কোনও পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছেন?’

www.boighar.com

‘আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই,’ বলল সোহেল। ‘একটা কাজ করুন, নিজে একবার দেখে আসুন ওই ড্যাম।’

‘ওখানে গিয়ে কী দেখব?’

‘খেয়াল করলে দেখবেন ওখানে সত্যিই ফাটল ধরেছে, ক্ষতি করা হয়েছে ড্যামের,’ বলল সোহেল, ‘ঠিকই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়বে।’

কয়েক মুহূর্ত ভাবল মেজর হোসেইনি, তারপর বলল, ‘বেশ।

তাই করব। ভাল বুদ্ধি দিয়েছেন।’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ। আমরা তাই করব।’

‘আমরা মানে?’

‘হ্যাঁ, আপনিও আসছেন আমার সঙ্গে। আমাকে দেখিয়ে দেবেন কী দেখাতে চান।’ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল মেজর, ‘গার্ডস!’

খুলে গেল অফিসের দরজা।

ভিতরে ঢুকল দুই মিশরীয় এমপি।

‘এই লোকের হাত-পায়ে ভালভাবে হ্যাণ্ডকাফ আর শেকল লাগাও। নিয়ে যাবে ডকে। তাকে নিয়ে ঘুরতে বেরোব আমি।’

সেল খুলে সোহেলের দু’হাতে আটকে দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফ, গোড়ালিতে লোহার শিকলের বেড়ি।

‘যাওয়ার পর দেখা যাবে কোনওকালেই ভাঙবে না ওই বাঁধ,’ নিশ্চিত সুরে বলল মেজর হোসেইনি, ‘প্রমাণ হবে আপনি একটা প্রতারক। আর তখন, আগেই বলেছি, পিটিয়ে আপনার পেট থেকে সব মাল বের করে দেব আমি। আপনি-আপনি করেও সম্বোধন করব না, পেটাতে শুরু করে বলব: তুই শালা সত্যিই বাংলাদেশের কলঙ্ক!’

একুশ

বিশ মিনিট পর প্যাট্রল বোটে তুলে দেয়া হলো বন্দি সোহেলকে।

মৃদু আওয়াজ তুলে চালু হলো বোটের ইঞ্জিন, আঁধার নীল নদ ধরে চলল উজানে।

একের পর এক নির্দেশ দিল মিশরীয় মেজর, সেই অনুযায়ী বোট চালাল এক সৈনিক। আর তৃতীয় সৈনিক থাকল সোহেলের পাশে, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

রাতের বাতাস শীতল, ভেজা। কেটে গেছে মেঘ, আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র। এত রাতে নদে জলযান নেই বললেই চলে। উপত্যকা আর নদের পারের হোটেল বা অন্য সব স্থাপনা ঝিলমিল করছে রঙিন আলোয়। শত শত ফ্লাডলাইট রাতের ফুটবল স্টেডিয়াম বানিয়ে রেখেছে প্রকাণ্ড আসওয়ান বাঁধকে।

মোটোও আমেরিকার হুভার ড্যামের মত নয় এটা, মিশে আছে প্রকৃতির মাঝে। কয়েক ধরনের পাথর, বালি, কাদামাটি, সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। উপত্যকার সরু একপাশে আকাশে মাথা তুলেছে প্রকাণ্ড দেয়াল, যেন কোনও ঢালু, বিশাল র‍্যাম্প, মরুভূমির মতই ধূসর।

বাইরে পাতলা কংক্রিটের আস্তরণ, ওটাই ঠেকিয়ে রাখবে ভিতরের ক্ষয়। সেখানে আছে সন্নিবিষ্ট পাথর আর বালি, তারপর ওয়াটারপ্রুফ পুরু কাদার কোর, নেমে গেছে কংক্রিটের কাঠামো পর্যন্ত। শেষের আস্তর কাজ করছে কাটঅফ কার্টেন হিসাবে।

বাঁধের ওপাশে তিন শ' ফুট গভীর পানির মস্ত লেক নাসের।

‘ড্যামের ওদিক বা উপর থেকে দেখলেই ভাল হতো,’ বলল সোহেল।

মাথা নাড়ল মেজর। ‘আমরা না ফাটল খুঁজছি? ওদিক থেকে দেখলে হবে কেন! ওখানে সবই তো পানির নীচে।’

‘ক্যামেরা আর আরওভি নেই?’

‘না, নেই। এদিক থেকে বাঁধ দেখব। যা দেখাবার দেখাতে হবে আপনাকে। আর যদি কিছু দেখাতে না পারেন, আমার সময়

নষ্ট করেছেন বলে... বুঝতেই পারছেন কী করব।’

‘শালা,’ বিড়বিড় করল সোহেল। গম্ভীর মুখে বলল, ‘নিশ্চয়ই তা-ই করবেন, কিন্তু এই বাঁধ থেকে অনেক দূরে কোথাও নিয়ে তারপর— ঠিক আছে?’

ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে বোট, ঢুকে পড়েছে বাঁধের সামনের আধ মাইল রেস্ট্রিকটেড যোনে। ষাটের দশকে সোভিয়েতদের সহায়তা নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বাঁধের বিশেষ দুটো সেকশন। পশ্চিমে চওড়া, ঢালু দেয়ালের মত বাঁধ। পূবে পাথর-বালির তৈরি ত্রিকোণ পেনিনসুলায় হাই-টেনশন লাইন ও ট্রান্সফর্মার। ওখানেই খাড়া কংক্রিটের দেয়াল, মাঝে পানি কমিয়ে নেয়ার স্পিলওয়ে, পিছনে সরু খালের মত টেইলরেস। ওদিক দিয়ে হড়হড় করে পানি নেমে ঘোরায় টারবাইন। নিজের কাজ শেষ করে নীচের নীল নদে নামবে খালের পানি।

সোহেল খেয়াল করল, টেইলরেসের পানি প্রায় শান্ত। জানতে চাইল, ‘বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে না?’

‘স্পিলওয়ে সামান্য খোলা,’ বলল মেজর লুৎফর, ‘রাতে পুরো বিদ্যুৎ লাগে না। চাহিদা বিকেলের আগে, তখন ব্যবসায়ীদের লাগে এয়ার কন্ডিশনার আর কমার্শিয়াল লাইটিং।’

বাঁধের কাছে চলে এসেছে ওরা। ডান পাশ থেকে চলেছে ঢালু দেয়ালের দিকে। ওই প্রকাণ্ড বাঁধ দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না সোহেল। যা ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেক চওড়া, সমতল ও মস্তু র‍্যাম্প। পাহাড়ের ঢালের মত নেমে এসেছে নদের বুকে। ভাবা কঠিন, এই জিনিস তৈরি করেছে মানুষ।

‘কত পুরু যেন বলেছিলেন, মেজর?’

‘ভিত্তি নয় শ’ আশি মিটার।’

প্রায় এক কিলোমিটার, ভাবল সোহেল। এখন বুঝতে পারছে, কেন এত নিশ্চিত মিশরীয় মেজর। কিন্তু একটা কথা জানে না

সে। অনেক দূর এগিয়েছে ন্যানোবট গবেষণা। সোহেল ইয়েমেনে নিজ চোখে দেখেছে, কীভাবে ভেঙে পড়েছে মডেল বাঁধ।

‘এত নীচে থেকে কিছুই দেখব না,’ বলল ও। ‘ওপরে উঠে ড্যামে লোক নামাতে হবে। তা হলে দেখা যাবে কোথায় লিকেজ শুরু হয়েছে।’

বিরক্ত চোখে সোহেলকে দেখল মেজর। ‘আমি কিন্তু আপনাকে ভালভাবেই ঘুরিয়ে দেখালাম। পেলেন কোনও ফাটল? খামোকা নষ্ট করছেন আমাদের সময়। আপনি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। জানেন, এজন্যে জেলে পচবেন বাকি জীবন? আর জেলে নিয়মিত পেটানো হবে আপনাকে...’

চুপ হয়ে গেল মেজর। সোহেলের দিকে চেয়ে নেই আর, চোখ বাঁধের ঢালু দেয়ালে। এখন বাঁধ থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে ওরা।

মেজরের চোখ অনুসরণ করে ওদিকে চাইল সোহেল। নীল নদের শেষে, বাঁধের দেয়ালে সরু পানির তীরের মত একটা রেখা। অথচ ওখানে নিরেট থাকার কথা দেয়াল। কুলকুল করে নামছে পানির স্রোত। শান্ত নদের ছোট একটা জায়গা করে তুলছে বিক্ষুব্ধ। প্লাবন হওয়ার মত যথেষ্ট পানি পড়ছে না। যে কেউ বলবে, উপরে খুলে দেয়া হয়েছে কোনও স্পিগট।

‘সর্বনাশ,’ বিড়বিড় করল সোহেল।

‘আরও কাছে চলো,’ নির্দেশ দিল মেজর। বোটের বো-তে গিয়ে থামল সে।

সৈনিক সামান্য থ্রটল খুলে দিতে সামনে বাড়ল বোট। কয়েক সেকেন্ডে ওরা পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। প্যাট্রল বোটের দুটো জোরালো সার্চ লাইটের আলো গিয়ে পড়ল বাঁধের দেয়াল বেয়ে নেমে আসা পানির স্রোতের উপর।

‘তোড় বাড়ছে,’ ঢালু দেয়ালে চোখ রেখে বলল সোহেল।

একটা সার্চ লাইট ওদিকে তাক করল মেজর। বিড়বিড় করে বলল, ‘এ কী সত্যি?’

‘না, আপনার চোখ ভুল দেখছে,’ টিটকারি মারল সোহেল। ‘চোখ খুলুন, মেজর। আমরা মস্ত বিপদে আছি। পুরো উপত্যকা ভেসে যাবে ভয়ঙ্কর প্লাবনে।’

হতভম্ব চোখে সোহেলকে দেখল মেজর। ‘কিন্তু... এত ছোট ফাটলের কারণে...’

‘বাড়বে আরও,’ বলল সোহেল, ‘খেয়াল করেছেন কোথা থেকে শুরু হয়েছে?’

‘না।’ পানির উৎস খুঁজছে মেজর। অত উপরে আবছা হয়ে গেছে সার্চ লাইটের আলো। পরিষ্কার দেখা গেল না।

‘সতর্ক করুন সবাইকে,’ তাড়া দিল সোহেল। ‘বলে দিন সবাই যেন নীল নদের তীর থেকে সরে যায়।’

‘তাতে প্যানিক তৈরি হবে,’ আপত্তির সুরে বলল মেজর। ‘আর আপনার কথা যদি না ফলে?’

‘ফলবে, নিশ্চিত থাকুন।’

‘নিশ্চিত থাকব? আপনি, ভাই, সত্যিই পাগল!’ সারা শরীরে অবশ একটা অনুভূতি হচ্ছে মেজর হোসেইনির। কী কুরবে বুঝতে পারছে না।

‘আমার শেকল খুলে দিন,’ বলল সোহেল। ‘তারপর চলুন যাই ফাটলের উৎসে। হয়তো কোনওভাবে ঠেকাতে পারব।’

কথা বলে সময় নষ্ট করছে ওরা, আর ওদিকে ধীরে ধীরে বাড়ছে পানির তোড়। এখন পড়ছে দুটো স্পিগট খুলে দেয়ার মত বেগে।

‘মেজর, সিদ্ধান্ত নিতে আপনি খামোকা দেরি করছেন,’ কড়া সুরে বলল সোহেল।

মনে হলো স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠল মেজর। গার্ডের কাছ থেকে

চাবি নিয়ে খুলে দিল সোহেলের হ্যাণ্ডকাফ, তালা খুলে সরিয়ে ফেলল ওর পায়ের বেড়ি।

‘চলুন, যাওয়া যাক,’ তৎপর হয়ে উঠেছে মেজর। খপ্ করে হাতে তুলে নিল ওয়াকি-টকি।

বোট থেকে বাঁধের পাশে নামল ওরা। মেজরের পাশে ছুটছে সোহেল, দৌড়াতে শুরু করে উঠছে ওরা বাঁধের উপরের দিকে। ওদিকেই রয়েছে ফুটো বা ফাটল। ঝরঝর করে পড়ছে পানি।

আসওয়ান ড্যামের এদিকটা মাত্র তেরো ডিগ্রি ঢালু। ভাল দৌড়বিদ ছুটে উঠে যেতে পারবে বাঁধের কাঁধে। সাত শ’ ফুট দৌড়ে নব্বুই ফুট উঠে হাঁপিয়ে গেল মিশরীয় মেজর, তবুও খোঁজ পাওয়া গেল না পানির উৎস।

‘পানি আরও অনেক বেশি পড়ছে,’ থেমে গেল সে।

ওই স্রোতের সঙ্গে মিহি বালি আর ছোট পাথর পড়ছে, দেখল সোহেল। ক্ষয় হতে শুরু করেছে মস্ত বাঁধ।

‘আরও অনেক ওপরে উঠতে হবে,’ বলল সোহেল।

মাথা দোলাল মেজর।

আবারও দৌড় লাগাল দু’জন। বাঁধের কাঁধে উঠবার পঞ্চাশ ফুট আগে দেখল, ছয় ফুট চওড়া নালা দিয়ে পড়ছে পানির ধারা। সাদা ফেনার সঙ্গে ছিটকে যাচ্ছে ছোট সব পাথর। হঠাৎ করেই ধসে গেল একদিকের দেয়াল। দ্বিগুণ বাড়ল পানির স্রোত। এবার ভাসিয়ে নেবে সোহেল আর মেজরকে।

‘সাবধান!’ হ্যাঁচকা টানে মেজরকে সরিয়ে নিল সোহেল।

এখন আর কেউ বলবে না ভেঙে পড়ছে না বাঁধ।

মুখের কাছে রেডিয়ো ধরল মেজর, টক সুইচ অন করে বলতে শুরু করল, ‘মেজর হোসেইনি বলছি। প্রতিটা অ্যালার্ম বাজাও! দেরি না করে শুরু করো ফুল ইভ্যাকিউয়েশন! ড্যাম ভেঙে পড়তে শুরু করেছে!’

ওদিক থেকে কী যেন বলল জবাবে, সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিল মেজর, ‘আরে তা না, গাধা! এটা ড্রিল না! ফলস্ অ্যালার্মের খ্যাতা পুড়ি! রিপিট করছি: পুরো ড্যাম ভেঙে পড়ছে!’

তখনই হঠাৎ ধসে গেল বাঁধের উপরের বড় একটা অংশ, ঢালু দেয়াল বেয়ে ঝড়ের গতিতে নেমে এল ফেনায়িত পানির ক্ষিপ্ত স্রোত। এখনও মেজরের কথায় কেউ কান না দিয়ে থাকলে, জানালা দিয়ে একবার বাইরে চাইলেই বুঝবে যা বুঝবার।

তখনই দূরের আঁধারে হাহাকার করে উঠল অ্যালার্ম। মনে হলো বেজে উঠেছে এয়ার রেইড সাইরেন।

অনেক নীচে দক্ষিণ লক্ষ্য করে তুমুল গতি তুলে রওনা হয়ে গেল প্যাট্রল বোট। পানি পড়বার আওয়াজের উপর দিয়ে চিৎকার করল মেজর, ‘হারামজাদারা কাপুরুষ!’

দুই সৈনিককে দোষ দিতে পারল না সোহেল। তবে এটাও ঠিক, মেজর আর ওকে বেকায়দা অবস্থায় ফেলে পালাচ্ছে তারা। ওদের পায়ে নীচে মৃদু কাঁপছে ড্যাম। গোটা স্ট্রাকচার সত্যিই প্রকাণ্ড, আর মাত্র পনেরো ফুট ফাটল ধরেছে; কিন্তু নিরাপদ জায়গা থেকে অনেক দূরে ওরা দু’জন।

‘আসুন, মেজর!’ খপ্প করে লুৎফর হোসেইনির কাঁধ খামচে ধরল সোহেল, ঘুরেই দৌড়াতে লাগল। ‘বাঁধের ওপরে উঠতে হবে, নইলে বাঁচব না কেউ!’

বাইশ

ভারত মহাসাগর আর আরব সাগর-ভীরের মিশরে ভর করেছে একই নিশ্চিতি, কালো রাত। কিন্তু দুই এলাকার মধ্যে রয়েছে ছোট্ট একটি তফাৎ। মিশরের আকাশ থেকে সরে গেছে বৃষ্টিঝরা মেঘ, এদিকে ঘন কালো মেঘ জমেছে সাগরের আকাশে। আর এই কারণেই ভোরের দু'ঘণ্টা আগে আকাশে একটা নক্ষত্রও দেখল না রানা।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে পনেরো ফুট লম্বা নৌকার সামনের অংশে। সত্তর বছর আগের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটা সেক্সটেন্ট আর হলদে হয়ে যাওয়া মথখাওয়া চার্ট ব্যবহার করে ন্যাভিগেট করছে ভারত মহাসাগরের মাঝে।

পাশে পাল টাঙাবার কাঠের লম্বা দণ্ডসহ রানার নৌকা যেন বিখ্যাত কনটিকি নৌকা আর পাঁচ যাত্রী বহনকারী হাওয়াইন ক্যানুর সংমিশ্রণ। ছোট জলযানের তুলনায় বেশ উঁচু বো, মাঝে পেট বেশ চওড়া। একেবারে পিছনে চারকোনা স্টার্ন। গতি তুলছে বৈঠা আর অদ্ভুত ত্রিকোণ পালের কারণে। একপাশের ওই পাল পরিচিত ক্র্যাব ক্ল নামে।

প্রাচীন আমলের কাঁকড়ার থাবা পাল, হাজার বছর ধরেই টেনে চলেছে ছোট সব নৌকা। তবে এই নৌকার সামনে দশ ফুট দৈর্ঘ্যের গোল ফুলে ওঠা পাল যোগ করেছে রানা। ওটা আধুনিক পাল, অনেকটা হাতে বানানো পালের মত। চিলের দীর্ঘ ডানা

যেন, হাওয়ার জোরে টেনে নিয়ে চলেছে নৌকা ।

রানার পিছনে আরও চারটে নৌকা ।

এই নৌকাবহর রওনা হয়েছে উইলি আইল্যাণ্ড থেকে ।

রানার পরিকল্পনা সহজ । গোপনে উঠবে ওরা ভাসমান দ্বীপে ।
রয়েছে উনিশজন সৈনিক । এ ছাড়া পেইন মেকার মেশিন চালাবার
জন্যে পাঁচজন দ্বীপবাসী । রানার সঙ্গে এসেছে জ্যাসিণ্টা আর
ইউনুসও ।

জ্যাসিণ্টা জেদ ধরেছে বলে বাধ্য হয়ে তাকে এনেছে রানা ।
আর ইউনুসকে বলেছিল, ‘দ্বীপে থেকে যাও । ঝুঁকি নেয়ার দরকার
নেই ।’

জবাবে ইউনুস বলেছে, ‘ভাই, আমাকে গাদ্দার ভাববেন না ।
বাধ্য হয়ে আমার মত অনিচ্ছুক কয়েকজন এসেছে জায়েদ বিন
মনযুরের সঙ্গে । জানলে প্রথম সুযোগেই লড়াই থেকে সরে যাবে
ওরা । একটা সুযোগ দিন ওদেরকে বাঁচাবার ।’

রানার মনে হয়নি বিশ্বাসঘাতকতা করবে যুবক । আর সত্যিই
যদি কয়েকজনকে সরিয়ে নিতে পারে, নানান দিকে সুবিধা পাবে
ওর দলের সবাই । বাড়তি অন্তত বিশটা রাইফেল নিয়েছে ওরা ।
সবাই লড়তে প্রস্তুত ।

সেক্সটেন্ট নিচু করল রানা ।

‘কপাল খুলল?’ সংক্ষেপে জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা ।

‘না,’ মাথা নাড়ল রানা । ‘অন্ধের মত চলছি ।’ বো থেকে
পিছিয়ে গেল । সরিয়ে রাখল সেক্সটেন্ট । ডুডুকে বলল, ‘আপাতত
এই দিকেই চলুন ।’

মৃদু মাথা দোলল ডুডু ।

নৌকার হাল ধরেছে ওর ভাতিজা টামাক ।

বাতাস ছিল বলে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় তরতর করে
চলেছে নৌকা । একবারের জন্য দিক পাল্টে নেয়নি হাওয়া ।

এক সময় বিদায় নিয়েছে দিনের আলো। তারপর রাতে এসেছে
ভীর থেকে হাওয়া। অথচ, এমন হওয়ার কথা নয় খোলা সাগরে।
এর অর্থ জানে রানা, তার ন্যানোবট দিয়ে সাগরের পরিবেশ
পাল্টে নিচ্ছে জায়েদ।

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল জ্যাসিন্টা, ‘তুমি চিন্তিত।’

‘হয়তো পাল তুলে এমন দিকে চলেছি, যেখানে কোনও কূলই
নেই,’ বলল রানা।

এস.এস. ভিক্টর কেইনের পুরনো চার্ট দেখল।

উইলি দ্বীপের নির্দিষ্ট পযিশন বের করে চার্টে দাগ দিয়েছেন
ক্যাপ্টেন। কিন্তু ম্যাপে আসলে ওখানে শুধু নীল সাগর। ইউ.এস.
লিখে মাত্র দুটো দ্বীপ এঁকেছেন উইলি মস্ত সাগরে। বোঝাতে
চেয়েছেন ওই দুই দ্বীপ এখন থেকে আমেরিকার হয়ে গেল।

রানার কাঁধের উপর দিয়ে চার্ট দেখল জ্যাসিন্টা। ‘আমরা
কোথায়?’

ম্যাপে আঙুল ঠুকল রানা। ‘আন্দাজ এখানে।’

‘আর দি আইল্যান্ড?’

‘সেটাই এখন প্রশ্ন,’ বিড়বিড় করে বলল রানা।

পেইন মেকার মেশিন পাওয়ার পর প্রথমেই গিয়ে চার্ট
দেখেছে ও। আন্দাজ আর ক্যালকুলেশনের উপর ভর করে ধারণা
করেছে, দি আইল্যান্ড কোথায় থাকতে পারে। আর এটাই মস্ত বড়
ভুল। উইলি দ্বীপের অবস্থান আর বাতাসের বেগ হিসাব কষে ওর
মনে হয়েছে, সঠিক সময়ে রওনা হলে ভোরের আগেই পৌঁছবে দি
আইল্যান্ডে। আর এখন ভোর হতে মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি।

পরদিন সন্ধ্যায় রওনা হলে সকালে পৌঁছত ভাসমান দ্বীপে।
তা হতো স্রেফ আত্মহত্যা। আগের চব্বিশ ঘণ্টায় বহু কিছুই ঘটে
যেত। রানার মনের মধ্যে সারাক্ষণ খচ্ খচ্ করছে: জায়েদের
মুঠোর ভিতর রয়েছে আসিফ-তানিয়া আর বৈজ্ঞানিক ম্যানিনি।

সবাইকে খুন করে, তার লোকজন নিয়ে *দি আইল্যাণ্ড* ত্যাগ করে
উধাও হতে পারবে লোকটা। এসব ভেবেই দেরি না করে আজ
বিকেলে সাগরে নৌকা ভাসিয়েছে রানা।

যা আশা করেছে, তার চেয়ে ঢের ভাল চলেছে এসব নৌকা।
হাওয়া পাওয়া গেছে নিজেদের পক্ষে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই
পাড়ি দিয়েছে অনেক পথ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সবই বৃথা।
সম্ভবত মস্ত সাগরে হারিয়ে গেছে ওরা। কাছেপিঠে কোথাও নেই
রবার্তো ম্যানিনির ধাতব দ্বীপ।

চাট দেখল রানা। ‘সরে গিয়ে না থাকলে, শেষ যখন *দি
আইল্যাণ্ডকে* দেখি, ওটা ঠিক এখানেই ভাসছিল।’

‘আমি দূরে আলো দেখছি,’ হঠাৎ নড়েচড়ে বসল ডুডুর
ভাতিজা টামাক। ‘নৌকার সামনের বামদিকে!’

পোর্ট সাইডে ঘুরে গেল সবার চোখ। আন্দাজ তিন মাইল
দূরে টিমটিম করছে বাতি। কুয়াশার ভিতর যেন ভুতুড়ে কোনও
জাহাজ। কিন্তু তা নয়, এটা প্রকাণ্ড। রবার্তো ম্যানিনির দ্বীপ। ডুবে
আছে অন্ধকারে। আলো বলতে মাত্র কয়েকটা বালবের হলদেটে
আভা।

‘কী যেন বলছিলে, রানা?’ হেসে ফেলল জ্যাসিন্টা।

‘কিছু বলছিলাম নাকি?’ টামাকের দিকে চাইল রানা। ‘উত্তর-
পূবে চলো।’

পাল আর হাল ঠিক দিকে সেট করল ডুডু ও তার ভাতিজা।
উত্তর-পূবে চলল নৌকা। রানাদের পিছু নিল বাকি নৌকাগুলো।

‘পাল তুলে সরাসরি যাচ্ছি না কেন?’ জিজ্ঞেস করল
জ্যাসিন্টা।

বেয়ারিঙে চোখ রেখেছে রানা। হিসাব কমছে।

‘আধ মাইল উত্তর-পূবে যাওয়ার পর, সরাসরি হাওয়া পেয়ে
ওই দ্বীপের পিছনে পৌঁছে যাব। হাওয়া পেলে গতি বাড়বে,

ইচ্ছেমত ভিড়তে পারব যে-কোনও দিকে ।’

‘আর যদি আমাদের দেখে ফেলে?’ জানতে চাইল জ্যাসিন্টা ।

‘কয়েক হাজার ফুট লম্বা ওটা, চওড়াও অনেক, বিশ তলা উঁচু; কিন্তু তারপরেও পাওয়া কঠিন হয়েছে,’ বলল রানা । ‘এদিকে আঁধারে আমাদের ছোট কয়েকটা নৌকা । কালো রঙের পাল । তার ওপর আজ রাত কুয়াশার রাত । কেউ চোখ রাখলেও, তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ার আগে কিছুই দেখবে না ।’

মাথা দোলাল জ্যাসিন্টা ।

মৃদু হাসল রানা । ‘আর ইউনুস বলেছে ত্রিশজন লোক নিয়ে ওই দ্বীপে এসেছে জায়েদ । তাদের কেউ কেউ...’

‘আমি ভুল বলিনি, ভাই,’ বলল বেদুঈন । ‘এখন ঘুমিয়ে আছে অর্ধেক লোক । আর তাদের বেশ কয়েকজন আমার কথা শুনবে । শুধু তা-ই নয়, হয়তো লড়বেও আমাদের পক্ষ হয়ে ।’

‘দেখা যাক কী হয়,’ বলল রানা ।

রানার কথা সঠিক ।

সত্যিই ত্রিশজন সৈনিকের বিশজন এখন ঘুমিয়ে কাদা । মাত্র কয়েকজন চালিয়ে নিচ্ছে ভাসমান দ্বীপ । বেশিরভাগই আছে ইঞ্জিন রুমে । এরা ছাড়া আর আছে মাত্র কয়েকজন লোক । তারা বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাসঘাতক ত্রু । গোটা দ্বীপের উপর চোখ রাখবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মাত্র দু’জন লোকের উপর । তারা হেঁটে হেঁটে দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছে । কিন্তু কয়েক মাইলেরও বেশি তীর পাহারা দেয়া অসম্ভব । দ্বীপে রয়েছে কমপক্ষে কয়েক ডজন একর জমির সমান ডেক ।

দু’জনের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয় । তারাও তা জানে । স্বল্প বেতনে চাকরি পাওয়া সিকিউরিটি গার্ডের মত অলস পায়ে হাঁটছে তারা, অসতর্ক ।

দুই গার্ডের একজন হাঁটতে হাঁটতে মহাবিরক্ত। এসে থামল
দি আইল্যাণ্ডের কন্ট্রোল রুমের মনিটরিং রেইডারের সামনে।

একবারও সাগরে কোনও ইমেজ দেখেনি সে। ফকফক করছে
সবুজ স্ক্রিন। ওদিকে চেয়ে অযথা সময় নষ্ট করল না। একবারও
খেয়াল করেনি মুহূর্তের জন্য স্ক্রিনে ভেসে উঠেই হারিয়ে গেছে কী
যেন। আসলে কোনও কিছুই দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে না তার। বড্ড
ঘুম পেয়েছে। কিন্তু শাস্তির ভয়ে জেগে থাকতেই হচ্ছে।

মাত্র তিন সেকেন্ডের জন্য স্ক্রিনে দেখা দিয়েছে ইমেজ।
কয়েক মিনিট পর আবারও দেখা দিল। ওগুলোর সঙ্গে রয়েছে
দীর্ঘ কয়েকটা রেখা। অ্যাকটিভেট হলো রেঞ্জিং মোড। এবার
রেখা খেয়াল করল গার্ড। অবাক হয়ে গেল। রেখা অনুযায়ী
টার্গেট ট্রেস করল রেইডার, তারপর আবারও হারিয়ে গেল
টার্গেট। স্ক্রিনে বাব্বের ভিতর লেখা উঠল: কন্ট্যাক্ট লস্ট।

ধপ্ করে চেয়ারে বসল লোকটা। টের পেল, বুকের ভিতর
ধূপ-ধাপ আওয়াজে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মনে গভীর সন্দেহ।

‘সত্যিই কি কিছু দেখলাম? আর যদি দেখেই থাকি, গেল
কোথায় ওটা? হাওয়া হয়ে যেতে পারে না!’ প্রথমে গার্ডের মনে
পড়ল আমেরিকানদের তৈরি স্টেলথ ফাইটারের কথা।

জানালা দিয়ে অন্ধকারে চোখ চালাল।

না, কিছুই নেই।

আবারও চোখ রাখল রেইডার স্ক্রিনে।

আর দেখা দেয়নি টার্গেট। সন্দেহ বাড়ল তার। অবযার্ভেশন
উইং থেকে তুলে নিল বড় বিনকিউলার। ওটার মাধ্যমে
কুয়াশাভরা রাতে দেখা খুবই কঠিন। জানালা দিয়ে কিছুই দেখা
গেল না। এর বড় কারণ, বেশিরভাগ সময় আকাশ দেখেছে সে।
ভেবেছিল, যদি আসে, বিমান বা হেলিকপ্টারে করে আসবে
শত্রুরা। তেমন কিছুই নেই আশপাশে। দ্বীপের মৃদু আলো বা

মিলেমিশে যাওয়া কুয়াশায় কোনওদিকেই দেখা গেল না বেশি দূর। সত্যিই যদি কুয়াশার চাদর ভেদ করে রানাদের বাঁশের নৌকা বা কালো পাল দেখত, ভীষণ চমকে যেত গার্ড।

হতাশ হয়ে রেইডার স্ক্রিন আবারও দেখল গার্ড।

না, কিছুই নেই। www.boighar.com

ইদুরের গর্তের মুখে খাপ পেতে থাকা ক্ষুধার্ত বিড়ালের মত খামোকা বসে আছে সে।

তেইশ

বাঁশের তৈরি ছোট নৌবহর নিয়ে দি আইল্যান্ডের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর রানার মনে হলো, ওই ভাসমান দ্বীপ যেন কুয়াশা মোড়া রক অভ জিব্রাল্টার। নিজেকে পিঁপড়ে দলের লিডার মনে হলো ওর, লড়াই করতে এসেছে মস্ত এক হাতির সঙ্গে।

‘বিরিট জাহাজ,’ বলল ডুডু।

‘বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা,’ মনে করিয়ে দিল রানা।

‘আমরা চলে যাওয়ার পর আরও লোক এনে থাকলে?’ জানতে চাইল জ্যাসিন্টা।

গম্ভীর মুখে ওকে দেখল রানা। একই চিন্তা ওর নিজের মনেও, তবে সে বিষয়ে কথা না বলে শুধু বলল, ‘আগে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।’

ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রবার্তো ম্যানিনির দ্বীপের পিছনের দিকে বিলাসবহুল জেলখানা, ওদিক দিয়েই উঠবে ঠিক করেছে রানা।

নৌকার বো-তে এসে দাঁড়াল, নিচু করে নিল পাল, তারপর সরিয়ে দিল পেইন মেকার মেশিনের সাউণ্ড বক্সের উপর থেকে কাপড়। নিচু স্বরে বলল, ‘জ্যাসিণ্টা, টামাক আর তুমি চালু করবে মেশিনটা।’

নৌকার মাঝে রাখা জেনারেটর আর ফ্লাইহুইলের পাশে থামল জ্যাসিণ্টা। একই সময়ে ওখানে পৌঁছে গেল টামাক। দু’জনই জানে, দ্রুত ঘোরাতে হবে জেনারেটর। অথচ এত ছোট নৌকায় নড়াচড়া প্রায় অসম্ভব। অবশ্য কাজ শুরু করতেই গতি বাড়ল ফ্লাইহুইলের ভারী চাকার। বেশিরভাগ শক্তি দেবে ওটাই।

ডায়নামো চালু হলেই উপরের দিকে উঠছে পাওয়ার নিডল, দেখল রানা। দি আইল্যান্ডের এক শ’ গজের ভিতর পৌঁছে গেছে ওরা। রেঞ্জ ডায়াল স্থির করে নির্দিষ্ট দিকে স্পিকার তাক করল রানা। দ্বীপের পেট-মোটা অংশে পৌঁছে গেছে। এখন দুটো মেইন টাওয়ার আর কন্ট্রোল রুম থেকে দেখা যাবে না। রেইডার বিম ধরতে পারবে না আর। এখন দুশ্চিন্তা বলতে: যে-কোনও সময়ে ওদেরকে দেখে ফেলবে পায়চারী করা গ্রহরী। তেমন কেউ থাকলে, দেরি না করে তাকে লক্ষ্য করে ছাড়তে হবে পেইন মেকার সাউণ্ড। আওতার বাইরে থাকলে বাধ্য হয়ে ফেলে দিতে হবে গুলি করে।

দ্বীপের নীচের দিকের ডেক আর জানালা পরিষ্কার দেখা গেল। অনেক কাছে।

গুনতে শুরু করেছে রানা।

হ্যাঁ, শেষ পাঁচটা জানালা জেলখানার সেলের।

পুরনো বিনকিউলার কাজে লাগাল রানা। জানালার ওদিকে জ্বলছে মৃদু হলদেটে আলো। দেখা গেল না কাউকে।

দ্বীপের পিছনের মই আর গ্যাংওয়ে ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছিল রানা। কিন্তু পাল্টে নিল পরিকল্পনা। কোনও গার্ডকে

পাহারায় রাখলে সে এলাকা হওয়া উচিত *দি আইল্যাণ্ডের* পিছন দিক। কাজেই অন্য কোথাও দিয়ে ওঠাই ভাল।

উপরে হাত তুলল রানা, ইশারা করে জানিয়ে দিল, ওর পিছু নিয়ে আসতে হবে অন্য চার নৌকাকে। চলেছে ওরা পঞ্চম জানালার দিকে। তবে কোনাকুনিভাবে পঁয়ত্রিশ গজ দূরে পৌঁছে যাওয়ার পর চালু করা হলো সাউণ্ড ওয়েভ। স্পিকার তাক করা করা হয়েছে জানালার কাঁচ লক্ষ্য করে।

খাটতে শুরু করেছে জ্যাসিণ্টা আর টামাক, বন বন করে ঘুরছে স্টিয়ারিং হুইলের মত চাকা। এক সেকেন্ড পর জানালায় আঘাত হানল অতি সূক্ষ্ম আওয়াজ।

রানা দেখল, সাউণ্ড ওয়েভের কারণে থরথর করে কাঁপছে ভারী কাঁচ। ‘পাওয়ার আরও দাও,’ বলল জ্যাসিণ্টা আর টামাককে।

জ্যাসিণ্টার কাছ থেকে হুইল বুঝে নিল ডুডু। যেভাবে ঘোরাতে লাগল, রানার মনে হলো, যৌবনে সুযোগ পেলে ক্রিকেট দলের ভাল পেসার হতো সে। নিডল উঠে গেল ডায়ালের লাল অংশে। টার্গেটে বিম তাক করে রাখল রানা।

‘কী করছ?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা।

‘জানালার দিকে খেয়াল দাও, বুঝে যাবে,’ বলল রানা।

সাউণ্ড ওয়েভের আঘাতে সামনে-পিছনে তিরতির করে কাঁপছে জানালা, ওটা যেন জোরে টোকা দেয়া ঢোলের চামড়া। বেকায়দাভাবে নড়ছে বালবও। টিবেটান সিংগিং বাউলের মত রিনরিনে আওয়াজ ভেসে এল সাগরের উপর দিয়ে। অস্বস্তিকর শব্দ। একবার রানার মনে হলো, ওই আওয়াজের কারণেই ধরা পড়বে ওরা। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর থামা যায় না।

‘আরও পাওয়ার চাই,’ ডুডুকে বলল রানা। দরদর করে

ঘামছে মানুষটা। হাঁপিয়ে উঠছে। তার কাছ থেকে হুইল বুঝে নিল রানা। এদিকে জানালার দিকে তাক করে রেখেছে জ্যাসিন্টা পেইন মেকারের স্পিকার বক্স।

রানার মনে হলো ওদের সব চেষ্টা বৃথা হবে। ঘূর্ণিঝড় প্রফ কাঁচ ঠেকিয়ে রেখেছে আওয়াজের কম্পন। আর তখনই দু'পাশের দুটো নৌকা থেকেও চালু হলো পেইন মেকার মেশিন। একই জানালা তাক করা হয়েছে।

মাত্র এক সেকেন্ড পর ভিতরের দিকে বিস্ফোরিত হলো কাঁচ। এমন হবে বুঝতে পারেনি রানা। ভেবেছিল উদ্ধার করবে আসিফ-তানিয়া আর ম্যানিনিকে। আর তার আগেই ওরা জেনে যাবে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে কম্পমান জানালার। সেক্ষেত্রে ওদের সরে যাওয়ার কথা ওখান থেকে।

জেলখানার সেলে প্রথমে অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছে তানিয়া। রিনরিন করছে কী যেন। তখনই কানের পর্দায় শুরু হলো ব্যথা।

‘কী হলো তোমার?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘জানি না।’ মাথা নাড়ল তানিয়া। বুঝে গেছে, কী যেন ঘটছে চারপাশে। কিন্তু তা কী, আঁচ করতে পারছে না। দরজার কাছের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আঁধার অংশে ফিরে এল। ক্রিঁচ-ক্রিঁচ শব্দটা অনেকটা ঝিঁঝি পোকাকার আওয়াজের মত।

শব্দের মাত্রা বাড়ছে না, কিন্তু ক্রমেই উঠছে উঁচু পর্দায়, তীক্ষ্ণ। আশপাশে কোনও কুকুর থাকলে পাগল হয়ে উঠে ঘেউ-ঘেউ শুরু করত।

‘কে জানে, হয়তো আমাদের ওপর হামলা করছে ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী,’ মুখ খুললেন ম্যানিনি।

বৈজ্ঞানিকের কথায় পাত্তা দিল না তানিয়া। মস্ত জানালার কাছে চলে গেল। চোখ রাখল সাগরে। দেখা যাচ্ছে না ভাল।

কাঁচের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে দেখল এবার । দি আইল্যাণ্ডের সামান্য কয়েকটা বাতি দূর করতে পারেনি আঁধার ।

অবশ্য, কয়েক সেকেন্ড পর তানিয়া দেখল, একটু দূরে থেমেছে অদ্ভুত কয়েকটা নৌকা । সামনের নৌকায় বসে আছে ওর পরিচিত একজন!

‘রানা এসেছে!’ অবাক সুরে বলল তানিয়া ।

এক দৌড়ে জানালার সামনে পৌঁছে গেল আসিফ আর ম্যানিনি ।

‘রানা এখানে আসবে কী করে?’ নৌকা দেখেছে আসিফ ।
‘আর ওই লোকগুলোই বা কারা?’

‘জানি না,’ বিড়বিড় করল তানিয়া ।

রানার নৌকার পাশে থামল আরও দুটো বাঁশের নৌকা । কয়েক গুণ বেড়ে গেল আওয়াজ । আসিফদের বামদিকে ভীষণ কাঁপতে শুরু করেছে পুরু কাঁচ ।

‘বোধহয় আমাদের উদ্ধার করতে এসেছে,’ বললেন ম্যানিনি ।

‘তাই আসলে,’ বলল তানিয়া । স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাঙালি সিক্রেট এজেন্টের বেপরোয়া সাহস দেখে গর্বিত । কিন্তু অন্য কারণে খারাপ হয়ে গেল ওর মন । ‘কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ, রানা ভাঙছে ভুল ঘরের জানালার কাঁচ ।’

কারাবন্দিদের সেলের বাইরের করিডরে পাহারা দিচ্ছে ক’জন বেদুঈন প্রহরী । তাদের মনে হলো, ওই রিনরিন আওয়াজটা আসলে বৈজ্ঞানিক ম্যানিনির ম্যাসাজ চেয়ারের, চালু করে দেয়া হয়েছে ফুল স্পিডে । কিন্তু তখনই ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ । লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারা ।

‘দেখো তো গিয়ে কী করছে ওরা!’ বলল প্রহরীদের নেতা ।

অস্ত্র বাগিয়ে করিডর ধরে দৌড়ে গেল গার্ডদের দু’জন । ফোন

তুলে কট্টোল রুমে ডায়াল করল লিডার। চারবার বাজল ওদিকে, কিন্তু রিসিভার তুলল না কেউ।

‘মুশকিল!’ বিড়বিড় করল গার্ডদের লিডার।

ঝনঝন করে ভেঙে পড়ছে আরও জানালার কাঁচ। এবারের আওয়াজটা করিডরের দূরে নয়, ওই শব্দ এসেছে পাশের ঘর থেকেই। তার মনে হলো, পালাতে শুরু করেছে বন্দিরা, অথবা বাইরে থেকে জানালা ভেঙে ঢুকছে কেউ। গার্ডদের লিডার ভাবল, আগে ঘর খুলে দেখবে, তারপর যোগাযোগ করবে জায়েদের সঙ্গে। রিসিভার রেখে ডেস্ক থেকে সরে গেল সে, কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করে পা বাড়াল দরজার দিকে।

করিডরের বাতি নিভিয়ে দিল। প্রায় নিঃশব্দে খুলল দরজার কবাট। অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়ল ঘরে। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। শুনল চাপা আওয়াজ। ভাঙা জানালার ওপাশে ধূসর কুয়াশা।

চারপাশ পরীক্ষা করে দেখল সে। সবই ঠিক আছে। কেউ ঢোকেনি এই ঘরে। অথচ জানালা ভেঙে পড়েছে।

জানালার দিকে পা বাড়াল সে, বুটের নীচে কুড়মুড় আওয়াজ তুলে ভাঙছে কাঁচ। খেয়াল করতেই দেখল, দি আইল্যান্ডের গায়ে ঠেকে আছে ভাসমান কী যেন। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওগুলো অদ্ভুত আকারের কয়েকটা বাঁশের নৌকা। বুঝে গেল, জিনিসগুলো আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের হতে পারে না। আরও এক পা সামনে বাড়ল সে, আর তখনই শুনল অদ্ভুত ক্রিঁচ-ক্রিঁচ আওয়াজ। শুরু হয়েছে তার দেহ জুড়ে ভয়ঙ্কর ব্যথা। মনে হলো শরীরে বইছে হাই-ভোল্টেজের বিদ্যুৎ।

যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে লাগল হাত-পা-বুক-পেট। ফুলে উঠল ঘাড়ের পেশি। এত জোরে খপ্ করে বন্ধ করেছে চোয়াল, কামড় পড়ল জিভে। হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে বসল সে। ব্যথা কমছে না, উপুড় হয়ে ধুপ্ করে পড়ল মেঝেতে। হাত থেকে খসে

পড়েছে পিস্তল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর কমে গেল ব্যাথা, কিন্তু ওই কয়েক সেকেন্ডে ফুরিয়ে গেছে ওর সব শক্তি। মেঝেতে শুয়ে দৌড়ে আসা কুকুরের মত হাঁপাতে লাগল সে।

ভাঙা জানালা টপকে ভিতরে নামল কে যেন।

ফুঁপিয়ে উঠে পিস্তল ধরতে চাইল বেদুঈন, কিন্তু তার ডান হাতের তালুর উপর নামল ভারী বুট। মুড়মুড় করে ভেঙে গেল হাতের চারটে আঙুল। ঝটকা দিয়ে হাত পিছিয়ে নিল সে, দুর্বল শেয়ালের মত কুঁই-কুঁই আওয়াজ বেরোল মুখ থেকে। তখনই তার মাথার পিছনে নামল রাইফেলের কুঁদো।

ভাঙা জানালা দিয়ে আসিফ-তানিয়া আর ম্যানিনি দেখল, গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ে উঠে আসছে রানা আর কয়েকজন। নীচে রয়েছে বলে ভাঙা জানালা দিয়ে দেখতে পাবে না ওদের। পিছনের দুটো ঘরে গিয়ে ঢুকবে তারা। www.boighar.com

‘খুঁজতে শুরু করলে পেয়ে যাবে আমাদের,’ বলল আসিফ।
‘তবে তার আগে কাবু করতে হবে গার্ডদের।’

ঘরের দরজায় আওয়াজ হতেই ঘুরে চাইল ওরা।

তানিয়া বলল, ‘ওরা এত দ্রুত আসবে?’

‘সম্ভব না,’ বলল আসিফ।

‘তা হলে গার্ড,’ মুষড়ে পড়লেন ম্যানিনি।

দৌড়ে দরজার পাশে পৌঁছে গেল তানিয়া। ক্লিক আওয়াজটা বলে দিল ঢোকানো হয়েছে তালায় চাবি। মৃদু গুঞ্জন তৈরি করে খুলে গেল তালা। দরজা খুলবার আগেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পাওয়ার আউটলেটের সামনে পৌঁছে গেল তানিয়া।

ম্যাসাজ চেয়ারকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবার আসিফের পরিকল্পনা সফল হবে কি না, তা নির্ভর করছে সঠিক সময়ে কাজে নামবার উপর। তানিয়া ঝট করে চেয়ারের প্লাগ ঢুকিয়ে দিল

দেয়ালের সকেটে। ভাবল, দেরি করে ফেললাম না তো?

ধাতব দরজা খুলতে শুরু করেছে, এমন সময় দেয়াল থেকে চারপাশে ছটকে গেল লাল-হলদে আগুনের ফুলকি। গার্ডের হাত তখনও হ্যাণ্ডলে, ভয়ঙ্কর বৈদ্যুতিক শক খেয়ে ছটকে গিয়ে পড়ল পিছনে। দরজা থেকে বেরোল ফুলকি আর ধোঁয়া। ফিউয কেটে গেছে। ম্যাসাজ চেয়ারের সীসা ব্যবহার করে ফাঁদ পেতেছিল আসিফ।

পাঁচ সেকেণ্ড পেরোবার আগেই আহত গার্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আসিফ, ডান হাঁটুর জোর গুঁতো লাগাল লোকটার পেটে। মুখে গোটা দু'এক ঘুমি মেরে তুলে নিল পিস্তলটা। আগেই জ্ঞান হারিয়েছে গার্ড। তাকে ঘরে টেনে আনল ম্যানিনি আর আসিফ। প্লাগ খুলেছে তানিয়া, আরেক হাতে ঠেকিয়ে রেখেছে কবাট, নইলে আবারও বন্ধ হয়ে যাবে। চট করে দেখে নিল করিডর। কেউ নেই।

‘চলো, বেরিয়ে যাই,’ তাড়া দিল তানিয়া।

বিছানার চাদর ছিঁড়ে অজ্ঞান গার্ডের হাত-পা বাঁধল আসিফ, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন।

রবার্তো ম্যানিনির জেলখানার গার্ড পোস্টে পৌঁছে গেছে রানা। জায়গাটা পাহারা দেয়ার জায়গা না হয়ে বিলাসবহুল রিসেপশন এরিয়া হতে পারত। সোফা আর চেয়ারের সামনে টেবিলে কয়েকটা কমপিউটার, পাশে ফোন। এক দেয়ালের তাকে দামি সব মদের বোতল সাজানো।

‘ভাই, আমি আমার লোক সরিয়ে নিতে চললাম,’ বলল ইউনুস।

‘হারিয়ে যাবে না?’

‘না। এই জায়গার ম্যাপ দেখিয়েছে আমাদেরকে জায়েদ।’

‘যাও।’

ছুটতে শুরু করে করিডরের বাঁকে হারিয়ে গেল ইউনুস। ডুডু আর টামাকের লোকদেরকে করিডরের দু’দিক দেখাল রানা।
‘পাহারা দাও।’

ইউনুস যেদিকে গেছে, তার উল্টো দিকে ছুট লাগাল রানা। ওর সঙ্গে মাত্র কয়েকজন। বাঁকা হয়ে দূরে চলে গেছে করিডর। ওদিক থেকে দৌড়ে আসছে তিনজন। চিনে ফেলল রানা। আসিফ, তানিয়া আর ম্যানিনি।

‘তোকে দেখে বাঁচলাম,’ রানার সামনে এসে থামল আসিফ, ‘ভেবেছিলাম খুন হয়ে গেছিস।’

‘বাঁচতে পেরেছিস তা বলা যায় না, আর আমি তো ভূতও হতে পারি,’ পাশের বড় ডেস্ক দেখাল রানা। ‘লুকিয়ে পড়। খাঁচা থেকে বেরোলি কী করে?’

‘গার্ডকে শক দিয়ে,’ বলল তানিয়া। ‘এইমাত্র বেরোলাম।’

‘সোহেল তোর সঙ্গে?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘না, ইয়েমেনে দু’দিন আগে ওকে তুলে দিয়েছি একটা ট্রাকের পেছনে।’

‘যাচ্ছে কোথায়?’

‘কে জানে,’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা। নিজের দেখভাল করতে জানে সোহেল, ওর চিন্তা এখন বাদ। তা ছাড়া তাতে কোনও লাভও নেই, কোনওভাবেই ওকে সাহায্য করতে পারবে না রানা।
‘এদিকের পরিস্থিতি কী?’ জানতে চাইল।

‘একজন গার্ডকে অজ্ঞান করে এসেছি,’ বলল আসিফ, ‘আটকে রেখেছি আমাদের সেলে।’

‘ওদিকের গার্ডও অচেতন,’ বলল রানা।

‘আপনার বন্ধুরা কারা?’ জানতে চাইল তানিয়া।

রানার ছায়া হয়ে ঘুরছে জ্যাসিন্টা। হাত বাড়িয়ে দিল

তানিয়ার দিকে, ‘আমি জ্যাসিস্টা কাপুল । অরিজিনাল ।’

হ্যাণ্ডশেক করল তানিয়া । ‘আর অন্যরা?’

‘আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম,’ আকর্ণ হাসি দিল ডুডু । ‘আমি হচ্ছি উইলি দ্বীপের প্রেসিডেন্ট, উনিশতম রুয়ভেল্ট...’

‘পরে পরিচয় করিয়ে দেব,’ তাকে থামিয়ে দিল রানা । ‘ওদিক থেকে কে যেন আসছে ।’

সতর্ক পায়ের আওয়াজ । আরেকজন গার্ড । তাকে বোধহয় পাঠানো হয়েছিল কয়েদিদের দেখে আসতে । করিডরের বাঁক ঘুরেই থমকে গেল সে, বুকে তাক করা অন্তত আট-দশটা রাইফেলের নল ।

হ্যাঁচকা টানে তার কোমর থেকে কার্ড কি আর পিস্তল কেড়ে নিল রানা ।

‘এবার কী করবি?’ বলল আসিফ । ‘পালিয়ে যাব?’

‘না,’ মাথা নাড়ল রানা । ‘পালাব না । দখল করে নেব দ্বীপ ।’

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল আসিফ, তানিয়া আর ম্যানিনি ।

‘সান ত্যু,’ গম্ভীর চেহারায় বলল জ্যাসিস্টা ।

‘ইংরেজিতে কী বলে?’ জানতে চাইল তানিয়া ।

‘দ্বীপে যখন উঠেছি, বন্দি করব জায়েদ, আলেয়া, হ্যাভেলা আর ডিবোয়েকে । ব্যস, কাজ শেষ ।’ বিজ্ঞানীর দিকে চাইল রানা । ‘জেলখানায় রয়ে গেছে আপনার বিশ্বস্ত ক্রুরা?’

‘বেশিরভাগ । হ্যাঁ ।’

‘তা হলে আপনি আর আসিফ নিয়ে যান এই গার্ডকে । ক্রুদের ছুটিয়ে নিয়ে ওদের বদলে একে ভরে দেবেন ওখানে । পরে দেখব এর কী করা যায় ।’

অস্ত্রের মুখে গার্ডকে নিয়ে চলল আসিফ আর ম্যানিনি ।

ডুডুর দিকে ফিরল রানা । ‘নৌকা বেঁধে সবাইকে উঠে আসতে

বলুন। সত্যিকারের লড়াই শুরু হবে একটু পরেই।’

কিছুক্ষণের ভিতর গার্ডদের ঘরে আটকে রেখে তাদের জায়গা নিল একটু আগের বন্দিরা। জানালা ভাঙা সেলের গায়ে টয়লেটের পাইপে বেঁধে রাখা হলো নৌকাগুলো।

সবমিলে রানার অধীনে জড় হয়েছে ছত্রিশজন পুরুষ ও নারী। ম্যানিনির দ্বীপ ভাল করেই চেনে তুরা, আর ডুডুর দলের ট্রেনিং, রাইফেল আর পেইন মেকার মেশিন কাজে আসবে।

দ্বীপে দুটো মেশিনগান পেয়েছে রানা, আর দুটো ছোট ঠেলাগাড়ি। ঠেলাগাড়িতে চাপানো হলো সব অস্ত্র। ত্রুদের কোয়ার্টারের দিকে চলল সৈনিকরা একটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে, অন্যটা থাকল রানা, জ্যাসিটা আর রেজাদের কাছে। ওদের সঙ্গে রয়ে গেছে ডুডু ও তার ভাতিজা টামাক। ওরা ঠেলাগাড়িতে ভারী মেশিনগান তুলে চলল এলিভেটোরের দিকে।

দলের বেশিরভাগ সৈনিক চলেছে ত্রু কোয়ার্টার লক্ষ্য করে, আর এদিকে রানা খুঁজবে জায়েদ বিন মনঘুরকে।

‘প্রেসিডেনশিয়াল সুইট কোন্ তলায়?’ জানতে চাইল রানা।

‘মানে আমার কোয়ার্টারের কথা জানতে চাইছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন ম্যানিনি।

‘দ্বীপের সেরা সুইট যদি আপনারটাই হয়, তো ওটার কথাই বলছি।’

‘টপ ফ্লোরে,’ এলিভেটোরের বাটন টিপলেন বিজ্ঞানী।

ওরা উঠে পড়বার পর বন্ধ হলো চওড়া এলিভেটোরের দরজা।

পেইন মেকার মেশিনের সাউণ্ড বক্সে চাপড় দিল রানা, ঠোঁটে কঠোর হাসি। ‘এবার আরামপ্রিয় মানুষগুলোকে ঘুম থেকে তুলতে হয়!’

চবিশ

মচকে যাওয়া গোড়ালি নিয়ে প্রাণভয়ে ঝেড়ে দৌড়াচ্ছে সোহেল। আড়াআড়িভাবে উঠে যাচ্ছে ভেজা আসওয়ান ড্যামের ঢালু কাঁধে। আরও উঠলে পৌঁছবে নিরাপদ জায়গায়। ওর পিছনে ছুটছে মেজর লুৎফর হোসেইনি, চোখে অবিশ্বাস— তা হলে সত্যিই ভেঙে পড়ছে নাসের হৃদয়ের আসওয়ান ড্যাম!

‘বাঁচতে চাইলে বারবার পিছনে তাকাবেন না, মনে করুন আগুন ধরে গেছে আপনার লেজে,’ পরামর্শ দিল সোহেল।

‘শুধু লেজ কেন, আমার পাছাও পুড়ে গেছে!’ দৌড়ের গতি বাড়িয়ে সোহেলের পাশে চলে এল মিশরীয় মেজর।

বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঠিক করেছে, প্রথমে বাঁধের উপর উঠে সরে যাবে ক্রমবর্ধমান ফাটল থেকে, তারপর নিরাপদ জায়গা থেকে দেখবে কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে বাঁধের।

কিছুক্ষণের ভিতর উপরের চওড়া রাস্তায় পৌঁছে গেল ওরা। ফাটলের দিকে চেয়ে সোহেল দেখল, এরই ভিতর ভি আকৃতির ত্রিশ ফুট গভীর নালা তৈরি হয়েছে বাঁধের বুকে। হুড়মুড় করে নাসের হৃদয়ের পানি নামছে ওদিক দিয়ে নীল নদে।

ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলোয় দেখা গেল, ফ্লাশফ্লাডের সময় সরু পাহাড়ি ক্যানিয়নে পানি-পাথর-বালি-মাটি যেভাবে ছিটকে নীচে পড়ে, এই বাঁধেও তা-ই হচ্ছে।

পাথর-বালি-কংক্রিটকে সরিয়ে নিচ্ছে খরস্রোতা পানি।

মুহূর্তের জন্য বাধা তৈরি করল অ্যাসফল্টের রাস্তা, তারপর ভাঙা জেটির মত ঝুলে গেল একপাশে। যেভাবে তলা থেকে সরছে পাথর-বালি, মাত্র কয়েক সেকেন্ডে স্রোতের সঙ্গে হুড়মুড় করে নেমে গেল রাস্তার বড় একটা অংশ।

হ্রদের দিকে চেয়ে আরেকটা ব্যাপার দেখল সোহেল। চট করে জানতে চাইল, ‘পানি এত উঁচু পর্যন্ত উঠল কী করে?’

‘আগে কখনও এত পানি ছিল না হ্রদে,’ বলল মেজর। ‘গত দুই বছরের বৃষ্টিপাতের কারণে বেড়েছে।’

জেনারেল নাফিস আবিল-বিল আর জায়েদের শত্রুতা সম্পর্কে কিছুই জানে না সোহেল। এ-ও জানে না, রেকর্ড বৃষ্টিপাতের কারণেই পিঠ দেখিয়ে দিয়েছে লোকটা জায়েদকে। আর এখন বৃষ্টিতে জমা পানির জন্য ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই দেশ।

‘আপনাদের কন্ট্রোল রুম কোথায়?’ পানির গর্জনের উপর দিয়ে জানতে চাইল সোহেল।

পূবে নতুন দালান দেখাল মেজর লুৎফর। ওটা ঠিক বাঁধের মাঝে। ‘নতুন কন্ট্রোল রুমটা পাওয়ার প্লান্টের পাশে।’

‘চলুন!’

নতুন উদ্যমে দৌড় লাগাল সোহেল। এবার পিছনে পড়ল না মেজর। ওদের পিছনে ডায়ামের সামান্য ফাটল হয়ে উঠেছে আস্ত খাল, চওড়া হচ্ছে আরও। প্রতি পনেরো সেকেন্ডে বাড়ছে এক ফুটেরও বেশি।

কন্ট্রোল রুমের সামনে পৌঁছে ধাক্কা দিয়ে সদর দরজা খুলল মেজর, সোহেলের পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। কমাণ্ড সেন্টারে চলছে হৈ-চৈ-চৈচামেচি। বেশিরভাগ ডেস্কে কেউ নেই, জানের ভয়ে পালিয়ে গেছে কর্মচারীরা। এখনও রয়ে গেছে সাহসী কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা, বুঝতে চাইছে কী ঘটছে এসব।

মেজরকে দেখে দৌড়ে এল সুপারভাইসার। ‘হামলা করেছে

ইজরায়েলিরা? কোনও বিস্ফোরণের আওয়াজ তো পেলাম না!’

‘প্রতিটা ফ্লাডগেট খুলে দিন,’ মেজরের নির্দেশের অপেক্ষা না করেই অর্ডার দিল সোহেল, ‘যেন বাদ না পড়ে প্রতিটা ইমার্জেন্সি স্পিলওয়ে!’

‘কে আপনি?’ জানতে চাইল সুপারভাইয়ার। কণ্ঠে বিস্ময়। মেজরের সঙ্গে লোকটার পরনে নোংরা পোশাক, কিন্তু মেজরকে পাত্তা না দিয়ে ধমকের সুরে কথা বলছে!

‘আমি বাংলাদেশি এক লোক, সোহেল আহমেদ। আপনাদের বাঁধ বাঁচাতে চাইলে যা বলছি তা-ই করুন! খুলে দিন প্রতিটা স্পিলওয়ে আর ফ্লাডগেট!’

‘কিন্তু...’

‘ত্রিশ ফুট চওড়া ফাটল ধরেছে বাঁধে,’ সুপারভাইয়ারকে থামিয়ে দিল সোহেল। ‘ওটা পানির একটু নীচে, পশ্চিম তীরের কাছে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। পানির স্তর ফাটলের নীচে নামাতে না পারলে বাঁচবেন না। বাঁধ আর দালান নিয়ে স্রেফ ভেসে যাবেন নীল নদে।’

এক মুহূর্ত সোহেলকে দেখল লোকটা, আরেকবার দেখল মেজরকে।

মেজর হোসেইনি মাথা দোলাল। ‘উনি ঠিকই বলেছেন।’

অবাক হওয়ারও সময় নেই, ঘুরেই হুঙ্কার ছাড়ল সুপারভাইয়ার, ‘খুলে দাও সব স্পিলওয়ে! খুলে দাও সব গেট!’

ব্যস্ত হয়ে উঠল কর্মচারীরা, পটাপট সুইচ টিপছে। নামিয়ে দেয়া হচ্ছে ভারী সব লিভার।

‘ফ্লাডগেট খুলছে!’ কর্মচারীদের একজন টেঁচাল। ‘ব্লক ওয়ান আর ব্লক টু ভরে উঠছে! ব্লক থ্রি আর ফোর খুলছে!’

দেয়াল জুড়ে ডিসপ্লেতে মিমিক বোর্ড। লাল থেকে সবুজ হয়ে গেছে ইণ্ডিকেটর। ডিসপ্লের বারোটা নীল চ্যানেল দেখাচ্ছে বাঁধের

বারোটা জেনারেটর চ্যানেল ।

‘ইমার্জেন্সি স্পিলওয়েগুলো খুলে দেয়া হয়েছে?’ জানতে চাইল সোহেল ।

এ ধরনের ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ হতে পারে ভেবেই প্রায় প্রতিটি বড় বাঁধে রাখা হয় ইমার্জেন্সি স্পিলওয়ে । এসব হাই ভলিউম বাইপাস চ্যানেল সাধারণত ব্যবহার করা হয় না ।

‘সবই খুলছে,’ জানাল সুপারভাইসার । ডিসপ্লে দেখে গুনল, ‘আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ... সব গেট খুলে গেছে! বাদ পড়েনি টোশকা ক্যানালও! দশ সেকেন্ডের ভেতর ম্যাক্সিমাম ওঅটর ভলিউম ডিসচার্জ করব আমরা! প্রতি সেকেন্ডে চার লাখ কিউবিক ফিট!’

কথাটা শুনে ফাঁস করে শ্বাস ফেলল সোহেল । পানির ভয়ঙ্কর গর্জন কাঁপিয়ে দিচ্ছে গোটা দালান । নীচের নীল নদের দিকে চাইল ও । খলখল শব্দে টেইলরেসের মাঝ দিয়ে ছুটছে উন্মত্ত পানি ।

সমস্ত স্পিলওয়ে খুলে দেয়ায় নীচে গিয়ে পড়ছে যে পরিমাণ পানি, প্রতি পনেরো সেকেন্ডে ভরবে একটা সুপারট্যাঙ্কারের পেট । কিন্তু এরই ভিতর দ্বিগুণ পানি নামছে ফাটল দিয়ে । প্রতি সেকেন্ডে আরও গভীর হচ্ছে ওই ক্ষত ।

ভয় পেল সোহেল, পানির স্তর নেমে যাওয়ার আগেই হয়তো ভেঙে পড়বে বাঁধ ।

নীল নদের দুই তীর উপচে শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর বন্যা ।

জোরালো ভূমিকম্প যেভাবে কাঁপাতে থাকে গোটা শহর, তেমনি থরথর করে কাঁপছে মস্ত বাঁধ । তুমুল বেগে বেরোচ্ছে পানি, কিন্তু ক্রমেই আরও বাড়ছে ড্যামের থরহরিকম্পন !

ভেঙে গেল বাঁধের মস্ত এক অংশ, ঢালু জায়গা দিয়ে হুড়মুড় করে অ্যাভালানশের মত নেমে গেল পানির তীব্র তোড় নীল নদের

বুকে। মাত্র দুই মিনিটে প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে গেল বালি-পাথর। একটু দূরের ওই ফাটল হয়ে উঠেছে দু'শ' ফুট চওড়া। ড্যামের সব স্পিলওয়ের অন্তত দশ গুণ পানি বেরোচ্ছে ওই ফাটল দিয়ে।

সোহেলের মনে হলো, দেখছে নতুন নায়্যাগ্রা জলপ্রপাত!

ভাটির দিকে তেড়ে গেল উঁচু বন্যা। পথের সামনে যা পেল, নৌকা, ডক, বার্জ, ট্যুরিস্টদের রিভার বোট— সবই ডুবিয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ওই ভয়ঙ্কর প্লাবনের কাছে ম্যাচের কাঠির মত পলকা ওসব।

ভেসে গেল নীল নদের দুই তীর, চারপাশে যা পেল উপড়ে নিয়ে ছুটল সুনামির মত। রক্ষা পেল না দুই পারের হোটেল আর ছোট-বড় সব দালান। ছোট স্থাপনা ভেঙে হারিয়ে গেল নদের গ্রাসে। সব ম্যাজিক যেন, এক সেকেণ্ড আগে ছিল, পরের সেকেণ্ডে বিলীন। ওখানে থাকল শুধু খলখল আওয়াজ তোলা পানি। আসলে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের কাজ মাত্র শুরু করেছে বাঁধনমুক্ত নাসের হ্রদ।

চূপ করে আছে সুপারভাইসার। একই অবস্থা মিশরীয় মেজরের। নীরবে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবারও নেই।

সোহেলের মনে পড়ল, নীল নদের দুই তীরের বারো মাইল এলাকার ভিতর বাস করে মিশরের প্রায় নব্বুইভাগ মানুষ। সত্যিই যদি ভেঙে পড়ে পুরো আসওয়ান ড্যাম, মারা পড়বে লাখে লাখে মানুষ। উপত্যকার চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে পানি, ভাটির দিকের মানুষ কেউ রক্ষা পাবে না। ওই বন্যার পর শুরু হবে আরও ভয়ঙ্কর দুর্যোগ।

আশ্রয় হারাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। কয়েক দিনের জন্য তলিয়ে যাবে মিশরের অর্ধেক চাষের জমি। পচে যাবে সব ফসল। দেখা দেবে ডিসেণ্ট্রি, কলেরা আর অন্যান্য রোগের প্রকোপ। মশা আর অন্যান্য পতঙ্গের কারণে ছড়িয়ে পড়বে মহামারী।

বাঁধ উড়ে গেলে বন্ধ হবে দেশের পনেরো ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন। সে-কথা বাদই যাক, আরম্ভ হবে মারাত্মক রাজনৈতিক জটিলতা। বিদ্রোহ করবে হাজারো সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। আট কোটি মানুষের এই দেশ হয়ে উঠবে সত্যিকারের নরক।

‘আস্তু বাঁধ ভাঙতে কতক্ষণ লাগবে?’ জানতে চাইল সোহেল।

‘বলা কঠিন,’ বলল সুপারভাইয়ার। ‘কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে কোর, তার উপর নির্ভর করছে সব।’

সোহেল খেয়াল করল, আরও বিস্তৃত হয়েছে বাঁধের ফাটল। ‘এই বাঁধের কোর কী দিয়ে তৈরি?’ জানতে চাইল। মনে পড়ল, ইয়েমেনের মডেল বাঁধে কয়েক ধরনের জিনিস ব্যবহার হয়েছিল।

‘সেমিপ্লাস্টিক আর ইমপারমিয়েবল ফ্রে,’ বলল সুপারভাইয়ার। ‘নীচে কংক্রিটের ভিত্তি।’

সোহেলের ধারণা ঠিক হলে, কয়েক ধরনের মেটারিয়ালের সমষ্টি সরিয়ে কোর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পানি। এজন্য কমে গেছে ক্ষয়। ‘ড্যামের সবদিকে কংক্রিটের ভিত্তি আছে?’

মাথা দোলাল সুপারভাইয়ার। ‘দু’দিকই গেঁথে দেয়া হয়েছে পাথরের বুকে।’ www.boighar.com

‘এত বড় হৃদের চাপ সহ্য করতে পারবে?’

কয়েক মুহূর্ত ভাবল লোকটা, তারপর বলল, ‘অন্য সব মেটারিয়ালের মত চট করে ক্ষয় হবে না। কিন্তু পিছনের ঢালে কোর আটকে রাখতে যেসব পাথর ফেলা হয়েছে, ওগুলো সরে যেতে শুরু করবে। ফলে কোর হয়ে উঠবে কিছুটা নড়বড়ে। কোনও কোনও জায়গায় অনায়াসেই কোর সরিয়ে দেবে নাসের হৃদ। ব্যাপারটা ট্রেন দিয়ে গুঁতো মেরে ছোট গাড়ি উড়িয়ে দেয়ার মত হবে।’

ফাটলের ওদিকটা দেখল সোহেল। বাঁধের বুক ভেদ করে ভয়ঙ্কর শব্দ তুলে পড়ছে পানি জলপ্রপাতের মত। কিন্তু মনে হলো

আপাতত ক্ষয় ঠেকিয়ে রেখেছে ওই তেরো ডিগ্রি ঢালু অংশ।

‘মনে হচ্ছে আর নীচে নামছে না ফাটল,’ বলল সোহেল।
‘একঘণ্টার ভেতর পানি ফাটলের নীচে নামলে টিকে যাবে ড্যাম।’

‘হয়তো,’ মাথা দোলাল সুপারভাইয়ার। নিশ্চিত নয়।

অন্য একটা দিক দেখাল মেজর লুৎফর হোসেইনি। আগে ওটা দেখেনি সোহেল। বাঁধের গায়ে অনেক নীচে ছিটকে বেরোচ্ছে গিয়ারের মত পানি। মিশে যাচ্ছে বন্যার সঙ্গে। যেন বাগানের বাহারি ফোয়ারা। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলোয় ওখানে ভাসছে কুয়াশার মত জলকণা।

‘ওটা কী?’ জানতে চাইল মেজর হোসেইনি।

মন দমে গেল সোহেলের। ইয়েমেনের মডেল বাঁধের কথা মনে পড়েছে। ওটা ভেঙে পড়বার সময় প্রথমে ফাটল ধরে বাঁধের উপরে, পরে নীচের সুড়ঙ্গ উপড়ে নিয়ে গিয়েছিল কোর। তখন বিধ্বস্ত হয় গোটা ড্যাম।

‘আরও বড় বিপদ সামনে,’ বলল সোহেল।

‘ওটা হলো কী করে?’ জানতে চাইল সুপারভাইয়ার।

ন্যানোবট, বাঁধের কংক্রিট ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলল সোহেল।

এবার মনে সন্দেহ রইল না মেজর বা সুপারভাইয়ারের।

‘ওই জিনিস এখনও নীচে কাজ করছে?’ জানতে চাইল মেজর লুৎফর।

‘সম্ভবত,’ বলল সোহেল, ‘হয়তো কাদা ফুটো করে বড় করছে সুড়ঙ্গ।’

‘সুড়ঙ্গ বড় করতে পারলে...’ খেমে গেল সুপারভাইয়ার। কী ঘটবে তা ভালভাবেই বুঝে গেছে।

‘এ ধরনের বিপর্যয় ঠেকাতে, বা ফাটল বুজে দিতে কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?’ জানতে চাইল সোহেল।

থুতনি ঘষল সুপারভাইয়ার, কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল, 'একটা উপায় আছে। এমন ঘটতে পারে ভেবে কেনা হয়েছিল আল্ট্রা-সেট নামের একটা কমপাউণ্ড। জিনিসটা পলিমার, আটকে থাকে কাদায়। ছড়িয়ে গিয়ে বুজে দেয় ছোট গর্ত বা ফাটল। কাজ শেষ করে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে। আমরা সুড়ঙ্গের ভেতর ওই জিনিস পাম্প করতে পারলে ন্যানোবট সহ বুজে যাবে সুড়ঙ্গ। যদি বাঁধের উপরের দিক টিকে যায়, আর কমে যায় পানির স্তর, হয়তো রক্ষা পাবে আসওয়ান।'

আরেকবার কেঁপে উঠল গোটা দালান।

'ওই জিনিস ব্যবহারের খারাপ দিকটা কী?' সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল সোহেল।

'সুড়ঙ্গে আল্ট্রা-সেট ব্যবহার করতে চাইলে মাত্র একটা উপায় আছে,' বলল সুপারভাইয়ার। 'হাই-প্রেশার ব্যবহার করে পাম্প করতে হবে। আর কাউকে না কাউকে নামতে হবে বাঁধের পিছনে, হ্রদের মেঝেতে।'

কম্পমান দালানের কন্ট্রোল রুমে রয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন কর্মচারী। তাদেরকে একবার দেখল সোহেল, তারপর আবারও দেখল সুপারভাইয়ারকে। গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখ। 'তার মানে আপনাদের দরকার এখন একজন দক্ষ ডুবুরি?' মনে মনে বলল, 'শালার কপাল, আজ ঘুম থেকে উঠে কার মুখ দেখেছিলাম!'

পঁচিশ

এলিভেটোরের দরজা খুলে যেতেই রানা দেখল, ওরা পৌছে গেছে বিজ্ঞানী রবার্টো ম্যানিনির পিরামিড আকৃতির দালানের সবচেয়ে উঁচু তলায়। সামনেই চমৎকারভাবে সাজানো ফয়ে। জায়েদ বিন মনযুরের তিনজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, এলিভেটোর থেমে যেতেই টিং আওয়াজ শুনে ঘুরে চেয়েছে তারা।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ভুলেও ভাবেনি কোনও ঝামেলা হবে। পরেও তেমন কিছু ভাবতে পারল না। শুধু ধুপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে। ভয়ঙ্কর ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। তাদের উপর তাক করা হয়েছে পেইন মেকার মেশিন।

তিন গার্ডের একজন কিলবিল করে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। গুঙিয়ে কী যেন বলল আরেকজন। তৃতীয় গার্ড পড়বার সময় তার মাথা ঠুকে গেছে টেবিলের কিনারায়, অজ্ঞান।

যন্ত্রের চাকা ঘোরানো বন্ধ করল রানা। আসিফ, তানিয়া, ডুডু আর টামাক জেলখানা থেকে এনেছে হ্যাণ্ডকাফ, ওগুলো ব্যবহার করে আটকে দিল তিন গার্ডের কবজি ও গোড়ালি। জ্ঞান ফিরেছে তৃতীয় গার্ডের। অন্য দু'জনের মতই হতভম্ব আর দ্বিধান্বিত।

‘বুঝতে পারছি তোমাদের কষ্ট,’ বলল রানা। ‘দশ ঘণ্টা আগে আমারও এমনই হয়েছিল।’

বড় বড় চোখে ওকে দেখল তিন গার্ড। ডাষ্ট টেপ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো তাদের মুখ। দাঁড় করিয়ে ভরে দেয়া হলো

জ্যানিটর্স ক্লযিটে ।

‘আসুন,’ পথ দেখালেন ম্যানিনি । চলেছেন ফয়ের ডানদিকে ।
সামনেই চওড়া করিডর ।

ওই পথে পা দেয়ার আগে সাবধানে ঊঁকি দিল রানা ।

কেউ নেই ।

‘চলুন ।’

করিডরের মাঝে দেখা গেল প্রকাণ্ড দুই কবাটের একটা দরজা । কি-প্যাডের সামনে থামলেন ম্যানিনি । কোড দিচ্ছেন প্যাডে, এমন সময় অনেক নীচ থেকে শোনা গেল গোলাগুলির আওয়াজ ।

‘পাল্টা হামলা করছে জায়েদ বিন মনযুরের লোক,’ বলল তানিয়া ।

‘এসো, জলদি,’ তাড়া দিল রানা ।

বিজ্ঞানী গোপন কোড দিতেই ক্লিক আওয়াজ তুলল তালা । জোরালো লাথি দিয়ে দরজা খুলল রানা । পেইন মেকার মেশিন নিয়ে তৈরি আসিফ আর ডুডু, ঝড়ের গতিতে ঢুকল ওরা ।

ঘরে বাতি জ্বলছে না । বাতির সুইচ অন করলেন ম্যানিনি ।

ঘরে ওরা ছাড়া কেউ নেই ।

‘ভুল ঘরে এলাম?’ জানতে চাইল তানিয়া ।

হ্যাণ্ডেল থেকে হাত সরিয়ে পেইন মেকার মেশিন অফ করল রানা । চারপাশে চোখ বোলাতেই দেখল, ঘুমানো হয়েছে বিছানায়, চাদর এলোমেলো । জুঁই ফুলের সুবাস পেল । আলেয়া বিনতে আব্বাস ওই পারফিউম ব্যবহার করে । বোধহয় জায়েদ বিন মনযুরের উপপত্নী ।

‘ঠিক ঘর, কিন্তু শব্দেই করে ফেলেছি আমরা,’ বিজ্ঞানীকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল রানা, ‘আপনার বিছানার চাদরটা পাল্টে নিতে হবে ।’

‘চাদর না, খাটই পুড়িয়ে ফেলব,’ ক্ষোভ নিয়ে বললেন ম্যানিনি ।

‘করিডরে হাঁটতে শুরু করে রানা শুনল, গোলাগুলি চলছে দুই দল লোকের ভিতর ।

দ্রুত হেঁটে ওকে ধরে ফেলল অন্যরা ।

‘এজন্যেই এত সতর্ক ছিল জায়েদের লোক,’ বলল আসিফ ।
‘ধারণা করেছিল কেউ না কেউ আবারও ফিরবে এখানে ।’

‘বেদুঈন শয়তানটা কোথায় গেল?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা ।

‘আমি জানি কোথায় যাবে,’ বলল রানা । হাঁটবার গতি বাড়ল ওর ।

দি আইল্যাণ্ডের কন্ট্রোল রুমে দাঁড়িয়ে আছে জায়েদ বিন মনযুর, কেঁপে গেছে তার অন্তরাত্মা । ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আলেয়া, ডিবোয়ে আর হ্যাভেলা । এ ছাড়া ঘরে আছে রেইডার অপারেটর আর আরেক ত্রু । অন্যরা ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীপে । মাত্র আট-দশজন বা তার চেয়েও সংখ্যায় কম, লড়ছে প্রাণ বাঁচাতে । ম্যানিনির বিশ্বস্ত ত্রু আর তারই কয়েকজন দলত্যাগী বেদুঈন এবং আরও কারা যেন হামলা করেছে দ্বীপে, যুদ্ধ করছে আমেরিকান মেরিন ট্রুপসের মত করে ।

‘কী করে এটা সম্ভব হলো?’ জানতে চাইল জায়েদ ।
‘আশপাশে কোনও বোট নেই, হেলিকপ্টার নেই, তা হলে এরা এল কোথেকে?’ www.boighar.com

‘জেলখানার ভিডিও আছে আমাদের কাছে,’ বলল ডিবোয়ে ।
ল্যাপটপ দেখছে । ‘বলতে খারাপ লাগছে, আপনার শত্রু ওই বদমাস মাসুদ রানা আবারও এসে হাজির হয়েছে ।’

‘হতে পারে না,’ জোর দিয়ে বলল জায়েদ । ‘সে মারা গেছে ।
পর পর দু’বার তাকে খুন করেছি আমি ।’ *

‘তা হলে তো রক্ষা নেই! নিশ্চয়ই উঠে এসেছে নরক থেকে,’ বলল আলেয়া।

জায়েদের দিকে ল্যাপটপ ঘোরাল ডিবোয়ে। ‘নিজ চোখে দেখুন।’

সত্যিই যমের অরুচি সেই হারামজাদা মাসুদ রানা!

সে কী করে ফিরল বুঝতে পারল না জায়েদ। গত দু’বার নিশ্চিত জেনেছে লোকটা মারা পড়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বহাল তব্বিতেই আছে! সত্যিকারের প্রেতাত্মা?

গোলাগুলির শব্দ এখন অনেক কাছে। অবযার্ভেশন ডেক থেকে দেখা গেল ম্যানিনির পার্কের দিকে ছুটছে ক’জন গার্ড। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর গুলি খেয়ে পড়ে গেল। চারজন বেদুঈনকে দেখল জায়েদ। বেঈমানী করেছে তারা। কালো রঙের কয়েকজন লোকের সঙ্গে আবার ঢুকল দালানে।

‘সরে যেতে হবে এখন থেকে,’ বলল আলেয়া। ‘আমরা হেরে গেছি।’

চারপাশ দেখে নিল জায়েদ। চাইলেও এখন পৌঁছুতে পারবে না ড্রাই-ডকে। অনেক দূরে ভাসছে ফ্লাইং বোট। ওখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করলে খুন হয়ে যাবে গুলি খেয়ে। বা মিসাইল মেরে ফেলে দেয়া হবে ওদের বিমান।

‘আমাদের পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই,’ বলল জায়েদ।

‘কিন্তু হারতেই হবে,’ তীক্ষ্ণ শোনাল আলেয়ার কণ্ঠ। ‘আমরা এখানে মাত্র ছয়জন!’

‘চুপ করো!’ ধমক দিল জায়েদ।

ভাবতে চাইছে সে। এমন কোনও উপায় খুঁজতে হবে, যে কারণে জিতে যাবে সে। ডিবোয়ের দিকে তাকাল। ‘ন্যানোবট সচল করতে হবে। ট্রান্সমিটার চালু করো।’

ল্যাপটপে টাইপ করতে শুরু করেও থেমে গেল ডিবোয়ে।

যন্ত্রটা বাড়িয়ে দিল জায়েদের দিকে, ‘আপনি করুন।’

‘কী করবেন, জায়েদ?’ জানতে চাইল হ্যাভেলা।

কথাটা পাত্তা দিল না জায়েদ। টাইপ করছে। ধীরে ধীরে কোড দিচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পর বুঝল সিস্টেমের কোন্ পর্যায়ে আছে। এবার বাড়ল টাইপিং গতি।

একটু দূরের করিডরে গোলাগুলির আওয়াজ।

মেন্যু থেকে বাছাই করে নির্দিষ্ট কমাণ্ড লিখে এন্টার টিপল জায়েদ।

তখনই দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দুই পক্ষের মাঝে শুরু হলো গুলি বিনিময়। ঘরে নানাদিকে ছুটছে বুলেট।

হ্যাভেলা, রেইডার অপারেটর আর তার সঙ্গী গুলি খেয়ে পড়ে যেতেই একটা ডেস্কের আড়ালে আশ্রয় নিল জায়েদ। ঘরের সামনে পাহারা দেয়া অবশিষ্ট বেদুঈন গার্ড খুন হলো পাল্টা গুলি করতে গিয়ে।

‘আত্মসমর্পণ করো, জায়েদ!’ বাইরে থেকে এল রানার কণ্ঠ।

ঘরের মাঝে দ্বীপের মত এক জায়গায় আছে জায়েদ। হাতের কাছে জরুরি সব সুইচ, লিভার ইত্যাদি। ওর পিছনে লুকিয়ে পড়েছে ডিবোয়ে আর আলেয়া। ‘আমরা যদি আত্মসমর্পণ করি, কী সুবিধা পাব?’

‘হাত-পা বেঁধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেব।’

‘তুমি বোঝাতে চাইছ যে খুন করবে না? আমি এতই বোকা যে বিশ্বাস করব?’

‘সবাই তোমার মত বেস্টিমান না,’ বলল রানা, ‘মনে রেখো, তোমার সামনে আর কোনও রাস্তা নেই। আবারও ফিরতে পারবে না ইয়েমেনে। তোমাকে উঠতে হবে ওঅল্ড কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায়।’

‘তোমাদের কাউকে বিশ্বাস করি না আমি!’ চিৎকার করে বলল জায়েদ।

‘সাহস থাকলে মুখোমুখি হও। এক পক্ষে তুমি, আরেক পক্ষে আমি। অন্যরা কিছুই করবে না তোমার।’

একটা প্রতিবিম্বে রানাকে দেখল জায়েদ।

স্টিলের একটা বালকহেডের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। গুলি করে লাভ হবে না। যদি উঠে দাঁড়িয়ে গুলি করে, ওকে দু’টুকরো করে দেবে লোকটা। যদি লুকিয়ে থাকে এখানে, মাসুদ রানার লোক কোণঠাসা করবে।

‘আমার কাছে আরও ভাল বুদ্ধি আছে,’ বলল জায়েদ। ‘তোমাকে বুঝিয়ে দেব ক্ষমতা কাকে বলে। উচিত শিক্ষা হবে তোমার।’

ল্যাপটপের দিকে চাইল জায়েদ। স্ক্রিনের সবুজ বক্স জানাচ্ছে ওর দেয়া নির্দেশ। ওদিক থেকে সাড়াও দেয়া হয়েছে। এবার নিশ্চিন্তে কাজে নামা যায়।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিল সে। আস্তে করে অফ করে দিল সেফটি ক্যাচ। অস্ত্রটা ধরল বুকুর পাশে।

‘তোমার সময় শেষ,’ বলল রানা।

কথা সত্যিই ঠিক, ভাবল জায়েদ। পিস্তলের নল ঠেকাল ডিবোয়ের মাথার পিছনে, টিপে দিল ট্রিগার। চাপা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ তুলল অস্ত্র। ছিটকে পড়ল ফ্রেঞ্চ প্রোগ্রামার। উড়ে গেছে কেরাটির অর্ধেক অংশ। জায়েদের পরের গুলিতে চুরমার হলো ল্যাপটপ কমপিউটার। নানাদিকে ছিটকে গেল ভাঙা প্লাস্টিক আর মাইক্রোচিপস। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবারও গুলি করল সে। টুকরো টুকরো হয়ে গেল ল্যাপটপের স্ক্রিন।

এবার অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জায়েদ, মাথার উপর হাত তুলে বলল, ‘ঠিক আছে, আমি আত্মসমর্পণ করছি।’

বালকহেডের আড়াল থেকে জায়েদের মতই শত্রুর প্রতিবিন্দু দেখছে রানা নিজেও। বুঝে গেছে, বড় কোনও গড়বড় আছে। অস্ত্র বের করেছে লোকটা, ভেবেছিল গুলি শুরু করবে সে। কিন্তু তা না করে গুলি করেছে ডিবোয়ের মাথায়।

রানা এখন জানে, লোকটার আস্তিনে নোংরা কোনও কৌশল আছে।

এবার অস্ত্র ফেলে মাথার উপর হাত তুলল আলেয়া বিনতে আব্বাস। উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা দু'জন।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এমএ কারবাইন তাক করল রানা জায়েদের বুকে। 'নড়লে মরবে।'

রানার পর পর এল আসিফ আর ডুডু, হাতে অস্ত্র। সরে গিয়ে দু'দিক থেকে কাভার করল ওরা।

ওদেরকে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে, বুঝতে পারছে রানা। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো মারা গেছে হ্যাভেলা, ডিবোয়ে, রেইডার অপারেটর আর আরেক ক্রু।

অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না রানার।

কিন্তু জায়েদের চোখে-মুখে ধূর্ততার ছাপ। যেন জুয়া খেলতে বসে চুরি করেছে ট্রাম্পের টেকা।

'তোমার মতলব কী?' মনে মনে বলল রানা। যে-কোনও সময়ে বুবি ট্র্যাপে পড়বে ওরা? বিস্ফোরিত হবে বোমা? 'না, অন্য কোনও ফাঁদ পেতেছ।'

চুপ করে আছে বেদুঈন নেতা।

ঘরে ঢুকল ইউনুস, সঙ্গে এক তরুণ।

'তোরা বেদুঈন হয়ে বেঈমানী করলি আমার সঙ্গে!'

'বেঈমানী তুই করেছিস আমাদের সবার সঙ্গে! মিথ্যা অজুহাতে কুয়ায় ফেলে মেরেছিস আমার বড় ভাইকে! মনুষ্যত্ব

বলে কিছু আছে তোর ভেতর? ইবনে কাল্ (কুত্তার বাচ্চা)! তুই যদি...'

‘গালাগালি থাক এখন,’ বাধা দিল রানা।

‘ধরা পড়েছে সাক্ষাৎ ইবলিশ,’ গলা নামিয়ে রানাকে বলল ইউনুস। পাশের তরুণকে দেখাল। ‘আমার ছোট ভাই। আমাদের দলে আরও তিনজন ছিল, গোলাগুলিতে মারা গেছে।’

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। চুরচুর হয়ে যাওয়া ল্যাপটপ কমপিউটারের উপর চোখ পড়ল ওর। মনে পড়ল, একটু আগে প্রোথামার ডিবোয়েকে খুন করেছে জায়েদ। নিশ্চয়ই কমপিউটার আর লোকটার খুন হয়ে যাওয়ার ভিতর সম্পর্ক আছে।

নীচে চিৎকার শোনা গেল।

ডুডুর লোক জড় হয়েছে ঘিরো ডেকে।

‘কী যেন হচ্ছে!’ তাদের একজন উঁচু গলায় বলল। ‘জ্যাস্ত হয়ে উঠেছে সাগর!’

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে এল রানা, কুয়াশার মাঝ দিয়ে দেখতে পেল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ভারত মহাসাগর।

‘মিস্টার ম্যানিনি, বাতি জ্বেলে দিন!’

প্রায় নাচতে নাচতে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে পৌঁছে গেলেন বিজ্ঞানী, একের পর এক সুইচ অন করছেন। এক সেকেন্ড পর জ্বলে উঠল দ্বীপের সব বাতি। ফ্লাডলাইটের আলো গিয়ে পড়ল সাগরে।

বুঝতে সময় লাগল না রানার, কী ঘটছে।

ফুটন্ত পানির মত বলকে উঠছে গোটা সাগর। ভেসে উঠেছে কালো অজস্র কী যেন, চারপাশ থেকে এগিয়ে আসছে দ্বীপের দিকে!

‘ন্যানোবটের পাল ডেকে এনেছে,’ নিচু, কাঁপা স্বরে বললেন ম্যানিনি। ‘উন্মাদটা মেরে ফেলতে চায় আমাদেরকে!’

গর্বিত, খ্যাতি লোকের মত হাসতে শুরু করল জায়েদ বিন মনযুর। হাসির কর্কশ আওয়াজটা উঠছে পেটের গভীর থেকে। ‘এবার তোমরা বুঝবে, ক্ষমতা কাকে বলে। আমাকে ছেড়ে না দিলে তোমাদেরকে খেয়ে ফেলবে ওরা!’

ছাব্বিশ

বেদুঈন লোকটা হাসতে শুরু করতেই রানা বুঝে গেছে, মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা। ঘুরেই আবারও কন্ট্রোল রুমে ঢুকল ও। কারবাইনের নল ঠেসে ধরল জায়েদের দু’চোখের মাঝে। গুড়গুড় করে উঠল ওর কণ্ঠ: ‘ফিরে যেতে বলো ওগুলোকে!’

‘আগে চলে যেতে দাও আমাদের,’ বলল জায়েদ, ‘সেক্ষেত্রে কথা রাখব আমি।’

‘ফিরে যেতে বলবে, নইলে পিছনের দেয়ালে ছিটকে গিয়ে লাগবে তোমার মগজ।’

হাসি-হাসি মুখে জানতে চাইল জায়েদ, ‘বদলে কী পাবে, মিস্টার রানা?’

তার চোখে চোখ রেখে বলল রানা, ‘মিস্টার ম্যানিনি, একটা কমপিউটারের সামনে বসুন। কোড ব্রেক করতে হবে।’

দৌড়ে গিয়ে আরেকটা ল্যাপটপের সামনে বসে পড়লেন বিজ্ঞানী। যোগাযোগ করলেন মেইন কম্পোলের সঙ্গে।

‘জীবনেও কোড ভাঙতে পারবে না গাধাটা,’ বলল জায়েদ। ‘সিস্টেমেই ঢুকতে পারবে না কিছুতে।’

মুখ তুলে চাইলেন ম্যানিনি। ‘আমার কৃতঘ্ন ছাত্র মিথ্যা বলেনি। ডিবোয়ের শেষ চালাকি ধরতে পারি, কারণ ওর ফাইলে ঢুকতে পেরেছিলাম। কিন্তু এই সিস্টেম সবদিক থেকে বন্ধ করা।’

‘হ্যাক করা সম্ভব নয়?’ শান্ত সুরে জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন বিজ্ঞানী। ‘নাইন ডিজিট কোড। প্রোটেক্ট করা হয়েছে টপ লেভেল এনক্রিপশন দিয়ে। এই কোড ভাঙতে গেলে সুপার কমপিউটারের লাগবে এক মাসেরও বেশি।’

‘অন্য কোনও উপায়?’ জানতে চাইল রানা।

‘আমি তো লগ ইন-ই করতে পারছি না!’

রানা এখন জানে, কেন মেরে ফেলা হয়েছে ডিবোয়েকে। নষ্ট করে দেয়া হয়েছে ল্যাপটপ। ওটাতে ছিল ডিবোয়ের কোড। কোড আর কখনও বলবে না ওই লোক। কি স্ট্রোক মেমোরি বা টেম্প ফাইল থেকেও কিছু জানা যাবে না। ওই ভাঙা ল্যাপটপ এখন স্রেফ জঞ্জাল।

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জ্যাসিণ্টা। ‘কী হয়েছে, রানা?’

‘খারাপ কিছু,’ বলল রানা। ‘আগে রোদে দেখেছ ন্যানোবট কীভাবে ঝলমল করে। কিন্তু এই দ্বীপের চারপাশে জড় হছে ওদের ঘন পাল। ওগুলোকে খাওয়ার মোড়ে রেখেছে জায়েদ। আসছে পঙ্গপালের মত সব খেয়ে নিতে।’

‘এখন কী করা উচিত?’ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চাইছে জ্যাসিণ্টা।

‘কোনওভাবে ঠেকানো যায়?’ বিজ্ঞানীর কাছে জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন ম্যানিনি। ‘ওরা আছে সাগরের চারপাশে পঞ্চাশ মাইল জুড়ে।’

‘সেক্ষেত্রে দ্বীপ থেকে সরে যেতে হবে,’ বলল রানা, ‘আপনার ওই এয়ারশিপগুলো কোথায়?’

‘হেলিপ্যাডের পাশে হ্যাঙার বে-তে।’

‘সবাইকে নিয়ে ওখানে চলে যান, সঙ্গে ল্যাপটপ নেবেন,’ বলল রানা। ডুডুর দিকে চাইল। ‘দলের সবাইকে আসতে বলুন। আকাশ পথে রওনা হব আমরা।’

‘নৌকা নেব না?’ জিজ্ঞেস করল ডুডু।

‘নৌকা করে গেলে খেয়ে ফেলবে এক ধরনের পোকা।’

ব্যালকনিতে চলে গেল ডুডু, গলা চড়িয়ে ডাক দিল দলের সবাইকে। ঘন ঘন হাত নাড়ছে উঠে আসবার জন্য। কসোল থেকে একটা মাইক্রোফোন নিলেন ম্যানিনি, সারি সারি লাউডস্পিকারের সাহায্য নিয়ে ব্রডকাস্ট করলেন দ্বীপ জুড়ে।

কন্ট্রোল কসোলের চ্যাপ্টা জায়গায় দুটো ছোট রেডিয়ো দেখল রানা। তুলে নিল ওগুলো, আরেক হাতে ঠেলে নিয়ে চলল জায়েদ বিন মনযুরকে এলিভেটোরের দিকে। ‘চলো!’

দু’মিনিট পেরোবার আগেই দলের সবাইকে নিয়ে আলোকিত হেলিপ্যাডে চলে এল রানা।

দ্বীপের এত উপর থেকে জমাট কালো সিমেণ্টের মত লাগল চারপাশের সাগর। ওখানে আছে কোটি কোটি গুবরে পোকাকার মতই ক্ষুধার্ত, ধাতব, যান্ত্রিক, খুদে দানব। ফ্লাডলাইটে ধূসর-কালো দেখাচ্ছে। উঠে আসছে ধাতব দ্বীপে।

‘মনে হচ্ছে ওগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে সাগর পেরিয়ে যেতে পারব,’ বলল আসিফ।

‘ভুলেও সে চেষ্টা করা উচিত হবে না,’ বলল রানা।

হেলিপ্যাডের পাশের হ্যাণ্ডারের দরজা খুলে ফেলা হয়েছে। বিজ্ঞানীর ক্রুরা বের করে আনতে লাগল একটা এয়ারশিপ। ভিতরে রয়েছে আরও দুটো।

‘প্রতিটা এয়ারশিপে ক’জন উঠতে পারবে,’ জানতে চাইল রানা।

‘নয় বা বড়জোর দশজন,’ বললেন ম্যানিনি।

‘দরকারী নয় এমন সবই ফেলে দেবেন,’ বলল রানা। ‘ওজন কমাতে পারেন কি না দেখুন।’

সুপারভাইস করতে চলে গেলেন ম্যানিনি। তাঁর সঙ্গে গেল আসিফ-তানিয়া।

হেলিপ্যাডের কিনারায় জায়েদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আলেয়া বিনতে আব্বাস, তার সামনে থামল জ্যাসিণ্টা। ‘তুমিই আমার বদলে এখানে অভিনয় করছিলে?’

‘ওর বেশি কাছে যেয়ো না,’ সতর্ক করল রানা।

‘তুমি দুর্বল চিণ্ডের মেয়েলোক,’ বলল আলেয়া। ‘অভিনয় করা কঠিন ছিল আমার জন্যে।’

বেদুঈন মেয়েটাকে কষে একটা চড় দিতে যাচ্ছিল জ্যাসিণ্টা, কিন্তু হাত ধরে ওকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিল রানা। বলল, ‘ওই মেয়েলোক তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইছে, তার চেয়ে অন্যদের কাজে সাহায্য করো গিয়ে।’

ঠোট ফোলাল জ্যাসিণ্টা, তবে তর্ক না করে চলে গেল বিজ্ঞানী ম্যানিনির হ্যাণ্ডারে।

‘যথেষ্ট খাতির হয়নি আমার সঙ্গে তোমার, নইলে খুশি হতে,’ বলল আলেয়া। ‘বিছানায় আমার খেলা দেখলে...

‘চুপ করো!’ বিরক্ত হয়ে ধমক দিল রানা। দেখল, আলেয়ার পাশে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে জায়েদ বিন মনযুর।

সব ক’জন দ্বীপবাসী উঠে এসেছে হেলিপ্যাডে, তাদেরকে হ্যাণ্ডারের দিকে পাঠিয়ে দিল উনিশতম রুয়ভেল্ট। তাদের একজন জানতে চাইল, ‘বন্দিদের কী হবে?’

জায়েদের দিকে চাইল রানা, ‘তোমার লোকের কী হবে? ওদেরকে তো খেয়ে ফেলবে ন্যানোবট।’

‘ওরা বাঁচবে কি মরবে, সেটা আল্লার চিন্তা, ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই,’ পরিষ্কার জানিয়ে দিল জায়েদ। ‘অত দরদ

থাকলে যাও, গিয়ে নিয়ে এসো ওদেরকে।’

‘আমার দলের কাউকে নীচে পাঠাব না,’ বলল গম্ভীর রানা।

‘তার মানে আমার সমানই নিষ্ঠুর তুমি।’ www.boighar.com

কঠোর চোখে বেদুঈন লোকটাকে দেখল রানা। কিছুই বলল না। নিরপরাধী কাউকে জেলখানায় পাঠিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারবে না ও।

‘শুনে রাখো কী করব আমরা,’ বলল রানা। ‘এয়ারশিপ নিয়ে উঠে যাব আকাশে। পড়ে থাকবে তুমি আর তোমার কুটিল প্রেমিকা। স্রেফ খেয়ে ফেলা হবে তোমাদের, আর এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে একবিন্দু দুঃখ পাবে না কেউ, ওই নরকের কীটগুলোও না। মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করোনি, একের পর এক খুন করেছ বিনা দ্বিধায়। তোমরাই এবার ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরবে।’

একটা ল্যাপটপ নিয়ে হেলিপ্যাডের মাঝখানে নামিয়ে রাখল রানা, একটু ঠেলে দিল জায়েদের দিকে।

চেহারা দেখে মনে হলো নার্সাস হয়ে উঠেছে আলেয়া। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নীচের ঠোট। সামান্য দ্বিধা নিয়ে জায়েদকে বলল, ‘কোড টাইপ করো।’

ওদের পিছনে আকাশে উঠবার জন্যে তৈরি দুটো এয়ারশিপ। পুরো ফুলে উঠেছে পড, বন বন করে ঘুরছে ফ্যান। পিছনে রয়ে গেছে তৃতীয় এয়ারশিপ, একটু পরেই রওনা হবে।

‘কত?’ জানতে চাইল রানা, ঘুরে চাইল না বিজ্ঞানী ম্যানিনির দিকে।

‘কিনারা থেকে নেমে গেলে, এয়ার অ্যাংকর চালু থাকলে, আর স্পিড থাকলে— আমার মনে হয় মোট এগারোজনের ওজন নেবে,’ বললেন ম্যানিনি। ‘তবে হিসাবে ভুল হতে পারে।’

‘একেক এয়ারশিপে বারোজন করে তুলুন।’

‘কিন্তু, সেক্ষেত্রে...’

নিষ্কম্প চোখে বিজ্ঞানীর চোখে তাকাল রানা। ‘আপনার সাহায্য আমার লাগবে।’ ছোট রেডিয়ো দুটোর একটা ম্যানিনিকে দিল। ‘সব বাড়তি ওজন রেখে যাব আমরা। অস্ত্রও দ্বীপেই থাকবে। এবার বলুন কত?’

‘বারো,’ বললেন ম্যানিনি। ‘আশা করি বারোজন আঁটব্লে।’

‘তার মানে মাত্র ছত্রিশজন,’ চট করে হিসাব কষে ফেলেছে জ্যাসিস্টা। ‘কিন্তু আমরা তো সাঁইত্রিশজন।’

সংখ্যাটা শুনে হাসল জায়েদ বিন মনযুর। ‘ভাল! তার মানে আমাদের সঙ্গে মরার জন্যে রয়ে যাবে কেউ একজন।’

নির্বিকার সুরে বলল রানা, ‘আমি থাকছি।’

সাতাশ

অতি পুরনো ডাইভিং গিয়ার পরে নাসের হৃদের গভীর পানিতে নামছে সোহেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রাসের হেলমেট ও মার্ক ভি স্যালভিজ গিয়ার বাতিল করে দিয়েছিল ইউনাইটেড স্টেটসের ডাইভাররা, প্রায় তেমনই প্রাচীন জিনিস দেয়া হয়েছে ওকে।

সুটের উপরে তিরিশ পাউণ্ডের স্টেইনলেস স্টিলের হেলমেট। কোমরে পঞ্চাশ পাউণ্ডের বেল্ট। পায়ে ভারী ওজনের বুট। শেষের জিনিসটা পরে হাঁটতে হলে মনে মনে বাপ-বাপ করত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এখন হৃদের মেঝেতে নামলে টলমল করবে সোহেল। কাঁধে এয়ার হোস, স্টিলের কেবল আর আল্ট্রা-সেট

ছিটকে দেয়ার হাই-প্রেসার লাইন।

অবশ্য, কিছু দূর নেমে যাওয়ার পর বাড়তি ওজনের জন্য খুশি হয়ে উঠল সোহেল। ভারী স্টিলের কেবলের কারণে স্রোতে ভেসে কোথাও গিয়ে পড়তে হবে না ওকে। ওর কেবল গেছে উপরের বোটে, নইলে সঠিক জায়গায় নামতে পারত না। এখন যদি ছিঁড়ে যায় কেবল, ভারী পাথরের মত নেমে যাবে মেঝেতে। হাজার হাজার বছর পরের আর্কিয়োলজিস্টরা ওর কঙ্কাল পেয়ে হতবাক হবে— আরে, সত্যিই তো এ এলাকায় সভ্য মানুষ ছিল!

ভ্যালি অভ দ্য ডেড-এর অংশ হতে ভীষণ আপত্তি আছে সোহেলের। আপাতত ওর একমাত্র ইচ্ছা: বাঁধ ভেসে যাওয়া ঠেকিয়ে দেয়া।

সুপারভাইয়ার আর ওর হিসাব ঠিক হলে, প্রধান ফাটল মেরামত করা অসম্ভব নয়। মরবে না লাখে লাখে মানুষ। হতে পারে, বাঁধের উপরের অংশ ভেসে যাবে, কিন্তু কাদার কোর আর বাঁধের ঢালু অংশ রক্ষা করবে গোটা ড্যাম।

উপচে যাওয়া বাথটাবের মত ঝরঝর করে পড়বে পানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থামতে হবে। অনেক নেমে যাবে হ্রদের জল-স্তর, বাঁধের অনেক উপরে রয়ে যাবে ফাটল।

কিন্তু কাদার কোরে যে গভীর সুড়ঙ্গ তৈরি করছে ন্যানোবট, সেখানে আছে পানির ভয়ঙ্কর চাপ। সে-কারণে দুর্বল হবে কোর। নীচে মস্ত ফাটল তৈরি হলে হ্রদের বিপুল পানির তোড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবে আসওয়ান ড্যাম।

বাঁধের নীচের ঢালু অংশে পা ঠেকল সোহেলের, হেলমেটের স্পিকারে শুনল খড়মড় আওয়াজ।

‘আপনি শুনছেন আমার কথা?’ জানতে চাইল সুপারভাইয়ার। পানি-সমতলে বোটে আছে সে। ঝুঁকি নিয়েছে নিজের জীবনের। সঙ্গে রয়েছে মেজর লুৎফর হোসেইনি ও এক টেকনিশিয়ান।

‘শোনা যাচ্ছে না বললেই চলে,’ বলল সোহেল ।

‘আমরা ফাটল থেকে এক শ’ ফুট দূরে,’ বলল সুপারভাইয়ার । ‘প্রতি তিন মিনিটে এক ফুট করে বাড়ছে ফাটল । তিরিশ মিনিট পাবেন কোরের সুড়ঙ্গ খুঁজে নিতে । তারপর পানির তোড়ে বাঁধের ওপাশে গিয়ে পড়ব আমরা ।’

আমার হিসাব ভিন্ন, ভাবল সোহেল । বিশ মিনিটের ভিতর ওই ফাটল যে পরিমাণ বড় হবে, স্রোত ঠেলে একই জায়গায় থাকতে পারবে না বোট ।

‘আমি কোনও অবস্থাতেই বাঁধের ওপাশের জলপ্রপাতে গিয়ে পড়তে চাইছি না,’ বলল সোহেল । ‘পাম্প করতে শুরু করুন ডাই ।’

ঘড়-ঘড় আওয়াজে চালু হলো ডাইভ-বোটের পাম্প । আল্ট্রা-সেটের প্রেশারাইয্‌ড হোসের সঙ্গে রয়েছে সেকেণ্ডারি লাইন ।

পানির অনেক নীচে হোসের মুখ থেকে প্রবল বেগে ছিটকাতে শুরু করেছে ফ্লুওরেসেন্ট কমলা কণা । হেলমেটের বাতির সুইচ টিপে আলো জ্বালল সোহেল । আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া পোকাকার মত চারপাশে ঘুরছে কমলা কণা । বামদিকের ঘোলাটে পানির দিকে ওগুলো পাঠাতে শুরু করেছে সোহেল ।

হেলমেটের আলোয় পানির নীচে বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না । বাঁধের নীচের দিকে ছুটছে কমলা কণা । ওদিকটা মৃত্যু-ফাঁদ । একবার ওই অংশের দ্রুতগতি স্রোত ওকে ধরে বসলে আর কোনওভাবেই ফিরতে পারবে না ।

চাঁদে হাঁটতে শুরু করা নভোচারীদের মত প্রাচীরের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে সোহেল । বাঁধের গায়ে সামনে-পাশে ছুঁড়ছে আঁঠা । ওর ধারণা, খুব কাছেই আছে ন্যানোবটের তৈরি সুড়ঙ্গ । হৃদের মেঝের ছোট-বড় সব বোল্ডারের উপর ছিটে পড়ছে কমলা আঁঠা ।

দশ মিনিটে বিশ পা গেল সোহেল, কিন্তু খুলল না কপাল। জানিয়ে দিল, 'বাঁধের আরও কাছে যেতে হবে। ফাটলের দিকে সরুন!'

'ওদিকে গেলে জোরালো স্রোত টেনে নেবে আমাদেরকে,' জানাল সুপারভাইসার।

'যা বলছি করুন, নইলে কাজ ফেলে চলুন ভাগতে শুরু করি,' জানিয়ে দিল সোহেল।

'একমিনিট!'

দশ সেকেন্ড পর স্টিলের কেবলের টান খেয়ে ভেসে উঠল সোহেল, পিছিয়ে চলেছে বাঁধের ফাটলের দিকে। ত্রিশ ফুট যাওয়ার পর মেঝেতে নামিয়ে দেয়া হলো ওকে।

চাঁদের মাটির মত রক্ষ পাথুরে জমিতে ধুপ্ করে নামতেই টের পেল, ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে স্রোত। নতুন উদ্যমে ট্রিগার টিপে ছিটাতে লাগল ফ্লোরেসেন্ট কণা। এক সেকেন্ড পর বুঝল, বামদিকে চলেছে কমলা কণা।

'দশ ফুট বামে সরুন,' বলল সোহেল।

'ফাটলের দিকে?'

'হ্যাঁ।'

হাঁটতে শুরু করেছে সোহেল। অনেক উপরে সরছে ডাইভ-বোটও। আবারও ট্রিগার টিপে ধরল, তাক করেছে ঘোলা পানির ঘূর্ণির ভিতর।

ছিটকে যাওয়া বলমলে কমলা কণা সাঁৎ করে ঢুকে যাচ্ছে রেলগাড়ির লাইনের মত দুটো কংক্রিটের বিমের মাঝে। শিকারি মাছের আক্রমণ এলে প্রবালের জঙ্গলে এভাবে চট্ করে লুকিয়ে পড়ে নিরীহ মাছ। এত দ্রুত হারিয়ে গেল প্রথম স্প্র, নিশ্চিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপতে হলো ওকে।

'সুড়ঙ্গের মুখ পেয়ে গেছি,' জানিয়ে দিল। 'ফুটো কংক্রিটের

দুই পাইলনের মাঝে । টেনে নিতে চাইছে আমাকে ।’

আরও কাছে সরে গেল সোহেল । দেখল, মেঝে থেকে টান খেয়ে ফাটলের ভিতর ছিটকে ঢুকছে বালি ও নুড়িপাথর । আরও সতর্ক চোখে দেখবার পর বুঝল, ওখানে রয়েছে বিশ ইঞ্চি পরিধির বৃত্তাকার এক সুড়ঙ্গ ।

কংক্রিটের একটা বিমে পা রেখে নিজেকে সামলে নিল সোহেল, ভয়ঙ্করভাবে টানছে সুড়ঙ্গের পানি । ‘আমি ছিপি হতে চাই না,’ ভাবল । মুখে বলল, ‘আমি কাদা ছিটাতে তৈরি!’

‘কাদা? কীসের কাদা পেলেন?’

‘ওই যে আপনাদের আল্ট্রা-সেট,’ বলল সোহেল । ঘূর্ণিপাকের টান খেয়ে কুঁজো হয়ে যাওয়ার জোগাড় ওর ।

‘পাম্প চালু করছি,’ জানাল সুপারভাইয়ার ।

বিশ ইঞ্চি ফুটোর ভিতর হোস-পাইপ ভরে দিল সোহেল । প্রেশার আসতেই টিপে ধরল ট্রিগার ।

হাই-প্রেশার্ড হোস ছিটাতে শুরু করেছে আল্ট্রা-সেট ।

পানিতে ছড়িয়ে পড়ল খানিকটা আঠা, মনে হলো লালচে রঙের ক্রিম । ছিটিয়ে গিয়েই শক্ত হয়ে উঠছে । প্রচুর পরিমাণে ওই জিনিস পানির প্রচণ্ড টানে ঢুকছে অনাকাঙ্ক্ষিত সুড়ঙ্গে ।

‘কতটা ফুলতে পারে এই জিনিস?’ জানতে চাইল সোহেল ।

‘অরিজিনাল ভলিউমের বিশ গুণ,’ জানাল সুপারভাইয়ার । ‘তারপর পাথরের মত শক্ত হয়ে যাবে ।’

তাতে কাজ হবে আশা করি, ভাবল সোহেল ।

এখনও কোর-এ সুড়ঙ্গ বড় করতে চাইলে, হয়তো আঠার ভিতর আটকা পড়ে জমাট বেঁধে যাবে ন্যানোবট । এভাবেই স্ফটিকে আটকা পড়ে পতঙ্গ ।

স্রোত বামে টেনে নিতে চাইছে সোহেলকে । শুনতে পেল, জলপ্রপাতের গুড়গুড় আওয়াজ । তার উপর দিয়ে এল বোটের

মোটরের গর্জন । এ ছাড়া রয়েছে পাম্পের ঘড়-ঘড় শব্দ ।

‘কোনও পরিবর্তন এল?’ আধ মিনিট পর জিজ্ঞেস করল সোহেল ।

‘কন্ট্রোল রুম থেকে বলছে, নীচের গিয়ার থেকে বেরোতে শুরু করেছে কমলা আঠা,’ জানাল সুপারভাইয়ার । ‘বদলে যাচ্ছে পানির ফোয়ারা ।’

‘আমাদের কাছে কতটা আছে এই জিনিস?’

‘টাক্ষিতে আছে পাঁচ শ’ গ্যালন,’ বলল সুপারভাইয়ার । ‘প্রতি মিনিটে পাম্প করবে দুই শ’ গ্যালন ।’

আশা করা যায় এতেই কাজ হবে, ভাবল সোহেল । ঘূর্ণিপাকের ভিতর পায়ের পাশে শক্ত করে ধরে রইল নয়ল ।

রেডিয়োতে এল মেজরের কণ্ঠ: ‘ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ, স্যার, আমরা উপরের ফাটলের অনেক কাছে । একই জায়গায় থাকতে গিয়েই ফুল পাওয়ারে ইঞ্জিন চালাতে হচ্ছে । দয়া করে তাড়াতাড়ি...’

মস্ত হেলমেটের জানালা দিয়ে উপরে চাইল সোহেল । মনে মনে বলল, ওকে, শালা, আমি কি পানির নীচে বসে বসে আয়েস করে রসগোল্লা খাচ্ছি? ব্যাটা বেল্লিক, তোকেই পিটিয়ে হাগিয়ে দেয়া উচিত!

বোটের নীচে জ্বলছে উজ্জ্বল সাদা বাতি । ঘূর্ণিপাকের ভিতর সাঁই-সাঁই করে ঘুরছে বোটের প্রপেলার ।

‘আমি কিন্তু ঠিক এখানে বসে আরাম করে লাঞ্চ সারছি না, মেজর,’ বিরক্ত সুরে বলল সোহেল ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নয়ল অফ করল । উঠে এল বোল্ডারে ভরা একটা জায়গায় । বড় এক বোল্ডারে পা ঠেকিয়ে আবারও নয়ল তাক করল সুড়ঙ্গের মুখ লক্ষ্য করে । অনেকটা বুজে হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ ।

সরু গর্তে নয়ল ভরে দিয়ে আবারও ট্রিগার টিপল সোহেল। ছিটকে গেল আল্ট্রা-সেট আঠা। তখনই টের পেল, পাল্টে যাচ্ছে চারপাশের স্রোত। দেরি না করে বলল, ‘হোস-এ ফুল প্রেশার পাঠান, যা করার এখনই! পরে আর সুযোগ থাকবে না!’

‘ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, স্যর, কন্ট্রোল রুম থেকে বলছে, গিয়ার থেকে অনেক কম আল্ট্রা-সেট বেরোচ্ছে!’

মাত্র শুনেছে সুসংবাদ, এমন সময় পাশ থেকে আসা জোরালো এক স্রোতে বাম পা পিছলে গেল সোহেলের। বোতলে জোর ঝাঁকি দেয়া সেভেন-আপের মত নয়ল থেকে নানাদিকে ছিটিয়ে গেল আল্ট্রা-সেটের লালচে ফেনা। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবারও হুমড়ি খেল সোহেল, বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিল ভালভ। ‘এবার নরক থেকে তুলুন আমাকে!’

হ্যাঁচকা টানে ঢালু জমি থেকে ওকে তুলে নিল স্টিলের কেবল। পরক্ষণে আবারও নামিয়ে দিল। উপর থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে না ওকে! টান আসছে একপাশ থেকে!

আছাড় খেতে গিয়েও সামলে নিল সোহেল, অবাক হয়ে গেছে। শালারা ওকে পাশ থেকে টানে কী করে?

উপর থেকে এল মেজরের আতঙ্কিত কণ্ঠ: ‘স্রোতের মাঝে পড়ে গেছি! টানের চোটে আমরা চললাম ফাটলের ওপাশে!’

আটাশ

অনেক উঁচু দালানের ছাতে হেলিপ্যাডে বইছে শীতল হাওয়া।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে তানিয়া। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। মনে ভীষণ ভয়, ক্ষুধার্ত ন্যানোবটের পালের মাঝে সত্যিই রয়ে যেতে চাইছে রানা! কথা বলতে গিয়ে চিড় ধরল ওর কণ্ঠে, ‘তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে, রানা!’

‘এমনিতেই বেশি লোক,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘আরেকজন উঠলে সবাইকে নিয়ে সাগরে গিয়ে পড়বে এয়ারশিপ।’

নীচের দিকে তাক করা আলোয় দেখা গেল, দ্বীপে উঠে আসছে ধাতব বালির মত যান্ত্রিক পোকা। ওই জিনিসে কালো হয়ে গেছে যিরো ডেকের মেঝে। সেন্ট্রাল পার্কের গাছপালার পাতা উধাও। স্টিলের সঙ্গে কংক্রিটে ঘষা লাগলে যেমন ধাতব আওয়াজ হয়, ঠিক সেরকম বিশী শব্দ হচ্ছে চারপাশে। কোটি কোটি ন্যানোবট একটা আরেকটার উপর দিয়ে হাঁটছে। উঠে আসছে দালানগুলোর দেয়াল বেয়ে।

গলা কেঁপে গেল জ্যাসিণ্টার, ‘কিন্তু রয়ে গেলে তো মারা পড়বে, রানা!’

‘মরব না,’ জোর দিয়ে বলল রানা।

তানিয়া খেয়াল করেছে, কঠোর চোখে সরাসরি জায়েদের চোখে চেয়ে আছে রানা।

‘জায়েদ কোড দেবে, নইলে মরতে হবে ওকেও।’

‘অত ভরসা কোরো না আমার ওপর,’ বাঁকা হাসল জায়েদ।

ওদের বামদিকে গতি তুলে ছুট দিল প্রথম এয়ারশিপ। কিনারা পেরিয়ে গেল, তারপর পড়তে লাগল নীচের দিকে। পড়ছে... পড়ছে... সোজা আছড়ে পড়বে যিরো ডেকে! সামনের দিকে এগোতে শুরু হতেই কমল পতনের গতি। মেঝে থেকে ত্রিশ ফুট উপরে পৌঁছে আবারও উঠে যেতে লাগল আকাশের দিকে।

‘তানিয়া, জ্যাসিণ্টা, তোমরা এয়ারশিপে ওঠো!’ তাড়া দিল

রানা ।

হতবাক হয়ে ওকে দেখল জ্যাসিণ্টা । হাঁ হয়ে গেছে মুখ । রানাকে ভাল করেই জানে তানিয়া । মনের জোরের প্রতিযোগিতায় নেমেছে দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট । হয় জিতে যাবে, নইলে মরবে— কোনওটাতেই যেন কোনও আপত্তি নেই ।

‘এসো, জ্যাসিণ্টা,’ মেয়েটাকে ডাক দিল তানিয়া । বাহু ধরে নিয়ে চলল দ্বিতীয় এয়ারশিপের দিকে । বারকয়েক ঘুরে রানাকে দেখল জ্যাসিণ্টা । প্রায় জোর করেই আকাশখানে ওকে তুলে দিল তানিয়া, নিজেও চাপল । ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ম্যানিনি ।

ভেজা কণ্ঠে বলল জ্যাসিণ্টা, ‘রানা মারা যাচ্ছে, আর আমরা...’

‘ও জানে কী করছে,’ বলল তানিয়া । ‘মনের জোরে ভাঙতে চাইছে ওই লোকের মন । জায়েদের কোড না পেলে গোটা পৃথিবীতে নেমে আসবে কেয়ামত ।’

‘জেদাজেদি করে কি আর আদায় করতে পারবে...’ চুপ হয়ে গেল জ্যাসিণ্টা ।

‘হয়তো পারবে,’ বলল তানিয়া । ‘নইলে আমরাও বাঁচব না । আমার মনে আছে, কি বলেছে ওই পিশাচ জায়েদ । সে যদি বাধ্য হয়ে শেষ নির্দেশ দেয়, শত শত হাজার কোটি ন্যানোবট তৈরি হয়ে খেয়ে ফেলবে দুনিয়ার সব প্রাণী-গাছ— সব । আরেকটা কথা ভেবেছে রানা, নিজে এয়ারশিপে উঠলে ওর বদলে অন্য কাউকে নেমে যেতে হবে । নিশ্চিতভাবেই মরবে সে । কিন্তু রানাকে যতটুকু জেনেছি, সত্যিকারের নেতা ও, মরলে মরবে, কিন্তু দলের কাউকে নির্ধাৎ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে না ।’

‘এবার সবাই খুব সাবধান!’ এয়ারশিপের প্রতিটি ফ্যান ফুল

স্পিডে চালু করে দিয়েছেন ম্যানিনি। ‘রেডি তো?’

সবাইকে দেখে নিয়ে বলল তানিয়া, ‘আমরা রেডি।’

একটু আগে ওজন কমাবার জন্য রাইফেল, বুট আর অন্যান্য ভারী জিনিস এয়ারশিপ থেকে ফেলে দিয়েছে ডুডুর লোকরা।

এয়ারশিপ ছুটতে শুরু করতেই তানিয়ার হাত শক্ত করে ধরল আসিফ। কিনারা পেরিয়ে যেতেই শ্বাস আটকে ফেলল তানিয়া। ওর মনে হলো, চেপে বসেছে রোলার কোস্টারে। নাড়িভুঁড়ি উঠে আসতে চাইল গলার কাছে। নীচে নাক তাক করেছে এয়ারশিপ, বেড়ে গেল পতনের গতি।

তানিয়া দেখল, সাঁই-সাঁই করে ওদের দিকে উঠে আসছে ন্যানোবট ভরা কালো সেক্ট্রাল পার্ক। যথেষ্ট দ্রুত কমছে না পতনের গতি।

‘মিস্টার ম্যানিনি...’

‘কিছু ধরে বসে থাকুন!’ পাল্টা চ্যালেজ বিজ্ঞানী।

ঝড়ের গতিতে নেমে চলেছে এয়ারশিপ। লিভার, সুইচ আর বাটন নিয়ে হুড়োহুড়ি করছেন ম্যানিনি। খুব কাছে ডেক, ওখান থেকে আসছে মৃদু কট-কট আওয়াজ। সব খেয়ে ফেলছে ধাতব, খুদে যন্ত্র। পতনের গতি কমল, তারপর সিধে হলো এয়ারশিপের মেঝে। পার্কের পাতাহীন, ন্যাড়া, উঁচু গাছের মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

ধীরে ধীরে উঠছে এয়ারশিপ, পিছনে পড়ল ভাসমান দ্বীপ, নীচে এখন কালো ভারত মহাসাগর।

‘এয়ারশিপ এবার তুমি চালাও,’ চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে বললেন ম্যানিনি। ‘স্পিড ধরে রেখো। বেশি দূরে যাবে না, ওয়াই-ফাই থেকে সিগনাল ধরতে হবে।’

‘আপনি এবার কী করবেন?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘কমপিউটার নিয়ে বসব,’ বললেন বিজ্ঞানী।

‘কমপিউটার? ওটা দিয়ে কী হবে?’

মাথা নাড়লেন ম্যানিনি। ‘এখনও জানি না। বলতে পারবে
আপনাদের বন্ধু।’ www.boighar.com

উনত্রিশ www.boighar.com

বুকে সামান্যতম ভয় বলতে কিছুই নেই বলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রানার সঙ্গে আর্মিতে যোগ দিয়েছিল সোহেল আহমেদ। আর্মিতে দ্রুত পদোন্নতি হচ্ছিল দু’জনের, কিন্তু মেজর জেনারেল রাহাত খানের ডাকে আর্মি ছেড়ে পিসিআই-এ চলে গেল রানা। রানাকে ছাড়া একা একা কিছু ভাল লাগছিল না সোহেলের। আড়াই বছর পর, ও তখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, আর্মি থেকে বিদায় নিয়ে ও-ও গিয়ে ঢুকেছিল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে, রানার জুনিয়র হিসেবে। বন্ধুর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একের পর এক দুঃসাহসিক অ্যাসাইনমেন্টে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে তরতর করে মই বেয়ে উঠে গেছে ওরা অনেক উঁচু পর্যায়ে। রাহাত খানের চোখে এখন রানার পরেই ওর গুরুত্ব। দায়িত্ব পালনে কখনও দ্বিধা করেনি ও, সহকর্মীদের প্রিয় সোহেল ভাই হয়ে উঠেছে নিজ গুণে।

কিন্তু সব কিছুর শেষ বলে একটা কথা আছে। আর তা-ই এই মুহূর্তে সত্যিই মন খারাপ ওর। হাতের কাজ শেষ করতে পারল না। আরও কত কী করা বাকি রয়ে গেল, ভালভাবে দেখাও হলো না সুন্দর এই রঙিন দুনিয়া; অথচ এখন খামোকা

মরে যেতে হচ্ছে ওকে ভাঙা আসওয়ান ড্যামের প্লাবনে!

‘ড্যাম ইউ, বাস্টার্ড ড্যাম!’ বিড়বিড় করল সোহেল।

উঁচু বাঁধের চওড়া ফাটলের দিকে হিড়হিড় করে ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে প্রবল স্রোত। খপ্ করে ধরেছে, ছিটকে ফেলে দেবে অনেক উপর থেকে। সরবার উপায় নেই। আটকা পড়ে গেছে বোটের স্টিলের কেবল আর এয়ার হোসের বাঁধনে।

স্টিলের কেবল বা হোস কাটলেও মুক্তি নেই। ওয়েইট বেল্ট ফেলে দিলেও ওর পরনে রয়ে যাবে পঞ্চাশ পাউণ্ডের গিয়ার। চাইলেও সাঁতরে উঠে যেতে পারবে না।

হৃদের মেঝেতে পা ঠেকল ওর, কিন্তু সিধে হতে পারল না, পাশ থেকে আবারও এল জোরালো টান।

‘আরও লাইন ছাড়ুন!’ নিজের চিৎকার শুনল সোহেল। ‘জলদি, মেজর!’

অনেক উপরে বোটের তলদেশ দেখল। ওখানে স্রোতের ভিতর ঘুরছে প্রপেলার, সাদা, ফসফোরেসেন্ট ফেনা তুলছে। সরে যেতে চাইছে বোট ফাটলের কাছ থেকে। নাক তাক করেছে উজানের দিকে। এখন ডানে বা বামে ঘুরলে সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের প্রবল টানে খালের মত জায়গাটা দিয়ে পড়ে যাবে অনেক নীচের নীল নদের বুকে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর ঢিলা হয়ে গেল স্টিলের কেবল। বোল্ডারের এলাকা থেকে বাঁধের ঢালু অংশে নামল সোহেল। টলতে টলতে চলেছে, কয়েক ফুট যাওয়ার পর পাশে পেয়ে গেল সেই ভিডার্লিউ মাইক্রোবাসের অর্ধেক আকারের এক বোল্ডার। দুই বছরের বাচ্চার মত টলোমলো পায়ে ওটা ঘুরল সোহেল, আরও দু’বার পাক খাওয়ার পর বুঝল, ভালভাবেই ওর কেবলে পেঁচিয়ে গেছে বোল্ডার। উপরের দিকে একবার দেখে নিয়ে হাঁক ছাড়ল: ‘টানটান করুন কেবল!’

তিন সেকেণ্ড পর লোহার পাতের মত কঠিন হয়ে গেল কেবল, এঁটে বসেছে বোল্ডার ঘিরে। উপরে স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ছে বোট।

‘শক্ত করে আটকে রেখেছি কেবল,’ জানাল মিশরীয় মেজর। ‘নীচে কী হয়েছে, স্যর?’

‘আপনাদের জন্যে নোঙর তৈরি করেছি,’ জানিয়ে দিল সোহেল। ‘এবার বলুন, আপনাদের কেউ জানেন সেক্সট্রাপেটাল ফোর্স সম্পর্কে?’ একবার বোল্ডার পাক খাওয়া কেবলের দিকটা দেখে নিল। মনে হলো যে-কোনও সময়ে ছিঁড়ে পড়বে কেবলের ইম্পাতের সব তত্ত্ব।

‘হ্যাঁ, জানে,’ বলল মেজর। ‘সুপারভাইয়ার।’

‘তো পাথুরে তীরের দিকে তাক করুন বোট,’ বলল সোহেল। ‘কেবল টিকে গেলে, বোটের বো তাক করবেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি। দেরি না করে পুরো গতি তুলবেন ইঞ্জিনের। স্রোতের টান কেটে সোজা গিয়ে উঠবেন তীরে। আমাকে তুলে নেয়ার জন্যে সময় ব্যয় করবেন না।’

‘বুঝলাম,’ বলল মেজর। ‘আমরা চেষ্টা করব।’

একপাশে সরতে লাগল বোট, পাল্টে যাচ্ছে গতিপথ। চাঁদ ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের মতই নীচের স্টিলের কেবল বাধ্য করছে বোটটাকে সরে যেতে। পূর্ণগতি তুলে চলছে ইঞ্জিন। প্রবল স্রোতের ভিতর ছিটকে সামনে বাড়তে চাইল বোট।

কয়েক সেকেণ্ড পর পানির নীচেও জোরালো ‘টোয়াং!’ আওয়াজ শুনল সোহেল। ছিটকে পড়ে গেল পিছনে।

ভয়ঙ্কর চাপ নিতে না পেরে ছিঁড়ে গেছে ইম্পাতের কেবল।

প্রথমে উপরের ফাটলের স্রোতের অমোঘ টানে রওনা হয়ে গেল সোহেল, কিন্তু দুই সেকেণ্ড পর ওর লাইন আর হোস টান দিল অন্যদিকে। ক্ষিপ্ৰ হরিণের মত অগভীর পানির দিকে ছুট

দিয়েছে বোট। বোল্ডার ভরা মাঠে বারবার ঠোকর খেতে খেতে রওনা হয়ে গেল সোহেল। ‘ঠং-ঠকাং’ আওয়াজ শুনছে, মনে হচ্ছে সংঘর্ষ হচ্ছে সব গাড়ির ভিতর। হঠাৎ করেই স্টেইনলেস স্টিলের হেলমেটের ভক্ত হয়ে গেল ও।

বোটের দৌড় থেমে যেতেই দেখল, ও আছে মাত্র তিরিশ ফুট পানির নীচে। পানিতে টইটমুর সুট। ফুটো হয়েছে এয়ার হোস, অথবা প্যাঁচ পড়ে গেছে, আর আসছে না বাতাস। আগেই জানে, সাঁতার কেটে উঠতে পারবে না; কিন্তু কে বলেছে ঢালু টিলা বেয়ে উঠে যেতে পারবে না?

কংক্রিটের পাইলন আর বোল্ডারের মাঝ দিয়ে আবর্জনা ঘাঁটা র‍্যাকুনের মত হামাগুড়ি শুরু করল সোহেল। কোমর থেকে খুলে ফেলল ওয়েইট বেল্ট। যত উপরে উঠছে, আরও উজ্জ্বল হচ্ছে বোটের নীচের বাতি। একটু পর ফুসফুসে শুরু হলো বেদম ব্যথা, বুক ফেটে যাচ্ছে অক্সিজেনের অভাবে; এমন সময় রহস্যময় লকনেস হ্রদের ভয়ঙ্কর কোনও অদ্ভুত প্রাণীর মত ভুস্ করে উঠে এল ও। পানি-তল থেকে উঠে বহু গুণ বেড়ে গেছে ভারী হেলমেট আর হার্নেসের ওজন। সাধ্য নেই গা-মাথা থেকে নামাবে এসব। থাকুক ওগুলো। দুই বোল্ডারের মাঝের সরু এক ফাটলে শুয়ে পড়ল সোহেল চোখ বুজে। কিন্তু চট করে বুঝে গেল, পৃথিবীতে আসলে শান্তি বলতে কিছুই নেই। ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কারা যেন। মাথা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলা হলো হেলমেট। পাকা মছয়া ফল খেয়ে বেহেড মাতাল ভালুকের মত ওকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লেগেছে কে যেন! পচা-পচ ওর দুই গালে পড়ছে চুমু।

‘আমরা কি পেরেছি?’ দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল সোহেল।

‘পেরেছেন! পেরেছেন!’ নাচের ফাঁকে আরও জোরে ওকে জাপ্টে ধরল মেজর লুৎফর হোসেইনি। ‘আপনি পেরেছেন,

স্যর!’

‘তাই বলে মানুষ খুন করবেন নাকি, ভাই?’ মৃদু হেসে ফেলল হতক্রান্ত সোহেল। ‘ছাড়ুন! পাঁজর তো সব চুর-চুর হয়ে গেল!’

ত্রিশ

যেন বাড়ছে লক্ষ-কোটি ঝাঁঝি পোকাকার কর্কশ শব্দ, কোটি কোটি ন্যানোবটের পাল নড়েচড়ে তৈরি করেছে ভুতুড়ে ওই আওয়াজ। উঁচু টাওয়ারের হেলিপ্যাড লক্ষ্য করে উঠে আসছে নরকের কীট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পতঙ্গ। নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে রানা, চোখ-মুখ স্বাভাবিক। কিন্তু আলেয়া বিনতে আব্বাস আর জায়েদ বিন মনযুর পড়েছে ভীষণ অস্বস্তির ভিতর।

কিনারা থেকে চট করে নীচে চাইল আলেয়া, চোখ পড়ল দালানের নীচের দেয়ালে। শিউরে উঠল একবার। অনেক নীচ থেকে রওনা হয়ে চার ভাগের তিন ভাগ অংশ ছেয়ে ফেলেছে ধূসর পোকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে আসবে হেলিপ্যাডে। আর তারপর...

‘ওকে কোড দিয়ে দাও,’ কাঁপা স্বরে বলল আলেয়া।

‘কক্ষনো না,’ কঠোর কণ্ঠে জানিয়ে দিল জায়েদ।

‘ওই মেয়ের কথা শুনলেই ভাল করবে,’ বলল রানা। ‘বাজে মেয়েলোক ও, কিন্তু তোমার মত বোকা নয়।’

‘জায়েদ, আমাদের লোকবল আছে, টাকা আছে, ভাল উকিল

ঠিক করতে পারব,’ বলল আলেয়া, ‘আমাদেরকে মরতে হবে না।’

‘চুপ করো!’ ধমক দিল জায়েদ।

দুই হাতে জায়েদের বাম বাহু আঁকড়ে ধরল আলেয়া। মিনতি করল, ‘প্লিজ, জায়েদ!’

ধাক্কা দিয়ে মেয়েটার হাত সরিয়ে দিল জায়েদ, খপ্ করে ওর শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে কাছে এনে কঠোর চোখে দেখল সুন্দর মুখটা। ‘তুমি আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ, মেয়েলোক!’

জবাবে কিছু বলতে পারল না আলেয়া বিনতে আব্বাস, তার আগেই জোর ধাক্কা দিয়ে তাকে কিনারা থেকে নীচে ফেলে দিল জায়েদ।

পড়তে শুরু করে তীক্ষ্ণ চিৎকার জুড়েছে মেয়েটা। দশ তলা থেকে সরাসরি পড়ল ছয় ইঞ্চি পুরু ন্যানোবটের কার্পেটের ওপর, তুমুল বেগের হাওয়ায় উড়তে থাকা ধুলোর মত নানাদিকে ছিটকে গেল খুদে যন্ত্রগুলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে পড়ে থাকল আলেয়া বিনতে আব্বাসের মৃতদেহ, তারপর হারিয়ে গেল ধূসর-কালো চাদরের নীচে। খেয়ে ফেলা হচ্ছে হাড়-মাংস সব!

কয়েক মুহূর্ত ওদিকে চেয়ে রইল জায়েদ বিন মনযুর, চোখে-মুখে রাগ ও ঘৃণা। কিন্তু তার চোখে সামান্য ভয়ও দেখেছে রানা। যত দ্রুত খেয়ে ফেলল ওই মেয়েকে, আতঙ্কিত না হওয়ার কোনও কারণ নেই। সবার চেয়ে ভাল জানে ও নিজে, কী করতে পারে ওসব যান্ত্রিক পোকা।

‘ভাল করে দেখে নাও, জায়েদ,’ বলল রানা। ‘ঠিক এভাবেই মরবে তুমি। এতে আপত্তি নেই তো?’

ওদের দিকে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু। সব আলো খেয়ে নিয়ে উঠে আসছে হেলিপ্যাডে। হ্যাণ্ডারের উপরের উজ্জ্বল হ্যালোজেন

বাতি বা হেলিপ্যাডের লাল পোস্ট বাতির আলোয় দেখা গেল ওগুলো আর মাত্র একতলা নীচে!

রানার মনে হলো, আগের চেয়ে অনেক অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে বেদুঈন। কথা বলতে গিয়ে একটু কেঁপে গেল তার গলা, 'তুমিও আমার সঙ্গেই মরবে।'

'নিজের দেশ, বা দেশের মানুষের জন্যে মরতে আপত্তি নেই আমার,' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল রানা। 'দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধা নেই। কোনওভাবেই জিততে দেব না তোমাকে। ...আমি প্রাণ দেব সবার মঙ্গলের জন্যে, কিন্তু কী নীতির জন্যে প্রাণ দেবে তুমি?'

হতবাক হয়ে রানাকে দেখল জায়েদ, চোখে-মুখে ক্রোধ। ঠোট বাঁকা করে হাসতে চাইল, সরু হয়ে গেছে দুই চোখ। বুঝে গেছে, ভাঁওতা দিয়ে পার পাবে না। মরলে কিছুই পাবে না। কিছুই থাকবে না। না সম্পদ, না ক্ষমতা, ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না ওর কথা। এতদিন নিজের রাগ-জেদ-কঠোরতা বা নিজের ক্ষমতার বলয়ের ভিতর বাস করেছে। কিন্তু এখন যদি মরেই যেতে হয়, এরপর ন্যানোবটের পাল দুনিয়া ধ্বংস করল কি না, তাতেই বা তার কী— কোথায় স্বস্তি বা সান্ত্বনা?

রানা ওকে বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আর তাই ওর প্রতি ভয়ঙ্কর ঘৃণা বোধ করল জায়েদ। এই ক্রোধ পাগল করে তুলল তাকে, উন্মত্ত ষাঁড়ের মত রানার দিকে তেড়ে গেল সে। নিজ হাতে খুন করবে বদমাস লোকটাকে!

সুযোগ পেয়েও জায়েদকে গুলি করল না রানা, একপাশে সরিয়ে নিল রাইফেল, ওটা ব্যবহার করল দুই হাতে ধরা লাঠির মত। খটাস্ করে আঁটকে দিল শত্রুর অগ্রগতি। বুকে ধাক্কা খেয়ে থমকে গেছে বেদুঈন। ওকে উল্টো পিছনে ঠেলল রানা। চিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে জায়েদ, এমনি সময় ধাঁই করে তার তলপেটে

লাথি বসিয়ে দিল রানা। প্রায় উড়তে শুরু করে ছিটকে পিছনের মেঝেতে গিয়ে পড়ল জায়েদ।

মাত্র দুই সেকেণ্ডে নিজের ভারসাম্য ঠিক করে নিল রানা।

ওদিকে লাফিয়ে উঠে আবারও তেড়ে এল জায়েদ। ব্যথা যা পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি চোট লেগেছে অন্তরে।

‘বহুকাল বোধহয় কারও সঙ্গে লড়তে হয়নি তোমার?’ জানতে চাইল রানা, ‘খালি মেরেই এসেছ এতদিন?’

দৌড়ের মাঝে ঝুঁকে মেঝে থেকে একটা পাইপ তুলে নিল জায়েদ। ওটা ফেলা হয়েছে এয়ারশিপ থেকে। তলোয়ারের মত করে ওটা হাঁকাল সে। www.boighar.com

পাকা লাঠিয়ালের মত দুই হাতে রাইফেল ধরেছে রানা, লিটল জনের মত খটাস্ করে ঠেকিয়ে দিল পাইপ, পরক্ষণে রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি নম্নল জায়েদের চোয়ালে। ঠাস্ করে ফেটে গেল লোকটার মুখের একপাশ, জখমটা থেকে বেরোতে লাগল রক্ত।

টলমল করতে করতে পিছিয়ে গেল জায়েদ। হাত থেকে ফেলে দিয়েছে পাইপ, দুই হাতে ধরল রক্তাক্ত জখম। সামনে বেড়ে লাথি দিয়ে কিনারা থেকে পাইপ ফেলে দিল রানা।

অন্ধকারে নীচে যাওয়ার সময় অদ্ভুত বাঁশির মত ফাঁপা আওয়াজ তুলল পাইপ।

এদিকে হেলিপ্যাডের কিনারায় পৌঁছে গেছে ধূসর ন্যানোবট। কালো কোনও আঙুলের মত এগোচ্ছে সমতল মেঝেতে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে রানা ও জায়েদকে।

হাতে সময় নেই আর, ভাবল রানা।

রক্তাক্ত মুখ মুছে চিৎকার করল জায়েদ, ‘তোমার হাতে ওই রাইফেল না থাকলে খুন করে ফেলতাম খালি হাতে!’

হেলিপ্যাডের উপর থেকে রাইফেল ফেলে দিল রানা নীচে,

নিজেরও খেপে গেছে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এসো, প্রমাণ হোক কে সেরা! বাঁচতে চাই আমি, মৃত্যুতেও আপত্তি নেই—যেহেতু একটা আদর্শ আছে আমার, হাজার হাজার মানুষ কাঁদবে আমার মৃত্যুতে। কিন্তু তুমি? তুমিও বাঁচতে চাইছ, কিন্তু সেটা শুধু নিজের জন্যে। আসলে কারও কাছেই তোমার একপয়সা দাম নেই! মরতে খুবই আপত্তি তোমার, তোমার দুই চোখে মৃত্যুভয় দেখেছি আমি!'

উঠে দাঁড়িয়ে আবারও তেড়ে এল জায়েদ। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

দৃঢ়ভাবে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে রানা। জায়েদ ছুটে আসতেই ডান কাঁধ পিছিয়ে নিয়ে ভয়ঙ্কর একটা ঘুষি মারল লোকটার পাঁজরে। পরক্ষণে দুই হাতে জ্যান্টে ধরল তাকে, জুড়োর কায়দায় দড়াম করে আছড়ে ফেলল ধাতব মেঝের উপর।

ক্ষিপ্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত জায়েদের ওপর চড়াও হয়েছে রানা। খেয়াল করল না, আছাড় খেয়েই পোশাকের গোপন পকেট থেকে ছোরা বের করেছে লোকটা। কবজি ধরে ফেলবার আগেই রানার বাহুর উপর নামল পোচ।

ফিনকি দিয়ে বেরোল রক্ত। তীব্র জ্বলুনি আগুন ধরিয়ে দিল রানার মগজে। তখনই খপ করে ধরল জায়েদের কবজি, হাতটা মুচড়ে ধরে উল্টো চাপ দিল। ব্যথায় নীল হয়ে গেল জায়েদ, সেই অবস্থায় রানার প্রচণ্ড তিনটে ডানহাতি ঘুষি এসে পড়ল ওর শরীরের বিভিন্ন ভাইটাল পয়েন্টে। নেতিয়ে পড়ল লোকটা শক্ত মেঝের উপর।

হাত থেকে ছোরা ছুটে গেছে জায়েদের। আবারও ওটা ধরবার আগেই এক থাবা দিয়ে ছোরা সরিয়ে দিল রানা, ঘুরতে ঘুরতে ন্যানোবটের স্রোতের দিকে চলে গেল অস্ত্রটা।

লড়তে চাইলে এখনই, নইলে আর কখনও না— উঠে দাঁড়াতে চাইল জায়েদ বিন মনযুর। কিন্তু নাকের ওপর নামল রানার কনুইয়ের গুঁতো। ঠাস্ করে মেঝেতে বাড়ি খেল তার মাথার পিছন দিক। খপ্ করে এক মুঠো চুল ধরে জায়েদের মাথা কাত করল রানা। এবার সে পরিষ্কার দেখবে পিলপিল করে আসছে ন্যানোবট!

‘দেখো ওদের!’ ধমকে উঠল রানা, ‘দেখো, তোমার তৈরি জিনিস তোমাকেই খায় কীভাবে!’

উঠে লড়াই করবার সাধ্য আর জায়েদের নেই। হতভম্ব চোখে দেখল ধূসর কণা। অনেক কাছে, ঘিরে ফেলছে ওদেরকে! দ্রুত ছোট হয়ে আসছে বৃত্ত!

কয়েক ফোঁটা রক্ত পেয়ে ন্যানোবটের পালের এক অংশ থামল। একটার ওপর দিয়ে সামনে বাড়ছে আরেকটা। ওপরের আলোয় চকচক করছে। কর্কশ আওয়াজ তুলছে। ব্ল্যাকবোর্ডে নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে এমন আওয়াজ হয়।

‘কোড জানিয়ে দাও!’ ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

কয়েক ফুট দূরে মেঝেতে ল্যাপটপ কমপিউটার, কিন্তু ওটাকে ঘিরে ফেলেছে ন্যানোবট। খেয়ে ফেলছে ওটার প্লাস্টিক বডি, স্ক্রিন— সব!

তিক্ত চেহারা করে বলল জায়েদ, ‘জানলেই বা কী করবে? বাঁচবে কী করে?’

‘অন্তত জেনে মরব কোডটা আসলে কী ছিল!’ জায়েদের মাথা মেঝেতে ঠেসে ধরেছে রানা। পাশ ফিরে আছে জায়েদ, গাল লেগে আছে মেঝেতে। বিস্ফারিত চোখে ন্যানোবটের দিকে চেয়ে আছে সে। খুবই কাছে চলে এসেছে নিষ্ঠুর মৃত্যু!

ভয়ের ছাপ পড়ল জায়েদের চোখে-মুখে। কাঁপছে দুই ঠোঁট। গালের রক্তাক্ত জখমে উঠল প্রথম কয়েকটা ন্যানোবট। ঠোঁটেও

উঠছে! চোখে ঢুকছে! তার মনে হলো, তাকে অ্যাসিড মারা হচ্ছে!

‘জায়েদ! দেরি হওয়ার আগেই...’

‘১৩১-৬৯৯-৫২৫!’ চিৎকার করে বলল জায়েদ। ‘কিন্তু তাতে তোর কোনও লাভ নেই রে, হারামজাদা!’

উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। ‘শুনতে পেয়েছেন, ম্যানিনি?’

রানার পকেটের ভিতর থেকে পিনপিনে কণ্ঠ এল: ‘ট্রান্সমিট করছি!’

ধাতব আওয়াজ কমল না। জায়েদকে নিয়ে পিছিয়ে গেল রানা। ছোট হয়ে উঠছে নিরাপদ বৃত্ত। ছোট, গোল একটা টেবিলের মত জায়গা থাকল। আসছে ন্যানোবট চারপাশ থেকে। তারপর দাঁড়াবার মত জায়গা রইল ম্যানহোলের সমান।

‘মিস্টার ম্যানিনি!’ জানতে চাইল রানা।

তখনই হঠাৎ করে থেমে গেল কাছের সব আওয়াজ। ধাতব শব্দের একটা ঝড় যেন সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

দালানের দেয়ালের ন্যানোবট খসে পড়ল নীচের সাগরে কালো-ধূসর চাদরের মত। হাওয়ায় ওড়া ধুলোর মত যিরো ডেক থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। আবারও শোনা গেল স্বাভাবিক সব আওয়াজ। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলছে প্রকাণ্ড ভাসমান দ্বীপ। আকাশে ঘুরছে তিনটে এয়ারশিপ।

‘মিস্টার ম্যানিনি, গুড জব,’ বলল রানা, ‘নেমে আসুন।’

একত্রিশ

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে রানা। কিছুক্ষণ হলো আকাশে ঘুরছিল তিনটে এয়ারশিপ, এবার নেমে পড়বে হ্যাণ্ডারের সামনের হেলিপ্যাডে। ভাসতে ভাসতে এল প্রথম এয়ারশিপ হেলিপ্যাডের দিকে। নীচের দিকে তাক করেছে ফ্যান, নামবে রেট্রো-রকেট ব্যবহার করা জেট বিমান, বা চাঁদে অবতরণকারী নভোচারীদের মহাকাশযানের মতই। জোর হাওয়ায় আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের মত ছিটকে পড়ছে ন্যানোবট। ধাতব বালির মত বাতাসে ভাসছে, গিয়ে পড়ছে যিরো ডেকে।

কয়েক ফুট দূরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে জায়েদ বিন মনযুর। উড়ে যেতে দেখছে হালকা মেঘের মত ন্যানোবট।

হেরে যাওয়া মানুষ জায়েদ, অদ্ভুত করুণ তার চোখ-মুখ, খেয়াল করল রানা।

‘তুমি আমাকে জেল খাটাবে,’ নিচু স্বরে বলল জায়েদ।

‘দুই শ’ বছরেরও বেশি সাজা হবে, বেরোতে পারবে না এই জীবনে,’ বলল রানা।

‘তোমার কি মনে হয় জেলে থাকার মত মানুষ আমি?’ মুখ তুলে রানাকে দেখল বেদুঈন নেতা।

‘বন্ধ পাগল হয়ে যাবে,’ আন্তে করে মাথা দোলাল রানা।

হেলিপ্যাডের কিনারা দেখল জায়েদ। ওই গাঢ় অন্ধকার

হাতছানি দিচ্ছে ওকে । ‘আমাকে ছেড়ে দাও, রানা ।’

অন্তরে বুঝে গেল রানা, কী বলা হয়েছে । আন্তে করে মাথা নাড়ল ও । ‘মাফ করার মত কাজ তুমি করোনি ।’

‘পরাজিত শত্রুর প্রতিও তো দয়া দেখাতে পারো?’ করুণ শোনাৎ জায়েদের কণ্ঠ । www.boighar.com

নিষ্পলক চোখে তাকে দেখল রানা । কয়েক মুহূর্ত পর এক পা পিছিয়ে গেল ।

যা বুঝবার বুঝে গেছে জায়েদ, উঠে দাঁড়িয়ে রানাকে একবার দেখল সে । ‘অনেক ধন্যবাদ, রানা ।’

ঘুরেই এক ছুটে কিনারা পেরিয়ে গেল বেদুঈন নেতা, হারিয়ে গেল বহু নীচের সাগরে ।

পরদিন সকালে মিশরে কেটে গেল হ্রদ নাসেরের আসওয়ান ড্যামের বিপদ । বিশ ফুট হ্রাস পেয়েছে হ্রদের পানির স্তর, চার শ’ ফুট চওড়া ফাটল দিয়ে এখনও ছয় ফুটি স্রোত পড়ছে নীল নদের অববাহিকায় । তাতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটবে না । এখনও খুলে রাখা হয়েছে সব স্পিলওয়ে, টারবাইন গেট ও ডাইভার্সন ক্যানাল । আগামীকাল দুপুরে স্বাভাবিক হবে আসওয়ান ড্যাম ।

বিপদ পুরো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি ।

বাঁধের উপর থেকে তাকিয়ে সোহেলের মনে হলো, অনেক বদলে গেছে নীল নদের দুই পার । হারিয়ে গেছে অনেক দালান । যেগুলো রয়ে গেছে, সব বন্যার ভিতর হাবুডুবু খাচ্ছে । কোথায় কে জানে ভেসে গেছে ডক, নৌকা, জাহাজ, ছোট বালির বাঁধ বা বালির ঢিবি! সরু কোনও নদের বদলে এখন নীল নদকে লাগছে মস্ত কোনও হ্রদের মত ।

হ্রদের উপরের আকাশে ঘুরছে হেলিকপ্টার, ওগুলো যেন মস্ত কোনও পুকুরের উপর উড়তে থাকা গজাফড়িং । ছোট সব

জলযান নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে ওখানে তল্লাশীর কাজে ব্যস্ত নেভি ও কোস্টগার্ডরা। বাঁধের বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এখনও রয়ে গেছে। যদিও ভেসে গেছে সব বৈদ্যুতিক কেবল।

একটা আর্মি ট্রেইলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোহেল। পাশেই মেজর লুৎফর হোসেইনি। ধমক দিল নার্সকে। ‘স্যালাইন ঠিকভাবে দিয়েছেন, স্যরকে?’

‘না, নেবেন না উনি,’ বলল নার্স।

এই দুর্বোধ্য ফুরিয়ে যাবে মেডিকেল সাপ্লাই, তাই সোহেল চেয়েছে ওরচে’ গুরুতর রোগী লাভ করুক চিকিৎসার সুযোগ।

এক বোতল পানি আর একটা কম্বল ওর দিকে বাড়িয়ে দিল ‘সুন্দরী নার্স। আপত্তি করল না সোহেল, ওগুলো নিয়ে বসে পড়ল ট্রাকের পাশে। বসে পড়ল মেজর লুৎফরও, প্যাকেট থেকে একটা বেনসন নিয়ে বাড়িয়ে দিল সোহেলের দিকে, মুখে চওড়া হাসি। ‘খারাপ অভ্যেস, স্যর। ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করুন।’

ব্যাটা, তুই তো সিগারেটের ধোঁয়া জীবনেও বুকে নিস না, তোর সমস্যা কী? উদাস হয়ে গেল সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, ‘কত হাজার, মেজর?’

‘সবমিলে আন্দাজ দশ হাজার, স্যর,’ মুখ কুঁচকে ফেলল মেজর লুৎফর। ‘কিন্তু আপনি সফল না হলে যেত লাখে লাখে।’

সোহেলের মনে হলো বুকের ভিতর ঘাই খেয়েছে। দশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে পানিতে ডুবে।

‘লাখে লাখেই থামত না ব্যাপারটা,’ জোর দিয়ে বলল মেজর। ‘স্যর, বুঝতে পেরেছেন? আমাদের মিশরকে রক্ষা করেছেন আপনি।’ আস্তে করে মাথা দোলাল সে।

মুখ তুলে তাকে দেখল সোহেল। ভাবল, তবুও মনে শান্তি নেই কেন? জবাব দিল মন: তুই কিন্তু তোর সাধ্যমত করেছিস!

একটু দূরে নেমে পড়ল এক হেলিকপ্টার।

মেজরের দিকে ছুটে এল এক কর্পোরাল। ‘স্যর, আমরা আহতদের নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। কাউকে নিয়ে যেতে হবে?’

‘যাচ্ছ কোথায়?’ জানতে চাইল মেজর।

‘লুস্কর। বিদ্যুৎ আছে ওখানকার হাসপাতালে।’

‘তা হলে ঐকে নিয়ে যাও,’ বলল হোসেইনি। ‘জরুরি চিকিৎসা দরকার।’

‘ইনি কে, স্যর?’ জানতে চাইল কর্পোরাল।

‘নাম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ, বাংলাদেশ আর্মি,’ গম্ভীর মুখে বলল মেজর। ‘উনি না থাকলে গোটা মিশর আজ অন্য রকম হয়ে যেত। কোটি কোটি মানুষকে কবরে নামিয়ে দেয়ারও লোক থাকত না।’

বত্রিশ

একই দিন দুপুর।

দি আইল্যাণ্ডের ভিডিয়ো কনফারেন্স রুম।

উপস্থিত আছে রানা, রেজা দম্পতি, বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনি ছাড়াও জ্যাসিস্টা কাপুল ও বেদুঈন যুবক ইউনুস।

দেয়ালের মস্ত স্ক্রিনে দেখা দিলেন বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান ও নুমা চিফ অ্যাডমিরাল (অব.) জর্জ হ্যামিলটন।

ক’দিন আগে সার্কের দেশের সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির চিফদের জরুরি এক সম্মেলনে যোগ দিতে মালদ্বীপে এসেছেন

বিসিআই চিফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। সভার শুরুতে নিয়মানুযায়ী হ্যাণ্ডশেক করলেও পাকিস্তানের এসআইএস চিফের প্রতি ছিল তাঁর শীতল আচরণ। আজ রানার কাছ থেকে ন্যানোবট মিশনের তথ্য পেয়ে যোগাযোগ করেছেন। ইটালিয়ান বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির প্রায়-বিধ্বস্ত ভাসমান দ্বীপ থেকে মালদ্বীপে রানাকে ফিরতে নির্দেশ দেবেন। যোগাযোগ করবেন মিশরে বাংলাদেশ এম্বেসির সেক্রেটারি অফিসারের সঙ্গে। সোহেল মালদ্বীপে পৌঁছলে একসঙ্গে ফিরবেন বাংলাদেশে।

ওয়াশিংটন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন।

খুকখুক করে কেশে নিয়ে মুখ খুললেন রাহাত খান, ‘সাগরে রয়ে গেল পালকে পাল ন্যানোবট, পরে নতুন করে আবারও দানব হয়ে উঠবে না ওগুলো, ডক্টর ম্যানিনি?’

মাথা নাড়লেন ইটালিয়ান বিজ্ঞানী। ‘ভয় পেয়েছি। আর তা-ই ব্যবস্থাও নিয়েছি। ডিফেন্স করার পর নতুন প্রোগ্রাম দিয়েছি, খেয়ে ফেলবে ওরা নিজেদেরকে। বুঝলেন না, সবশেষে সাগরে থাকবে মাত্র একটা কণা! মাসুদ রানার মতই ঘুরে বেড়াবে দুনিয়াময়, একা!’

‘এদিকে দুটো আমেরিকান যুদ্ধ-বিমান ইয়েমেন সরকারের তোয়াক্কা না করে মিসাইল মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে জায়েদ বিন মনযুরের মরুভূমির আস্তানা,’ বললেন জর্জ হ্যামিলটন। ‘বাস্কার বাস্টার বোমার কারণে আস্ত একটা ন্যানোবটও খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে জায়েদ বিন মনযুরের সহকারী ওই বেদুঈন খালিফ বিন আদনান।’

‘জায়েদের মত ভয়ঙ্কর দানব আবারও তৈরি হতে বহুকাল লাগবে,’ নিচু স্বরে বলল আসিফ।

কাঁধ ঝাঁকালেন হ্যামিলটন। ‘এদিকে আমরা খোঁজ লাগিয়ে

বের করেছি নেভির পুরনো এক হারিয়ে যাওয়া ফাইল। জাপানি সামরিক বাহিনীকে ঠেকাতে তৈরি করা হয়েছিল পেইন মেকার মেশিন। কিন্তু হারিয়ে যায় সাগরে। কাজেই বানযাই বা টেনো হেইকা বানযাই বলে হামলে পড়া আত্মঘাতী জাপানি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এ যন্ত্র আর ব্যবহার করা যায়নি।’

‘রানা তো তাদের দ্বীপে পাঠিয়ে দিল উনিশতম প্রেসিডেন্ট রুথভেল্ট আর তার লোকজনকে,’ বলল তানিয়া, ‘এবার বোধহয় ওই দুই দ্বীপ নিজেদের বলে দাবি করবে আমেরিকা?’

‘ডুডু রুথভেল্ট অবশ্য লুকোচুরি খেলতে পারলেই বেশি খুশি হবে,’ মৃদু হাসলেন হ্যামিলটন।

সবাই চুপ হয়ে যেতে রাহাত খান বললেন, ‘সোহেল রক্ষা করেছে মিশরীয় ড্যাম। ওই দেশের সরকার থেকে ওকে জাতীয় বীর হিসেবে পুরস্কৃত করতে চাইছে। অবশ্য কোনও পুরস্কার বা খেতাব গ্রহণ করার নিয়ম নেই আমাদের সার্ভিসে। সোহেল পৌঁছে গেলে আমরা তিনজন মালদ্বীপ থেকে সরাসরি বাংলাদেশে ফিরব।’

‘আপনার দ্বীপের কী হবে, ডক্টর ম্যানিনি?’ জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকালেন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। ‘সকালে সব হিসাব-নিকেশ শেষ করেছে ইঞ্জিনিয়াররা। মেরামত হবে না এ জিনিস। খেয়ে নিতে শুরু করেছিল বদমাস ন্যানোবটগুলো। সবই হারিয়ে যাবে ভারত মহাসাগরের তলে।’

আফসোস করল তানিয়া, ‘আহা রে, আপনার এত কষ্টে তৈরি জিনিস!’

মুচকি হাসলেন ম্যানিনি। ‘ভাববেন না। আর যদি ভাবতেই হয়, বেচারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর কষ্টের কথা ভাবুন। ওরা এবার ইন্স্যুরেন্সের টাকা দিতে গিয়ে অন্তরে খুব চোট খাবে।’

বিজ্ঞানী চুপ হয়ে যাওয়ায় রানার দিকে চাইলেন রাহাত খান। ‘আগামীকাল বিকেলে দেশে ফিরেই পাবে নতুন অ্যাসাইনমেন্ট।’

‘জী, স্যর,’ মৃদু মাথা দোলাল রানা।

পর্দা থেকে বিদায় নিলেন বিসিআই চিফ রাহাত খান ও নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন, একই সময়ে কেটে গেল ভিডিয়ো লিঙ্ক।

বিজ্ঞানী ম্যানিনি হাঁক ছাড়তেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুস্বাদু গরমা-গরম চাইনিজ খাবার হাজির হলো টেবিলে।

(সমাপ্ত)

আলোচনা

দ্বিতীয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মজার মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিত্ব অনুভূতি বা সমস্যা, সুকৃতিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপাশে লিখবেন। নিম্নের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর ‘আলোচনা বিভাগ’ লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সন্ধান হযনি, মনোনিবেশ হযনি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগিদ দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে?—কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibbhag@gmail.com

মোঃ শাওন হোসেন রাজু

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩।

রানাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠল মেলিখান, ‘এই! থামো বলছি!’

পার্শিয়ান ট্রেজার ২-এর ৩৩২ পৃষ্ঠার এই ডায়ালগটি বেশ মজার। একবার নয়, বেশ কয়েকবার এই অংশটুকু পড়েছি আমি। হেসেছি প্রাণ খুলে। সত্যি, এমন জায়গায় এমন চৌকস বাক্য ঝাঙেন না আপনি, কাজীদা, রোমাঞ্চে টাইটম্বর হয়ে যাই।

হ্যাঁ, একটু দেরিতে হলেও পার্শিয়ান ট্রেজার ১+২ পড়লাম। আমি সৌভাগ্যবান, আপনার মত একজন লেখক পেয়েছি আমার পাঠক জীবনে। গুণধন উদ্ধারের গল্প-সিনেমা আমি অবাক নয়নে চাক্ষুষ করি এবং শুনি। এবার রানার সঙ্গে সশরীরে যেতে পেরেছি আপনার কল্যাণে। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছি, এমন কাহিনির বই যেন আপনি আমাদের আরও দিতে পারেন।

সেবার সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ টানছি।

✽ আপনারও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ।

এস. এম. মাহবুব আলম, মোবা: ০১৮২৪-৬৬৬৫৭২

গ্রা: দরগারবন্দ, পো: দুলালপুর (দঃ পাড়া), জেলা: নরসিংদী।

প্রায় এক যুগ হতে চলল—‘সেবা’র সঙ্গে পরিচয়। পরিচিত হওয়ার পর কীভাবে যে একে-একে দীর্ঘ বারোটি বছর কেটে গেল, টেরই পাইনি। এই বারো বছরেও আমার কাছে সেবার নতুনত্ব কমেনি একটুও, বরং সেই ভাল লাগা আজও অটুট। সেবাতে আমার হাতে খড়ি ‘তিন গোয়েন্দা’ দিয়ে।

তারপর ‘ওয়েস্টার্ন’ এবং ‘মাসুদ রানা’র সঙ্গে পরিচয় হয় ২০০৫ সালে, এস. এস. সি. পরীক্ষার পর। আহা, কী সোনালি ছিল সেই সব দিন! কত কষ্ট করে সেবার বই জোগাড় করে পড়তাম। যখনই কোনও দোকানে যাই, সেবার আলোচনা বিভাগের চিঠিগুলো পড়ি। কারও সঙ্গে চেনাজানা নেই, তবুও চিঠির লেখকদের মনে হয় অনেক আপন, অনেক কাছে কেউ।

কাজীদা, যখন কোনও পুরানো বই হাতের কাছে পাই, আলোচনা বিভাগের চিঠিগুলো উল্টে দেখি, তখনও সেই একই ভাল লাগা বিরাজ করে। মনে হয়, আমরা সবাই একই পরিবারের। আশির দশক বা তারও আগের সেবার বইগুলোর প্রিন্ট, প্রচ্ছদ, বাঁধাই ছিল অন্যরকম। কিন্তু কাহিনি ছিল চির-নতুন। তখন সেবাতে অনেক সুলেখকের উপস্থিতি ছিল। তাঁদের অনেকেই এখন সেবাতে অনিয়মিত। কিন্তু তাঁদের লেখাগুলো আজও পাঠক মহলে সমাদৃত। কাজীদা, যখন সেবার পুরানো বইগুলো হাতে নিই, পৃষ্ঠা উল্টাই, আলোচনা বিভাগের চিঠিগুলো পড়ি, তখন কেন জানি বড় জানতে ইচ্ছে করে, কেমন ছিলেন তখন সেই পুরানো পাঠকেরা? তখনকার পাঠকেরাও কি আমাদের মত সেবাকে নিয়ে এত মাতামাতি করতেন, ভুগতেন কি সেবাকে নিয়ে নস্টালজিয়া আর ভাল লাগায়?

খুব জানতে ইচ্ছে করে, কাজীদা। আর কেমনই বা ছিলেন সেবার পুরানো লেখকেরা, কেমন ছিল আমার প্রিয় সেবা?

আচ্ছা, কাজীদা, সেবার সমস্ত চিঠিপত্র নিয়ে কিংবা বাছাই করে কি একটা চিঠিপত্রের সঙ্কলন বের করা যায় না?

* করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু না, এ জীবনে হবে না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ: পুরনো প্রিয় পাঠক ও লেখকদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমাকেও নস্টালজিয়ায় ভুগিয়েছেন। আপনি জানতে চেয়েছেন, কেমন ছিলেন তাঁরা। আমার উত্তর: খুব ভাল ছিলেন, যার চেয়ে ভাল আর হয় না।

মোহাম্মদ আনিস-উজ্জ-জামান

১৭০ মেরাদিয়া মেইন রোড, ঢাকা ১২১৯, মোবা: ০১৭৭২-৬৮৬২০২।

প্রিয় কাজীদা, চিঠির শুরুতেই আপনি ও সেবার সব লেখককে মাঝির গানের, শীতের শিশিরের, হলুদ গোলাপ ও বকুল ফুলের শুভেচ্ছা। সেবার ঈশ্বরী, আলীবাবার গুহা, তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১৩৩, দ্য লায়ন’স স্কিন, শেষ যাত্রা, নাডা দ্য লিলি, কুয়াশা ভলিউম ৬, ৯, ১১ পড়লাম। বইগুলো আমাকে যেন জাদু করে রেখেছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বাংলাদেশের সেরা জাদুকর জুয়েল আইচ যেভাবে দর্শককে মুগ্ধ করেন। এ ছাড়া শিকার কাহিনি মৃত্যুশীল আতঙ্ক, কুমায়ূনের মানুষকে, মাসুদ রানা সিরিজের পাতকিনী, আদিম আতঙ্ক, সেই উ সেন, রহস্যপত্রিকা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ও সেবার পুরানো বই সেই চোখ পড়লাম। সবগুলোই তুলনাহীন, অসামান্য।

* চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক’টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

www.boighar.com

২৭/৫/১৫ রহস্যপত্রিকা

(৩১ বর্ষ ৮ সংখ্যা)

জুন, ২০১৫

১/৬/১৫ দ্য ইয়েলো গড (অনুবাদ)

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/সাইমুল আবেকিন অপু

বিষয়: ‘আমি আসিকি জাতির মানুষ। আসিকি শব্দটার অর্থ—আত্মা। আমাদের দেবীর এত স্বর্ণ আছে যে, স্বর্ণের কোনও মূল্যই নেই তাঁর কাছে। দেবীর কাছে মূল্যবান হচ্ছে রক্ত...’ মেহমানদের গল্প শোনাচ্ছিল অ্যালান ভার্ননের খাস ভৃত্য জিকি। অ্যালান ভার্নন একজন প্রাক্তন মেজর। নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে, লোক-ঠিকানো শেয়ার ব্যবসা করে নিজের পকেট ভারী করা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। ওদিকে প্রচুর টাকা হাতে না এলে ওর বাড়ি ইয়ার্লিজ তো হাতছাড়া হবেই, সঙ্গে প্রেমিকা বারবারাকেও হারাতে হবে। কাজেই সোনার খোঁজে রহস্যময় আসিকিদের দেশে চলল ও। এ গল্প ভালবাসার, অন্ধকার আফ্রিকার। সেই সঙ্গে অভিযান আর রোমাঞ্চেরও। তা হলে আর দেরি কেন? আসুন, অ্যালানের সঙ্গে আমরাও রওনা হয়ে যাই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের পথে।

আরও আসছে

১০/৬/১৫ তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১/২

(রিমিস্ট)

রুকিব হাসান

২৭/৬/১৫ রহস্যপত্রিকা

(৩১ বর্ষ ৯ সংখ্যা)

জুলাই, ২০১৫

মাসুদ রানা

নরকের কীট

দ্বিতীয় খণ্ড **Boighar**

কাজী আনোয়ার হোসেন

সত্যিই সবুজ-শ্যামল-মায়াময় এই বাংলাদেশ হয়ে

যাবে ধূ-ধূ মরুভূমি? কিছূতেই না!

ইয়েমেনের মৃত্যু-কূপ থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়ার

দুই দিকে ছুটল রানা ও সোহেল।

শত্রু বিমান দখল করার পরও আকাশের বহু ওপর

থেকে জ্বলন্ত বিমান ছেড়ে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হলো রানা।

তারপর বন্দি হলো রূপকথার মত অদ্ভুত এক

সভ্যতা বিবর্জিত দেশে। www.boighar.com

ওদিকে শত্রু-দ্রাকো চেপে পৌঁছুল সোহেল মিশরে।

খুনি জায়েদের ন্যানোবটগুলো নাসের হৃদয়ের

প্রকাণ্ড আসওয়ান ড্যাম উড়িয়ে দেয়ার আগেই

তা ঠেকাতে হবে! একা পারবে সোহেল?

অবশেষে নৃশংস একদল খুনির মোকাবিলা করতে

ভাসমান দ্বীপে গিয়ে উঠল রানা। সেখানে ওকে

চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে চায় সর্বভুক নরকের কীট!



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Boighar